Thesis approved by the Calcutta University

for D. Phil. (Arts)

বাংলা গাথাকাব্য

ডক্টর বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য এম.এ., ডি. ফিল.

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ভূমিকা

শ্রীমতী বহ্নিকুমারী চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্য) এই গ্রন্থখানিতে বাংলাসাহিত্যে গাথা-কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের লোক-সাহিত্যে গাথা-কবিতা চিরদিনই ছিল, সভা-সাহিত্যে তাহার স্থান বর্তমান শতাব্দের পূর্বে স্বীকৃত হয় নাই এবং রবীন্দ্রনাথের আগে কেহই লোক-সাহিত্য তথা গাথা-কবিতাকে কোনই মূল্য দেন নাই। দীনেশবাবুর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বাহির হইবার পরেই বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে গাথা-কবিতার মর্যাদা স্বীকৃত হইতে থাকে।

শ্রীমতী বহ্নিকুমারীর গ্রন্থখানি শুধু সময়োচিত হয় নাই পরীক্ষার্থীদের (এখন এম্-এ পরীক্ষায় লোক-সাহিত্য বিশেষ পঠনীয় বিষয় বলিয়া পরিগণিত) প্রয়োজন-উপযোগীও হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের এ বই পড়িবার প্রবৃত্তি জাগিবে কিনা সন্দেহ। তবে কেহ যদি কৌতূহলের বশে পাঠ করেন তবে তিনি বঞ্চিত হইবেন না, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি।

আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২রা নভেম্বর, ১৯৬২

শ্রীসুকুমার সেন

নিবেদন

গাথাকাব্য আমাদের লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ শাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতাবৎকাল আমাদের সাহিত্যে এই বিভাগটি সম্পূর্ণ অবহেলিত হইয়াই রহিয়াছে। এই সম্পর্কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা ব্যতীত বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই বলিলেই হয়। কাজেই শ্রদ্ধেয় ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় যখন এই বিষয়টি লইয়া আমাকে গবেষণা করিতে বলেন তখন আমি প্রথমটায় বিশেষ কোন উৎসাহবোধ করি নাই। কিন্তু কাজে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, তিনি আমাকে এক অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিয়াছেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন সামগ্রিক আলোচনা পাই নাই বলিয়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়কে আমি প্রতিনিয়ত বিরক্ত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার গুরুতর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সস্নেহে তিনি আমার অনুসন্ধিৎসার উপাদান যোগাইয়াছেন।

বাংলাসাহিত্যে বিভিন্ন রকমের যত গাথাকাব্য আছে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া আমি বাংলা গাথাকাব্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সঙ্গীত সম্পর্কে আমার বিশেষ একটি আকর্ষণ থাকায় গাথাকাব্যের সঙ্গীতের দিকটি সম্পর্কেও কিছু খোঁজখবর করিয়াছিলাম কিন্তু এই সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্যের সন্ধান পাই নাই। লোকসাহিত্য সম্পূর্ণই সঙ্গীতমূলক। কাজেই ইহার সঙ্গীত-সম্পর্কিত আলোচনার যে বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। আমাদের গাথাকাব্যের সঙ্গে বিদেশী গাথাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনাও আমাদের গাথাকাব্যের প্রকৃতি-নিরূপণ ও মূল্যায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই উভয় দিক লইয়াই ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যাঁহাদের মূল্যবান সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন আমার এই গবেষণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত তাঁহাদের মধ্যে সিউড়ী (বীরভূম) রতন লাইব্রেরীর শ্রীযুত অমলেন্দু মিত্র মহাশয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বহু পুঁথি এবং নানারকম নির্দেশ দিয়া তিনি আমাকে সাহায্য

করিয়াছেন। লোক-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালার শ্রীযুত সুকুমার মিত্র মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য ব্যতীত এই কাজে অগ্রসর হওয়াই হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। তাঁহাকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের সকলের সহৃদয় সাহায্যের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি। আমার বোনপো শ্রীমান্ বিবেকজ্যোতি মৈত্র নানাস্থানে ঘুরিয়া বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছে। তাহাকে আমার সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইতেছি।

এই গ্রন্থের অর্থকরী দিক সম্পর্কে কোনপ্রকার চিন্তা না করিয়াই মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দ ইহার মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইতি—

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬২

বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য

পরম পূজনীয়া
মাতৃদেবীর শ্রীচরণে—

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ছোট ও বড় গাথা কবিতা পুরানো বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা। সাধারণতঃ কাব্যের লক্ষণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গাথাকাব্যে সে সব লক্ষণ যথাযথ পাওয়া যায় না। গাথাকাব্য অনেকটা অপরিণতরূপ-কাব্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যে গাথাকবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু গাথাকাব্যের রূপ কোথাও পরিণত নয় বলিয়া গাথাকাব্যের সংজ্ঞা লইয়া বিভিন্ন দেশের সমালোচকদের মধ্যে মতের পুরাপুরি ঐক্য হয় নাই। গাথা-কাব্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি লইয়া যতপ্রকার মতভেদই দৃষ্ট হউক না কেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রচিত ও প্রচলিত গাথাকাব্যগুলির মধ্যে একটি গঠনরীতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পুরানো গাথাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল গাথাকবিতার সহিত বাংলা প্রাচীন গাথাকবিতার ভাব ও বিষয়গত বৈষম্য থাকিলেও, অসন্দিগ্ধভাবে গঠনরীতিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্য গাথাকাব্য (ballad) সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক যে সমস্ত লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্য সম্বন্ধে সেগুলির উপযোগিতা যথেষ্ট আছে বলিয়া মনে করি। একথা গোড়াতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গাথাকাব্য কেহই কাহারও প্রভাব-পরিপুষ্ট নহে, কাহারও সহিত কাহারও কোনও জন্মগত সম্পর্ক নাই, অথচ উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্যগত ঐক্য বর্তমান। ইহা হইতে মনে হয় যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন গ্রাম্য-জনসাধারণের জীবনযাপন-প্রণালীর ঐক্যই জনসাধারণ রচিত গাথাকাব্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্যগত ঐক্যের কারণ।

পাশ্চাত্য গাথাকবিতার বিখ্যাত সমালোচক এফ. জে. চাইল্ড বলিয়াছেন :—

"গাথাকবিতাগুলি জনসমাদৃত চিন্তাধারার রহস্যময় সৃষ্টি।"*

---

* "Ballad are the mysterious creation of popular imagination."

—F, J. Child.

ইভ্‌লিন কেনড্রিক ওয়েল্‌স্‌ তাঁহার 'দি ব্যালাড টী' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"গাথাকবিতার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু সুরের উপর নির্ভরশীল। গাথাকাব্য মৌখিক প্রচারের উপর নির্ভর করে।"[১]

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সমালোচক রবার্ট গ্রেভ্‌সের বিস্তৃত মতবাদ উল্লেখযোগ্য[২]—

১। গাথাকবিতার রচয়িতা কে তাহা জানা যায় না।

২। এই সকল গাথাকবিতার কোনও সাহিত্যিক মর্যাদাসম্পন্ন পুস্তক নাই।

৩। সঙ্গীত ব্যতীত ইহা অসম্পূর্ণ, এই সঙ্গীত পুনরাবৃত্তরূপের।

৪। গাথাকবিতা স্থানসুলভ, ইহা কৃষ্টিসম্পন্ন নহে। ইহা মৌখিক, পুঁথিগত নহে।

৫। কাব্যগুণে ইহা খুব উন্নত নহে।

এম. জে. সি. হোজার্ট-এর মতে:

"গাথাকবিতাগুলিকে যত সহজে চেনা যায়, তত সহজে ইহাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। গাথাগুলি কেবলমাত্র রচয়িতার পরিচয়হীন নয়, ইহারা ব্যক্তি বিশেষেরও নয়। অধিকাংশ গাথারই কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস নাই।"[৩]

পাশ্চাত্য গাথাকাব্য সম্বন্ধে উপরি-উক্ত মতবাদগুলির অধিকাংশই বাংলা গাথাকাব্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

বাংলা গাথাকাব্য সম্বন্ধে বলিতে গেলে সর্বপ্রথম প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঠিক কোন্‌ সময়ে কিরূপ অবস্থার

১। "A Ballad's life depends not only on theme and attitude, but on tune. A ballad depends upon oral transmission."—Evelyn Kendrick Wells.

২। "(1) The Balled-Proper has no known author.
(2) There is never an authoritative text of such a ballad.
(3) It is incomplete without music, music of a repetitive kind.
(4) Ballad is local, not cultural. It is oral, not literary.
(5) It is not highly advanced technically."

—Robert Graves.

৩। "Ballads are as hard to define as they are easy to recognize, Ballads are not only anonymous but also impersonal. Most of the ballads have no reliable source."

—M. J. C. Hodgert.

মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হইয়াছিল তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। তবে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালেই (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) সর্বপ্রথম বাংলাদেশে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। এই সময়ে প্রাচীন বাংলাভাষার উৎপত্তি হয় নাই। তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত কথ্যভাষাও তখন পর্যন্ত সাহিত্যে স্থান পায় নাই। ইহার ফলে তখন হইতেই বাংলাদেশে প্রচলিত কথ্যভাষায় রচিত গীতিকাহিনী বা ছড়া গ্রাম্য জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া নিরক্ষর জনগণের মনোরঞ্জন করিত। নিরক্ষর জনসমাজ অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহিত্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত ছিল। তাই নিরক্ষর গ্রাম্যকবির রচনাই তাহাদিগকে সাহিত্যরসের যোগান দিত। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ। এই আবেগের বশীভূত হইয়াই গ্রাম্যকবিগণ প্রথম সাহিত্য রচনা করেন। চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। গ্রাম্য সাহিত্যের উন্মেষকালে এই দুইটি উপকরণই সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। ছোট-ছোট কাহিনীমূলক গীত গ্রাম্যকবিগণকে চিত্র এবং সঙ্গীতের উপকরণ জোগাইত। এইরূপে বাংলাভাষা সৃষ্টি হইবারও পূর্বে বাংলাদেশে গাথাকাব্যের সৃষ্টি হয় এবং তখন হইতেই বাংলাদেশে অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহিত্য হইতে পৃথক একটি সাহিত্যের ধারা বাংলাদেশের নিরক্ষর গ্রাম্য জনসাধারণের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া আসিতেছে। এইভাবেই লোকসাহিত্যের জন্ম।

পাল রাজাদের রাজত্বকালে (অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) বাংলাদেশে অপভ্রংশ ভাষায় বহু গীত এবং গাথা রচিত হইয়াছিল। এই অপভ্রংশের সঙ্গে বাংলাদেশের তৎকালপ্রচলিত ভাষার প্রভেদ ছিল খুবই স্বল্প। সেই কারণে অপভ্রংশ চর্চা হইতে স্বাভাবিক পরিণতির নিয়মে ক্রমশঃ দেশভাষায় গীতাদি রচিত হইতে লাগিল। ইহার পর সেন রাজত্বকালে, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, লক্ষ্মণসেনদেবের রাজসভাস্থিত কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' বাংলাদেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমগ্র জনগণের মনে গীতকাহিনীর সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জয়দেবের কাব্য বাংলাভাষায় রচিত না হইলেও, এই রচনার ভাব ও রচনারীতিই নব প্রবর্তিত বাংলাকাব্যে রসসঞ্চার করিয়াছিল। কবি জয়দেবের কাব্যই বাংলাদেশে গীতকাব্যের সুপ্রচলন আনিয়াছিল।

বাংলাভাষার উন্মেষকাল হইতেই বাংলাদেশের গ্রাম্যকবিগণ কর্তৃক গান এবং ছড়ার আকারে বিভিন্ন ধর্মমূলক এবং ঐতিহাসিক কাহিনী রচিত হইয়া গ্রাম্য-জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ রচয়িতা অথবা গায়েনের মুখে মুখে গীত হইয়া প্রচারিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত গান ও ছড়া-ই বাংলা গাথাকাব্যের অগ্রদূত। এই সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরস্পর-বিরোধী মতবাদ লইয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে আপন আপন ধর্মভাব প্রচারের প্রভূত চেষ্টা করিতেছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা বিভিন্ন ছোট-বড় ধর্মাশ্রিত গীতকাহিনী রচনা করিয়া গীতের মাধ্যমে জনসাধারণের ভিতর প্রচার করিত। এই সকল গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাহিনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার। বিভিন্ন ধর্মান্তর্গত দেবদেবী অথবা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া রচিত এই সকল কাহিনী যখন সুর সংযোগে নিরক্ষর জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত হইত, তখন কাহিনীর অন্তর্গত মূল বক্তব্য তাহাদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিত। এই সকল কাহিনীকাব্য বা গাথাকাব্যে কাব্যগুণ অপেক্ষা কাহিনী বর্ণনার প্রতিই সমধিক মনোযোগ প্রদত্ত হইত। এই সকল রচনা মুখে মুখেই রচিত হইত এবং মুখে মুখেই প্রচার লাভ করিত। এইরূপে মুখে মুখে প্রচারলাভের ফলে কালক্রমে কাহিনীর রূপ পরিবর্তিত হইয়া নবরূপ গ্রহণ করিত। অবশেষে যখন বাংলাদেশে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারগত বিবোধ থামিয়া গেল, তখন ধর্মমূলক কাহিনীগুলি দেবপূজার সঙ্গে নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য বিবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ চিত্তাকর্ষক লৌকিক কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালক্রমে গ্রাম্যকবিগণের রচনাগুণে এই সকল কাহিনী পরিবর্তন লাভ করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে লৌকিক সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া পড়িল। প্রাচীন দেব-দেবী ও ক্ষমতাশালী যোগী ঋষিগণ অশিক্ষিত জনসাধাবণের সরল উদ্দেশ্যহীন কল্পনার আশ্রয়ে সাধারণ মানব-মানবীব রূপে কাহিনীগুলির পাত্র-পাত্রীর স্থান অধিকাব করিলেন। প্রাচীনকাল হইতেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে এবং কালক্রমে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বাধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বিলুপ্তির অন্ধকারে চাপা পড়িয়াছে। অভিজাত সম্প্রদায় অপেক্ষা

সাধারণ জনসমাজের উপরই বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হইত এবং জনসাধারণের রচনায় এই প্রভাবের স্পষ্ট ছাপ পড়িত। এই সকল রচনা লিখিত না থাকার দরুণ কালক্রমে পরিবর্তিত ও লুপ্ত হইতে হইতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আসিয়া ইহাদেরই একটি ধারা গাথাকাব্যের 'রূপে একটি বিশিষ্ট গঠন প্রণালী লইয়া গ্রাম্য-জনসমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে বলিয়া মনে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রচারিত বিভিন্ন সম্প্রদায় রচিত ধর্মমূলক ও ঐতিহাসিক ছড়া, কবিতা ও কাহিনীগুলি, চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীকালের মধ্যেই গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণের প্রতিভাস্পর্শে গাথাকাব্যের বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইহাদের প্রচলন সমধিক বৃদ্ধি পায় বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী কাল-সীমার মধ্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব বাংলাদেশের জনগণের জীবনে এক অভূতপূর্ব জাগরণ আনে। এই সময় হইতে বাংলাদেশে বাংলাভাষায় রচিত বিভিন্ন রচনাবলী পুঁথিতে স্থান পাইয়া সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে গ্রাম্যকবি ও গায়েনগণও অভিজাত সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আপন আপন রচনা অথবা পূর্বকবি রচিত প্রচলিত বাংলা রচনা-সকল লিপিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু গাথাকাব্য গ্রাম্যকবিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া পরবর্তী কালের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের নিদর্শন স্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং বাংলাভাষার উন্মেষকালে গাথাগুলি রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বের কোনও লিখিত নিদর্শন না থাকায় তখনকার গাথাকাব্যের গঠনরীতি সম্বন্ধে আজ আর কোনও স্পষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে কালক্রমে হস্তলিখিত বহু পুঁথি বিনষ্ট হইয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ পুঁথিগুলির অন্তর্গত কাহিনী-সকল যে অন্ততঃ ইহার দুই শতাব্দীর পূর্বে প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, চতুর্দশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই গাথাকাব্যগুলি গাথাকাব্যের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং বিবিধ বিষয় লইয়া গাথাকাব্য রচিত হইলেও, বাংলা গাথাকাব্যের মূল উৎসস্থল যে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানমূলক গীতি, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যে

এই গাথাকাব্যগুলি একটি নূতন ধারা আনয়ন করে—তাহা (লৌকিক প্রণয়-কাহিনী।)(ইহার পূর্বে রচিত সকল প্রেমকাহিনীই রাধাকৃষ্ণকে লইয়া। সাধারণ নরনারীর প্রেমও যে সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে তখন পর্যন্ত তাহা শিক্ষিত কবিগণের জ্ঞানের অগোচর ছিল। গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণই সর্বপ্রথম এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়া দেখাইলেন) যে, বিশিষ্ট রচনাশক্তি প্রভাবে সাধারণ নরনারীর প্রেমও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। (পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন প্রণয়গাথাগুলিতে আমরা সর্বপ্রথম লৌকিক প্রণয়কাহিনীর নির্ভীক ও মহিমামণ্ডিত বর্ণনা পাই।)

গাথাকাব্যগুলি সাধারণতঃ অশিক্ষিত জনসাধারণের মৌখিক রচনা। জটিলতা বর্জিত একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী গীতের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়া গাথা-কাব্যের আকার গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য সমালোচকের উক্তি "Ballad is a song that tells a story"—অর্থাৎ গাথাকাব্য একটি কাহিনীমূলক গীত। বাংলা গাথাকাব্যকেও অতি সংক্ষেপে এই সংজ্ঞাভুক্ত করা চলে। গাথাকাব্যে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিলেও গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য—একটি স্বাধীন পরিণতি—তাহা ইহাতে স্থান পায় নাই। গাথাকাব্যে কাব্যের অন্তর্গত কাহিনীকে অন্তরের মধ্যে ভাল করিয়া অনুধাবন করাইবার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতের অবতারণা। গাথাকাব্যে কাহিনী অংশই প্রধান, এজন্য গীতের সুর এখানে লঘু হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সঙ্গীত খর্ব হইয়া পড়ে। ...বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাঁহারা কখনো কখনো একত্র মিলিয়া থাকেন। সঙ্গীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচিত্র অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সঙ্গীতও আপন তাল সুরের উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সংবরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য করিতে থাকেন।" (আধুনিক সাহিত্য—আর্যগাথা)।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের অন্তর্গত কাব্যরীতি ও গীতপ্রণালী সম্বন্ধে সর্বথা প্রযোজ্য। গীত না হইলে গাথাকাব্য সম্পূর্ণ রূপ পায় না, অথচ কাহিনীই গাথাকাব্যের মূল উপকরণ।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে রচিত ও লিপিবদ্ধ যতগুলি গাথাকাব্য পুঁথির আকারে অথবা লোকমুখে শুনিয়া সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের কাব্যরীতি, গঠনপ্রণালী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসকল গ্রহণ করা যাইতে পারে।

১। মৌখিক কাহিনীমূলক গীতিকাব্যকে গাথাকাব্য নামে অভিহিত করা যায়।

২। গাথাকাব্যের মূল রচয়িতা নিরক্ষর গ্রাম্যকবি।

৩। সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত যেসকল গাথাকাব্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহারা অধিকাংশই মূল রচনার পরিবর্তিত রূপ।

৪। পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধনের ফলে লিপিবদ্ধ গাথাকাব্যগুলি হইতে প্রাচীনকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সকল গাথাকাব্যে তাহাদের সর্বাধিক প্রচলনকালের অথবা লিপিবদ্ধ হইবার সমসাময়িক কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবই অধিকতর প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৫। কবিতা ও গান গাথাকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও কাহিনী অংশই প্রধান।

৬। রচনাগুলির কাব্যগুণ যৎসামান্য। অলঙ্কার বর্জিত, সরল গ্রাম্যভাষা রচিত। কাহিনী অংশে জটিলতা কম।

৭। কাহিনীর অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীগণের রূপ বর্ণনা এবং প্রকৃতি বর্ণনায় গ্রাম্যকবিগণের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ও মার্জিত রুচিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

৮। গ্রাম্যকবি অথবা গায়েনগণ কর্তৃক গাথাকাব্যগুলি জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থক গীত হইত। সময় সময় গাথাকাব্যগুলি গায়েনগণের উপার্জনেরও সহায় হইত। যে বিশেষ পরিবেশে এই কাহিনীগুলি গীত হইত, সেইখানেই তাহার পূর্ণরূপটি পুরাপুরি প্রকাশ পাইত। সাধারণতঃ একতারা, দোতারা, সারিন্দা অথবা গোপীযন্ত্র জাতীয় বাদ্যসকল সঙ্গতের কাজ চালাইত। গ্রাম্যকবি রচিত গাথাকাব্যের অন্তর্গত ছন্দের অমিল গীতের মাধ্যমে সংশোধিত হইয়া যাইত। গায়কগণের বাগ ভঙ্গীর অসাধু উচ্চারণ, একটানা গীতের সুর এবং সর্বোপরি গ্রাম্য

প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে গাথাকাব্যগুলি বিশিষ্ট মাধুর্যতা প্রাপ্ত হইত।

৯। গাথাকাব্যে কাহিনী বর্ণনার সহিত প্রাকৃতিক বর্ণনার আঙ্গিক যোগাযোগ লক্ষিত হয়।

১০। গাথাকাব্য গ্রাম্য-জনসাধারণের সাহিত্য, ইহা আমাদের সম্মুখে গ্রামের চিত্র তুলিয়া ধরে।

১১। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত গাথা-কাব্যগুলি গ্রাম্যসমাজে সুপ্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের প্রচলন কিছুটা কমিয়া যায় এবং তখন হইতে অল্প-শিক্ষিত গায়েনগণ গাথাগুলিকে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন বলিয়া অনুমান করা যায়, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ গাথার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী।

১২। বৈষ্ণব যুগের পরবর্তী কালে লিখিত অথবা রচিত গাথাকাব্যগুলিতে বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

১৩। সমাজচিত্র সম্বলিত গাথাকাব্যগুলিতে ইংরাজ রাজত্বকালের প্রভাব লক্ষিত হয় না, এই কারণে মনে হয় ইংরাজ আমলের প্রথমাবস্থায় গ্রাম্য সমাজজীবনের উপর ইহার কোনও প্রভাব পড়ে নাই।

১৪। ইংরাজ কোম্পানীর আমলে রচিত কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত গাথা-কাব্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বিষয় লইয়া রচিত প্রাচীন গাথাকাব্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা:—(১) প্রণয় গাথা, (২) ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত গাথা, (৩) ধর্মাশ্রিত গাথা, (৪) নীতিকথাশ্রিত গাথা, ও (৫) বারমাসী গাথা।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে আমরা যে গাথাজাতীয় রচনাগুলি দেখিতে পাই, বাংলা প্রাচীন গাথাকাব্যের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিগণ কর্তৃক ইংরাজী ballad-এর অনুকরণে এইসকল গাথাকাব্য রচিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন গাথাকাব্যগুলির ভিতর গঠনরীতিগত আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই কারণেই পরবর্তী কালে রচিত ইংরাজীসাহিত্য-প্রভাবিত আধুনিক বাংলা গাথাকাব্য ও প্রাচীন বাংলা

গাথাকাব্যের মধ্যে গঠন রীতিগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাই বলিয়া আধুনিক বাংলা গাথাকাব্যগুলিকে প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের আধুনিক সংস্করণ বলিয়া মনে করা কোনরূপেই সঙ্গত নয়। আধুনিক গাথাকাব্যের ভাবধারা এবং কাব্যসৌন্দর্যই প্রমাণ করে যে, ইহারা ইংরাজী সাহিত্যের অনুকরণজাত রচনা। আধুনিক গাথাকাব্য শিক্ষিত কবিসৃষ্ট পাঠ্যগাথা। প্রাচীন গাথাকাব্য অশিক্ষিত গ্রাম্যকবি-সৃষ্ট গীতগাথা। প্রাচীন গাথাকাব্য লোকসাহিত্যের অন্তর্গত, কিন্তু আধুনিক গাথাকাব্য অভিজাত সাহিত্যান্তর্গত। আধুনিক গাথাগুলি যখন রচিত হয় তখন পর্যন্ত প্রাচীন গাথাগুলি শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের গ্রাম্য-জীবনযাত্রাকেও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য ও তৎপরবর্তী যুগের শান্ত, সমৃদ্ধ পল্লীসমাজ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সকল সুখ-সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়া রাজনৈতিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের কবলে পড়িয়া স্বাভাবিক আনন্দ ভুলিয়া কৃত্রিম আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছিল। রাজপ্রাসাদে রচিত ও পালিত কুরুচিপূর্ণ রচনার প্রভাব গ্রাম্য-জনসমাজেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যাহার ফলে আমরা এই সময়ে কোনও কোনও প্রাচীন গাথাকাহিনীকে বিভিন্ন 'কেচ্ছা গাথা'র রূপান্তরিত আকারে পাই। ঠিক ইহার পূর্ববর্তী সময়েই যদি প্রাচীন গাথা কাহিনীগুলি গ্রাম্যকবি অথবা গায়েনগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা চিরকালের মত শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টির অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। বহু বাধা ও বিপরীত পরিবেশের সম্মুখীন হইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত গাথাকাব্যগুলি গ্রাম্যসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বিংশ শতাব্দী হইতেই গ্রাম্যসমাজে প্রাচীন গ্রাম্যগাথাগুলির প্রচলন একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়া কেবলমাত্র পুঁথিবদ্ধ অবস্থায় লোকসাহিত্যের এই ধারাটি গ্রামাঞ্চলের কুটিরে কুটিরে বিরাজ করিতে থাকে। যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ইত্যাদির প্রসারে গ্রাম্যগাথাগুলি কোণঠাসা হইয়া পড়ে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (প্রথম ভাগ ৩নং) জি. এ. গ্রীয়ারসন নামক একজন ইংরাজ কর্তৃক 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামক একটি বাংলা প্রাচীন গাথাকাব্য দেবনাগরী হরফে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। গ্রীয়ারসন সাহেব ইহা রঙ্গপুরের গ্রামাঞ্চল হইতে লোক মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই অবলুপ্ত প্রায় প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যের

প্রতি জনসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য উপায়ে বাংলাসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ গ্রাম্য-জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাচীন গাথাসকল সংগ্রহ করিয়া বাংলা লোকসাহিত্য বিভাগের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অযত্নে, অবহেলায়, ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ইহার পূর্বেই বহু পুঁথি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সময় গ্রাম্য গায়েনের সংখ্যাও একেবারেই কমিয়া গিয়াছিল। তখনও পর্যন্ত যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গীত গাহিয়া উপার্জন করিত, তাহাদের গীতেও নানারূপ ভেজালের সংমিশ্রণ হইয়া প্রাচীন গাথাকাব্যগুলি মৌলিক রূপভ্রষ্ট হইয়াছিল। তবুও, এই সময়ে শিক্ষিত জনসমাজের উদ্যোগে যে সকল প্রাচীন গাথাকাব্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু রচনার অন্তর্গত ভাব ও ভাষায় প্রাচীনত্ব দর্শনে সেগুলিকে প্রাচীন গাথাকাব্যের সামান্য পরিবর্তিত নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল গাথাকাব্য হইতে আমরা তখনকার বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমগ্র পরিচয় না পাইলেও, খানিকটা ইঙ্গিত পাই। 'গৌড়রাজমালা' গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছিলেন, "রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধবিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়—ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল এই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা।"

প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যগুলি বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা, সুতরাং এই রচনাগুলিকে বাংলার ইতিহাস আখ্যা দেওয়া না গেলেও, ইহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস হইবার গৌরব দাবী করিতে পারে। সাহিত্য লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি ধরিতে চায়, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের রচনাটি মিলাইয়া লয়। গ্রাম্যকবিগণ রচিত গাথাকাব্যগুলি গ্রাম্য জনসাধারণের জন্যই রচিত হইত, সুতরাং রচয়িতার অজ্ঞাতসারেও রচনার উপর জনসাধারণের প্রকৃতির প্রতিফলন হইত। গাথাকাব্যগুলি এইরূপে প্রাচীন গ্রাম্য-জনসাধারণের ইতিহাস হইয়া পড়িত।

প্রাচীন গাথাকাব্যগুলির মূল উপাদান ধর্মানুষ্ঠানমূলক গীতি, জনশ্রুতি এবং ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বলিয়া মনে হয়। জনশ্রুতি হইতেই প্রাচীনকালে বিবিধ লোকসাহিত্য এবং অভিজাত সাহিত্যের সৃষ্টি হইত। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য :—

"দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারিদিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুকরা কাব্যগুলিকে বড় কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড় পিণ্ড করিয়া তোলেন। হর-পার্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার কত কাহিনী যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড় করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড় জায়গায় আপনার প্রাণ পদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য, ফল ধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলার মতো ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

"পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ইংলণ্ডের আর্থার-কাহিনী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগাসাহিত্য এমনি করিয়া জন্মিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে লোক-মুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড় আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।" —('গ্রাম্য সাহিত্য' রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড)।

গাথাকাব্য ও মঙ্গলকাব্য একই উৎসবের দুই ভিন্নমুখী ধারা। গাথাকাব্য গ্রাম্য নিরক্ষর কবিদিগের হাতে পড়িয়া লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু মঙ্গলকাব্য অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত কবির প্রতিভাস্পর্শে লোকসাহিত্যের সরলতা হারাইয়া বিশিষ্ট কাব্যসাহিত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

কোনও কোনও গাথাকাহিনী লইয়া রচিত একাধিক পুঁথি সংখ্যা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন গ্রাম্যসমাজে এই সকল কাহিনীর প্রচুর সমাদর ছিল এবং কাহিনীগুলির বক্তব্য বিষয় হইতে তৎকালীন জনসমাজের রুচি, আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা প্রণালীর কিছুটা ধারণা জন্মে।

গাথাকাব্যগুলির বিশ্লেষণ হইতে আর একটি তথ্য অবগত হওয়া যায়। গাথাগুলির মাধ্যমে সেকালে গ্রাম্য জনসমাজের মধ্যে জাতিবিদ্বেষের পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়। একই কাহিনী হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায় সমভাবে উপভোগ করিত। এমন কি ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষভাবে রচিত হইত। তখনকার গ্রাম্যসমাজে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণভাব পোষণ করিত। তখনকার যুগে রচিত গাথাগুলি এই পরম সত্য বহন করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে আমরা গ্রাম্য মুসলমান কবি রচিত যে সকল "কেচ্ছা" গাথা পাই, সেগুলির ভিতর হইতে হিন্দু বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাংলার ইতিহাসেও দেখি এই সময় হইতেই বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান জাতি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। এই কারণেই গাথাগুলির উপর সমসাময়িক যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

সর্বশেষে প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্য সম্বন্ধে যে প্রশ্নটি থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইল পুঁথিবদ্ধ অথবা মুদ্রিত অবস্থায় প্রাচীন গাথাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য কতদূর রক্ষিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমালোচক টি. এফ. হ্যাণ্ডারসন বলিয়াছেন, "লেখার চলনের সঙ্গে সঙ্গে গাথাকবিতাগুলি ব্যক্তিবিশেষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং জনসাধারণের শুনিবার আগ্রহ বাড়িল। ফলে গাথাগুলির রূপ পরিবর্তিত হইতে লাগিল।"* লিপিবদ্ধ অথবা মুদ্রিত অবস্থায় গাথাগুলি যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। গ্রাম্যকবির বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী এবং গানের সুরের মাধ্যমে গাথাগুলির রচনাদোষ চাপা পড়িয়া যাইত। লিপিবদ্ধ অবস্থায় গাথাগুলির স্বতঃস্ফূর্ত গুণাবলী নষ্ট হয়। লিপিবদ্ধ অবস্থায় গাথাগুলি কেবলমাত্র একটি কাহিনীমূলক কবিতার পর্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। কাব্যগুণ বিশেষ না থাকায় বিশিষ্ট কাব্য-মর্যাদায়ও ইহারা অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার সময় গায়েন অথবা লিপিকারগণ আপন আপন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার ইচ্ছা সংবরণ করিতে না পারার দরুণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল গাথাকাহিনী আপন মৌলিকতা হারাইয়া কৃত্রিম হইয়া পড়ে। আবার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যখন গাথাকাব্য সংগ্রহ করেন তখন গ্রাম্যভাষার সহিত তাঁহাদের সম্যক

* "With the introduction of writing, ballads came to be perused in private as well as listened to in public, tended to modify their form".
—T. F. Henderson.

পরিচয় না থাকায় গাথাগুলির ভাষা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং সময় সময় গ্রাম্যগাথাগুলির সংস্কৃত এবং সংশোধিত রূপ মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ লাভ করে। তবে প্রাচীন গাথাকাব্যগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই আজ আমরা প্রাচীন গাথাগুলি সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করিতে পারি। এদিক দিয়া আমরা লিপিকর ও সংগ্রাহকগণের নিকট কৃতজ্ঞ। ইমারত গড়িতে হইলে সর্বপ্রথম ইমারতের একটি নক্সার প্রয়োজন পড়ে। লিখিত গাথাগুলিকে প্রাচীন গাথাকাব্যের তথাকথিত নক্সা বলা চলে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের চাপে কালক্রমে গাথাকাব্যের প্রচলন বন্ধ হইয়াছে, ইহার ফলে গাথাগুলি বিনষ্ট হইয়াছে,—এই বিনাশ রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না, সুতরাং লিখিত না থাকিলে বাংলা লোকসাহিত্যের এই বিশিষ্ট ও মূল্যবান ধারাটি শিক্ষিত জনসমাজের অগোচরেই থাকিয়া যাইত। লিখিত গাথাগুলি বাংলা সাহিত্যকে এই সম্ভাবিত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

লোকমুখে গীতাকারে প্রচারিত হইতে হইতে গাথাকাব্যের রচয়িতাগণের নাম কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইত। গায়েনগণ মূল রচয়িতার রচনায় আপন নামের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া গাথাগুলি গাহিতেন এবং লিপিবদ্ধ হইবার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচয়িতার নামের পরিবর্তে ভণিতায় গায়েনের নাম উল্লিখিত হইত। খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকৃত রচয়িতার নাম জানিতে পারা গিয়াছে, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাহাও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। যে গাথা যত বেশী প্রচার লাভ করিত তাহার রচয়িতার নামও সেই অনুপাতে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলাইয়া যাইত। এই কারণে কোনও গাথাকাব্যেরই প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয় করা এখন আর সম্ভবপর নয়। গাথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় লিপিকারেরা অনেক সময় সাল, তারিখের উল্লেখ করিয়া দিতেন। পরবর্তী কালে এই উল্লেখই গাথার রচনাকাল অনুমান করিবার একমাত্র সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাহিনীগুলির সময় নির্ধারণে অনুমান কিছুটা সঙ্গত নয়। ঘটনা ঘটিবার সমসাময়িক অথবা সামান্য কিছু পরবর্তী কালই রচনাকাল বলিয়া ধরা যায়। যখন হইতে গাথাকাব্যগুলি লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল, তখন হইতেই রচিত গাথাগুলির রচয়িতার নাম প্রায়ই পাওয়া গিয়াছে, কেন না সেই সময়ে রচয়িতা আপন রচনা লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে প্রায়ই ভণিতায় নিজের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী

পর্যন্ত রচিত কিছু কিছু গাথাকাব্য এবং মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চল হইতে চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি গাথাকাব্যের রচয়িতার নাম ও পরিচয় জানা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্যন্ত প্রাচীন গাথাকাব্য রচয়িতাগণের যে কয়েকটি নাম সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজন ব্যতীত সকলেই পুরুষ। মহিলা কবি দুইজন মৈমনসিংহ অঞ্চলের লোক। মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর নাম আজ শিক্ষিত মহলে সুপরিচিত। ইনি সুপ্রসিদ্ধ 'মনসা ভাসান' গায়ক কবি বংশীদাসের সুযোগ্যা কন্যা। ইঁহার দুঃখময় জীবন কাহিনী লইয়াও পল্লীকবিরচিত গাথা পাওয়া গিয়াছে। অপরকবির নাম সুলক্ষণা। ইঁহার নাম বিশেষ পরিচিত নহে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে, মৈমনসিংহ অঞ্চলে 'সুলক্ষণা' বা 'সুলাকবি'র নাম বিশেষ পরিচিত ছিল। ইনি নীচ কুলোদ্‌ভবা হইলেও, কবিপ্রতিভাবলে জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রাপ্ত গাথাগুলিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা লক্ষিত হয় এবং এইখান হইতেই দুইজন মহিলা কবির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাতে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের নারীগণের মধ্যে মৈমনসিংহের গ্রাম্যনারীগণই কিছুটা আলোকপ্রাপ্তা হইয়াছিল। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে এ পর্যন্ত যত গাথাকাব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যনারীগণের ভিতর স্ত্রী-স্বাধীনতা অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

প্রাচীন গাথাকাব্যগুলিকে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা গ্রাম্যসমাজের সবাক-চিত্র বলা যাইতে পারে। উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়,—

"গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক জীবন সুখ সম্ভোগের আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে, তালে বাজাইয়া তোলে সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।...সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা-আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্যহিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়,—তাহারাই ইহার

ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবি গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে, সেই জন্যই বাঙ্গালীর কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।"

('গ্রাম্য সাহিত্য'—রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড)

১

প্রণয়গাথাগুলির রচনাকাল গাথাকাব্যের উৎপত্তিকালের পরবর্তী হইলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ইহারাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কারণে প্রণয়গাথাগুলিকে গাথাকাব্যের প্রথম ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রণয়গাথাগুলির মধ্যেই আমরা সর্বপ্রথম লৌকিক প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত বাংলাসাহিত্যের পরিচয় লাভ করি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণ লৌকিক প্রেমকাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিলেও, ঐ সকল কাব্যকাহিনীর পাত্র-পাত্রীগণ অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত অথবা কৃষক-সমাজের নরনারীও যে সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে, তাহাদের তুচ্ছ প্রণয়-লীলাও যে কবির কাব্যে মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে, এই সকল প্রণয়-গাথার মধ্য দিয়া গ্রাম্যকবিগণই সর্বপ্রথম তাহা দেখাইলেন। পরবর্তী কালে রচিত বাংলা সামাজিক উপন্যাসে পল্লীকবি রচিত প্রণয়গাথার প্রভাব লক্ষিত হউক আর নাই হউক, অশিক্ষিত পল্লীকবিগণই যে সর্বপ্রথম এই দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ইহার গৌরব বিন্দুমাত্র কম নয়। বিশেষতঃ গ্রাম্য সমাজপতিগণের ভ্রূকুটিকুটিল শাসনকেও অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাধারণ নরনারীর লৌকিক প্রণয়লীলা লইয়া রচিত গাথাকাহিনী গাহিয়া বেড়াইতেন। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' হইতেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম প্রণয়-কাহিনীর সূত্রপাত। বাংলা বৈষ্ণবকাব্যে প্রণয়লীলাই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কাব্যে—"কানু ছাড়া গীত নাই।" প্রণয়লীলাঘটিত সাধারণ কাহিনীও রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত করিয়া রচনা করিবার পশ্চাতে প্রাচীন কবিগণ কর্তৃক সমাজশাসনকে সুকৌশলে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টাই প্রকটিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা লইয়া রচিত বহু কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল রচনাও তখনকার বাংলাসাহিত্যে অবাধে স্থান পাইয়াছে, বাংলাদেশের সমাজপতিগণও তাহা মানিয়া লইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ নামের বর্ম ধারণ করিয়া এই সকল

রচনা সফল সমালোচনার হাত এড়াইয়াছে। গ্রাম্যকবির রচনায় সাধারণ নরনারীর অবাধ প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাতে কুরুচি বা কুদৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ মেলে না। অথচ ধর্মের মুখোশাবৃত মঙ্গলকাব্য-গুলিতে অশ্লীলতা অবাধে স্থান পাইয়াছে। যে কয়েকটি প্রণয়গাথায় সামান্য অশ্লীলতাপূর্ণ কুরুচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহাও অভিজাত সাহিত্যের প্রভাব-জনিত বলিয়াই মনে হয়। প্রণয়গাথাগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজে সুদৃষ্টান্ত স্থাপনের উদাহরণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে এই সকল প্রণয়গাথার প্রচারের দ্বারা জনসমাজের স্বেচ্ছাচারী হইবার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় সমাজকর্তারাও এই সকল গাথার প্রচারে কোনোরূপ বাধা দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। প্রণয়গাথাগুলির অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদনই ইহাদিগকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজের নরনারী বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে সরল নির্ভীক জীবনযাপন করিত এবং সরল স্বার্থশূন্য প্রেমের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইত। একলক্ষ্য প্রেমের মর্যাদা স্থাপনে সেকালের বঙ্গনারীগণ কোনও বাধাকেই বাধা জ্ঞান করিত না। প্রণয়গাথাগুলি তাহারই নিদর্শন। তখনকার দিনে গ্রাম্যসমাজের সুন্দরী যুবতীগণ জমিদারদিগের হস্তে কিরূপ নির্যাতিত হইত, এই সকল প্রণয়গাথা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত রূপকথামূলক প্রণয়কাহিনীও গ্রাম্যসমাজে সুপ্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল হইতে এইরূপ রূপকথামূলক প্রণয়গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। লৌকিক প্রণয়গাথার অধিকাংশই পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

২

গাথাকাব্যের দ্বিতীয় ধারা হইতেছে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত গাথা। বিভিন্ন জনশ্রুতিমূলক ঐতিহাসিক কিংবদন্তী অথবা সমসাময়িক কোনও প্রসিদ্ধ স্থানীয় ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া গ্রাম্যকবিগণ সুন্দর সুন্দর ছোট-বড় গাথাকাব্য রচনা করিতেন। এই সকল রচনায় সত্য ঘটনার সহিত কবি-কল্পনাও আশ্রয় পাইত। একই কাহিনী লইয়া বিভিন্ন কবি রচিত গাথাকাব্যের পার্থক্য হইতেই অনুমান করা যায় যে, কাহিনীগুলি কল্পনার রঙে রঞ্জিত হইত।

রাজা বা রাজকাহিনী লইয়া রচিত গাথাগুলিতেই কল্পনার মিশ্রণ অধিক লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনা লইয়া রচিত একই কাহিনীর উপর বিভিন্ন গাথার সাদৃশ্য হইতে অনুমান করা যায় যে, এই সকল গাথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষদর্শী কবি কর্তৃক রচিত হওয়ার ফলে এই সকল রচনায় কবি-কল্পনা কম থাকিত। এইসকল গাথা হইতে এমন অনেক রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায় যাহা কখনও বাংলার ইতিহাসে স্থান পায় নাই। প্রাচীনকাল হইতেই নদনদীপ্রধান বাংলাদেশ বন্যার তাণ্ডবলীলায় বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। গ্রাম্যকবিরচিত গাথার অন্তর্গত বন্যাকাহিনী হইতে বাংলা দেশের বন্যাবিধ্বস্ত রূপ ফুটিয়া ওঠে। রাজকাহিনী লইয়া রচিত ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাহিনীগুলির অধিকাংশই জনশ্রুতিমূলক হওয়ার ফলে এই সকল গাথার মাধ্যমে জনগণের মনে অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইত। মোটের উপর, ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাব্যগুলির মূল্য গাথাকাব্য হিসাবেই নিরূপিত হওয়া উচিত। এইসকল গাথা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যুক্তিসঙ্গত না হওয়াই স্বাভাবিক। ইতিহাস পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু গাথাকাব্য পরিবর্তনশীল—পরিবর্তন গাথার ধর্ম। সুতরাং ইতিহাসের উপাদান না খুঁজিয়া, কেবলমাত্র গাথাকাব্য হিসাবেই ইতিহাসাশ্রিত গাথাগুলির রসগ্রহণ করা উচিত বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসাশ্রিত গাথাকাব্যের মধ্যে যেগুলি বহুল প্রচার লাভ করে নাই, অথবা যেগুলি রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলিতে কল্পনাশূন্য সত্য ঘটনাই স্থান পাইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। জনগণের আনন্দবর্ধনের নিমিত্তই গাথাকাব্য রচিত ও প্রচারিত হইত। সুতরাং রসহীন সত্য ঘটনা অপেক্ষা কল্পনারসাশ্রিত ঘটনাই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিত। এই কারণেই অধিকাংশ ঐতিহাসিক গাথাই পরিবর্তিত হইতে হইতে মূল ঘটনাকে বিকৃত করিয়া ফেলিত।

৩

ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিকে গাথাকাব্যের তৃতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ধর্মানুষ্ঠানমূলক গীতি হইতেই ধর্মাশ্রিত গাথাকাব্যের উৎপত্তি। ধর্মাশ্রিত গাথাগুলি হইতেই বাংলাসাহিত্যের গাথাকাব্যের উৎপত্তি,

এই হিসাবে ধর্মাশ্রিত গাথাগুলি বাংলা গাথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইবার অধিকারী। বিভিন্ন জাতীয় গাথাকাব্যগুলির ভিতর ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিই সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই কারণে একই কাহিনী লইয়া রচিত একাধিক কবির একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গে রচিত ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিতে শিব, পার্বতী ও যোগীসিদ্ধাগণই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে রচিত গাথাগুলিতে শিব, পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ এবং রামের প্রাধান্যই অধিক লক্ষিত হয়। উত্তর-পূর্ববঙ্গের গাথাগুলিতে গাজী, পীর ইত্যাদির মাহাত্ম্যবর্ণনা স্থান পাইয়াছে। এইরূপে অঞ্চলবিশেষে বিভিন্ন দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মাশ্রিত নানাবিধ গাথা রচিত হইত। ধর্মাশ্রিত গাথাগুলি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দেব-দেবীকে লইয়া রচিত হইলেও ইহাদের ভিতর দিয়া কোনও ধর্মপ্রচারের চেষ্টা স্থান পায় নাই। নাথগীতিকাগুলির মধ্য হইতে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সংযম ও বৈরাগ্য সাধনার বাণী প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাম্যকবিগণের গৃহস্থালী চিত্র বর্ণনায় শিব-দুর্গা লৌকিক আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল গাথায় শিব-দুর্গা পুরাণের অন্তর্গত দেব-দেবী নহেন—তাঁহারা সাধারণ মানুষ, গ্রাম্যসমাজের গৃহদম্পতী। গ্রাম্য গাথার অন্তর্গত রাম, কৃষ্ণ হিন্দুর দেবতা নহে, তাহারা দুরন্ত গ্রাম্য বালক। কেবলমাত্র পীর-মাহাত্ম্যগুলিতে ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল গাথার মাধ্যমে মুসলমান ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়। ইহা তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের প্রভাবপ্রসূত বলিয়া মনে হয়।

৪

ধর্মাশ্রিত গাথাগুলিরই অপর একটি ধারা নীতিকথাশ্রিত গাথা। বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে এই শ্রেণীর গাথাকাহিনী সুপ্রচলিত ছিল। নীতিশিক্ষা বাংলাদেশের প্রাচীন শিক্ষা। প্রাচীনকালে সর্বপ্রথম দেব-দেবীর দৃষ্টান্ত ধরিয়াই নীতিশিক্ষা প্রচারিত হইত। কালক্রমে সাধারণ নরনারী এবং এমন কি জীবজগৎকে লইয়াও ছোট ছোট নীতিমূলক কাহিনী রচিত হইতে থাকে এবং গাথার আকারে প্রচার লাভ করিতে থাকে। এই সকল নীতিগাথা

যে সর্বপ্রথম কবে রচিত হয় তাহা আজ নির্ণয় করা সম্ভব নয়, তবে ধর্মাশ্রিত গাথা রচনায় সমসাময়িক কালেই ইহারাও রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী কালে এই সকল নীতিগাথা বিভিন্ন রাজকাহিনীমূলক কাব্যে স্থান পায় নীতিকথাশ্রিত গাথাগুলি এইরূপে বিভিন্ন কাব্যকাহিনীর অন্তর্গত হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্রভাবে তাহাদিগের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও যে কয়েকটি বিশুদ্ধ নীতিকথাশ্রিত গাথা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই সকল রচনা একেবারেই অর্বাচীন গ্রাম্য ভাষায় রচিত। কাহিনীর অন্তর্গত নীতিকথাটিই মূল বক্তব্য বিষয়। কবির সমস্ত প্রচেষ্টা নীতিপ্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকায় এই শ্রেণীর গাথাগুলি একেবারেই কাব্যসৌন্দর্য বর্জিত।

৫

গাথাকাব্যের পঞ্চম ধারা বারমাসী গাথা। প্রাচীন গাথাকাব্যের মধ্যে বারমাসী গাথাগুলিই সর্বাপেক্ষা বেশী কাব্যসৌন্দর্যের অধিকারী। প্রাচীনকালে বৎসরের অন্তর্গত বারমাস অথবা ছয় ঋতুর বর্ণনা মাধ্যমে বিরহ, মিলন, বাৎসল্য ইত্যাদি রসাশ্রিত ছোট ছোট কাহিনীমূলক গীত রচিত হইত। এই সকল গীতে কাহিনী অপেক্ষা প্রকৃতি অথবা নায়ক-নায়িকার হৃদয়ভাব বর্ণনার প্রাবল্যই অধিক লক্ষিত হইত। বারমাসী গাথাগুলিতে গ্রাম্যকবির কবিত্ব প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ষড়ঋতুভেদে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বর্ণনার এরূপ প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের আর কোথাও লক্ষিত হয় না। কাহিনী বর্ণনা প্রাধান্য লাভ না করিলেও কবির রচনাগুণে প্রাকৃতিক বর্ণনার পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর ইঙ্গিতমূলক পরিচয় আপনিই প্রকাশ পায়। এই কাহিনীর মাধ্যমে কখনও বিরহিণী নায়িকার অন্তর্দাহ, কখনও প্রণয়-প্রণয়ীর মিলনান্তে মধুর রসের সমাবেশ এবং কখনও বা পুত্রশোকাতুর নারীর হৃদয়াবেগ বর্ণিত হইয়াছে। বারমাসী গাথাগুলিও কালক্রমে বিভিন্ন কাহিনীকাব্যের অন্তর্গত হইয়াছে। তবুও প্রাচীন কবিগণের ভিতর বারমাসী গীত রচনার এমনই প্রাচুর্য ছিল যে, এখনও বহু বারমাসী গীত স্বতন্ত্র আকারে বাংলা লোকসাহিত্যের শোভা বর্ধন করিতেছে।

৬

আধুনিক গাথাকাব্য গাথাসাহিত্যের ষষ্ঠধারা। প্রাচীন গাথাকাব্য আলোচনায় ইহার স্থান না হইলেও, এই গাথাগুলি হইতে আমরা প্রাচীন নিরক্ষর গ্রাম্যকবি ও আধুনিক শিক্ষিত কবির রচনার তুলনামূলক আলোচনায় আসিতে পারি। ইংরাজী সাহিত্য প্রভাবিত আধুনিক গাথাগুলি শিক্ষিত কবিগণের কাব্যপ্রতিভার দৃষ্টান্তস্বরূপ। আধুনিক গাথাকাব্য ও কবিতাগুলিতে কাহিনীবর্ণনা অপেক্ষা ছন্দ, অলঙ্কার এবং ভাবপ্রকাশের মাধুর্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আধুনিক গাথাকাব্যগুলির ভিতর দিয়া আমরা যে সুন্দর ছোট ছোট কাহিনীগুলি পাই, তাহারা বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের অগ্রদূত হইবার যোগ্যতা রাখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত গাথাগুলি আধুনিক গাথাকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্র ণ য় গা থা

বাংলায় যে সব রচনাকে গাথা নাম দিতে পারা যায় তাহার মধ্যে প্রণয়গাথার সংখ্যাই বেশী। ইহার মধ্যে কতকগুলি একেবারে বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী লইয়া রচিত এবং কতকগুলিতে প্রণয়কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর মন প্রেমপ্রবণ। তাই প্রাচীনকাল হইতেই বাংলা সাহিত্যে আদি বা প্রণয়রসের আধিক্য দেখা যায়। এই গাথাগুলি নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেম লইয়া রচিত। বাঙ্গালী নারীজাতির সতীত্বের বর্ণনায় তখনকার গ্রাম্যকবিগণ আপনাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ আবেগ ঢালিয়া দিয়াছেন। এই গাথাগুলির আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, শত দুঃখ-দারিদ্র্য এবং নির্যাতনের মধ্যেও সেকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে নারীজাতি আপন সতীত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্যকবির মুখেও তাহাদের গুণগান প্রচারিত হইত। এই প্রণয়গাথাগুলির অধিকাংশের মধ্যেই নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং স্বভাবতঃই তুলনামূলকভাবে পুরুষজাতিকে অপেক্ষাকৃত হীন করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই একদেশদর্শিতার ফলে অধিকাংশ প্রণয়গাথাই একসুরে ধ্বনিত হইয়া বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতা হারাইয়াছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য কম, কেবলই কয়েকটি মাত্র বিষয়ের অনুকরণ ও অনুসরণ। গাথাগুলিতেও সেই দোষ লক্ষিত হয়। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী লইয়া রচিত হইলেও অধিকাংশ প্রণয়গাথারই মূল সুরে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, গ্রাম্যকবিগণ সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা করিতে পারিতেন না, অথবা করিতে সাহসী হইতেন না। অন্য রচয়িতা অথবা গায়েনের গাথা হইতে সামান্য সূত্র ধরিয়া লইয়া তাহার উপরেই তাঁহারা রঙ ফলাইতেন। মৌলিক উপাদানবর্জিত প্রণয়গাথাগুলি এইরূপে একই ভাবের দ্যোতনা করিত। অধিকাংশ প্রণয়গাথাতেই আমরা নারীকে দেখিতে পাই সহনশীলা, সর্বগুণসম্পন্না, সুন্দরী এবং সর্বোপরি পতিব্রতারূপে এবং এই নারীর

পার্শ্বে পুরুষকে দেখি ভীরু, দুর্বল, বিশ্বাসহন্তা ও লোভীরূপে। অবশ্য দুই-একটি গাথার ভিতর কচিৎ কখনও ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। যথাকালে তাহা আলোচনা করিব। এখন প্রণয়গাথাগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া পৃথকরূপে তাহাদের আলোচনা করা হইল।

প্রণয়গাথাগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথাগুলি হইতে। এই গাথাগুলি সংগ্রহ করাইয়া ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন নিজের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চারিটি বাংলা ও চারিটি ইংরাজী খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন "মৈমনসিংহগীতিকা" ও "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" নামে। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেনের মতে এই ছাপা গাথাগুলিতে সম্পূর্ণ মৌলিকরূপ বজায় রাখা হয় নাই। স্থানে স্থানে মার্জিত হাতের স্পর্শে গাথাগুলি সংস্কৃতরূপ পাইয়াছে। তবুও আমরা এই গাথাগুলি হইতে সেকালের অশিক্ষিত গায়েনদের রচনাশক্তির যে পরিচয় পাই তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। যতই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লাভ করুক মূল গাথাগুলির ভাবধারা যে অবিকৃত আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। হয়তো ভাষা খানিকটা অর্বাচীন ছিল এবং ভাবপ্রকাশের বিষমতায় স্থানে স্থানে ঐগুলি শ্রুতিকটু লাগিত, কিন্তু বর্ণনার মাধুর্যে ও ভাবের ঐকান্তিকতায় এই সমস্ত গ্রাম্য অশিক্ষিত রচয়িতা অথবা গায়েনরা যে সেকালের জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করিত তাহাতেই এই গাথাগুলির মূল্য নিরূপিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত গাথাগুলির ভিতর হইতে এ পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক প্রণয়-গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। মনে হয় প্রণয়গাথা অপেক্ষা ধর্মীয় সংস্কার-সংক্রান্ত গাথার প্রচলনই পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রণয়গাথার সংখ্যালঘুতার জন্য দায়ী। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিশুদ্ধ প্রণয়গাথার মধ্যে পাই স্বরূফের "দামিনী চরিত্র"। এই গাথাটি বিশুদ্ধ প্রণয়গাথা হইলেও বারমাসের মাধ্যমে বর্ণিত বলিয়া ইহাকে বারমাসী গাথার পর্যায়ে ফেলিয়াছি। সুতরাং এই গাথাটি সম্বন্ধে সেখানেই আলোচনা করিব। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আর একটি বিশুদ্ধ প্রণয়গাথা "শশিসেনা" বা "সখীসেনা"। বর্ধমান নিবাসী বৈদ্য-বংশোদ্ভব কবিভূষণ ফকীররাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গাথাটি লিপিবদ্ধ করেন। "সখীসেনা"র প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১০৮১ মল্লাব্দ (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ); (বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫২)। "সখীসেনা গান"-এর আর একটি পুঁথির লিপিকাল হইতেছে

১০৮৩ মল্লাব্দ . (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ)। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির তালিকায় ১৮০৮ সংখ্যক স্থান পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আর একটি প্রণয়গাথার নাম "চন্দ্রমুখীর পুঁথি"। এই গাথাটি বহুদিন পূর্বে সিলেটী নাগরী হরফে ছাপা হইয়াছিল। রচয়িতা খলিল সম্ভবতঃ সিলেটের লোক ছিলেন। বাংলা অক্ষরের পুঁথিটি প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সালে। শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুর রহমান মিয়া ইহা প্রকাশিত করেন। পুঁথিটির ভাষা পাঠ করিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে, প্রকাশিত যবেই হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই ইহা বাংলাদেশে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই পুঁথির ভণিতাতেও রচয়িতার নাম খলিল পাই। পুঁথিটিতে নানাবিধ রাগের নামোল্লেখ দেখিয়া বোঝা যায় যে, এই গাথাটি পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে গীত হইত। পশ্চিমবঙ্গে রচিত আর একটি গাথা সৈয়দ হামজার "মধুমালতী"। "মনোহর-মালতী" উপাখ্যানের উল্লেখ আছে লোরচন্দ্রানী কাব্যের আলাওল রচিত অংশে। হিন্দীতে এই বিষয়ের রচনা পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ে একাধিক বাঙ্গালী কবিও এই বিষয় লইয়া গাথা রচনা করিয়াছিলেন। মুসলমান কবিদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বোধ হয় মোহম্মদ কবীর ; (ইসলামী বাংলা সাহিত্য—সুকুমার সেন, পৃঃ ৪১)। সৈয়দ হামজার "মধুমালতী" লেখা হইয়াছিল ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে। "ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকালে সৈয়দ হামজা অল্পবয়সী বালক ছিলেন। ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি উদনা গ্রাম। হামজা ইহার চারি মাইল দূরবর্তী মৌজা বসন্তপুর নামক গ্রামে জীবন কাটাইয়াছিলেন।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। আধুনিক যুগ।—মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পৃঃ ২৪)। উত্তর-বঙ্গের সাকের মামুদ "মধুমালা-মনোহর" লিখিয়াছিলেন ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে, বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ; (ইসলামী বাংলা সাহিত্য—সুকুমার সেন, পৃঃ ৪১)। "কুতবনের মৃগাবতী কাব্যের অনুসরণ করিয়া দুইজন হিন্দু ও একজন মুসলমান কবি গাথা রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দু কবিদ্বয় প্রাচীন, সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের। মুসলমান কবি আধুনিক কালের, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের। 'দ্বিজ' পশুপতির কাব্য মুসলমান পাঠক সমাজে সুপরিচিত ছিল। তাঁহাদের পুঁথি অবলম্বনেই কাব্যটি 'চন্দ্রাবলী' নামে ছাপা হইয়াছে কাহিনী যে প্রাচীন তাহা বোঝা যায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাঙ্গা শ্লোকের ও প্রহেলিকার অস্তিত্ব হইতে। গাথাটিতে কবির কোনও পরিচয় নাই।" (ইসলামী বাংলা সাহিত্য—সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৪)।

আর একটি গাথার নাম "মাধবানল-কামকন্দলা"। ইহা অপভ্রংশ সাহিত্যের একটি বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী। ইহা আর্যাবর্তের সর্বত্র আদৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশেও ইহার বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বাংলায় লিখিত কোনও পুঁথি আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গের মুসলমান গ্রাম্য কবিরা স্থানীয় কিংবদন্তীর উপর রঙ ফলাইয়া ছোট-বড় নানারকমের 'কেচ্ছা' গাথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গাথাগুলিতে কবির কবিত্বগুণ কিছুই দেখা যায় না। মামুলী বর্ণনা। কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে ও উত্তেজক বর্ণনার মাধ্যমে গাথাগুলিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। কাব্য-সৌন্দর্য বিশেষ না থাকিলেও কাহিনীগুলি যে বিভিন্ন অঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা যায় একই কাহিনী লইয়া বিভিন্নরূপে রচিত 'কেচ্ছা' গাথাগুলি পাঠ করিলে। এইরূপ কতকগুলি কেচ্ছার নাম, আরিফের "লালমোহনের কেচ্ছা", মোহাম্মদ ইউনুছের "আব্দুল আলি গারুলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুঁথি", মোযাজ্জেম আলিকৃত "ভেলুয়া সুন্দরীর কাহিনী", সাহ জোবেদ আলি রচিত "ছহি রাজকন্যা মধুমালা মদনকুমার", "কাঞ্চনমালা ও পিরূক সদাগরের পুঁথি" (জিন্নতালি রচিত), "কাঞ্চনমালার কেচ্ছা", ইত্যাদি।

এখন প্রণয়গাথাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের অন্তর্গত কাহিনীগুলি বর্ণনা করিলে দেখা যায় যে, গাথান্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলিকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রণয়গাথা—

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথাগুলি চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতির দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া দীনেশচন্দ্র সেন যে আকারে প্রকাশিত করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি—

১। **মহুয়া**—রচয়িতা দ্বিজ কানাই

উত্তরে গারো পাহাড়ের নিকট হুমরা বাইদ্যার দল বাস করিত। নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাহারা কাঞ্চনপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছয়মাসের পরমাসুন্দরী শিশুকন্যাকে চুরি করিয়া আনিল। হুমরা বাইদ্যার স্ত্রী পরমাসুন্দরী কন্যা পাইয়া আনন্দিতা হইয়া তাহার নাম রাখিল 'মহুয়া সুন্দরী'।

ক্রমে মহুয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া বেদেদের নানা প্রকারের ক্রীড়াকৌতুক আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা দলবল সহ নানাস্থানে খেলা দেখাইয়া বেড়ায়। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা বামনকান্দা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। এই গ্রামের নত্থার চান (নদীয়ার চাঁদ) জননীর অনুমতি লইয়া বেদেগণকে তামাসা প্রদর্শনে নিযুক্ত করিল। এই খেলা প্রদর্শনকালে মহুয়ার অনিন্দনীয় রূপদর্শনে নত্থার চান মুগ্ধ হইয়া গেল এবং বাড়ি ও জমি দিয়া বেদেদিগকে সেখানে বসত করাইল।

ক্রমে ক্রমে জলের ঘাটে দেখাশোনার মাধ্যমে মহুয়া ও নদীয়ার চাঁদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম সঞ্চারিত হইল। অন্তরঙ্গ পালঙ সইয়ের কাছে মহুয়া নিজ দুর্দশার কথা ব্যক্ত করিল। ক্রমে এই কথা হুমরা বেদের কানে উঠিল এবং সে মাইন্‌কিয়া নামক বেদের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই দেশ ছাড়িয়া চলিল। মহুয়ার মুখে বেদেদের চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া নত্থার ঠাকুর মহুয়াকে লইয়া দেশান্তরী হইতে চাহিল। মহুয়া তখন অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া নদীয়ার চাঁদকে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে পথের সন্ধান দিয়া গেল যে, সে যেন মহুয়ার বাড়ি গিয়া অতিথি হয়। বেদের দল চলিয়া গেল।

নদের চাঁদ মায়ের কাছে বিদায় লইতে গেল, কিন্তু অভাগিনী মাতা বাধা দেওয়ায়. রাত্রি নিশাকালে গ্রাম ছাড়িয়া মহুয়ার খোঁজে চলিল। এইরূপে "বাইন্থার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল।"

নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে নদীয়ার ঠাকুর মহুয়ার দেখা পাইল। বহুদিন পরে দয়িতকে কাছে পাইয়া মহুয়া প্রাণের সাধ মিটাইয়া তাহার পরিচর্যা করিল। রাত্রে মহুয়া ও নদীয়ার ঠাকুর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, এই সময় হুমরা বেদে মহুয়াকে জাগাইয়া নদের চাঁদকে হত্যা করিবার জন্য তাহার হাতে বিষলক্ষের ছুরি দিল। কিন্তু প্রেমেরই জয় হইল। মহুয়া নদের চাঁদকে বধ করিতে পারিল না। তখন দুইজনে বেদেদের অলক্ষিতে তাজী ঘোড়ায় চড়িয়া নদীর পারে গিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিল। এই সময় এক সাধুর ডিঙ্গা নদী বাহিয়া যাইতেছিল। মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া সাধু তাহাদিগকে ডিঙ্গায় তুলিয়া লইল। কন্যার রূপে পাগল হইয়া সাধু নত্থার ঠাকুরকে জলে ফেলিয়া দিল। মহুয়া তাহাকে রক্ষা করিতে গেলে সাধু বাধা দিল এবং তাহাকে বহু প্রলোভন দেখাইল। মহুয়া তখন বিষ দিয়া পান সাজিয়া

সাধুকে খাইতে দিল। মাঝি মাল্লা সকলেই বিষমিশ্রিত পান খাইয়া ঢলিয়া পড়িল। মহুয়া তখন ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিয়া এবং কুড়াল মারিয়া ডিঙ্গার তলা ফুটা করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সাধুর নাও ভরাডুবি হইল।

নদীর কূলে কূলে বনের মধ্যে মহুয়া নদের চাঁদকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ভাঙ্গা মন্দিরে আশ্রয়ের আশায় প্রবেশ করিয়া সেখানে নদের চাঁদকে মৃতাবস্থায় দেখিল। এই সময় জটাদাড়ি সমন্বিত এক সন্ন্যাসী মন্দিরে প্রবেশ করিল। হায়! রূপের এমনই মোহ—মহুয়ার রূপে সন্ন্যাসীরও মন টলিল। অনেক কষ্টে সন্ন্যাসীদ্বারা স্বামীকে বাঁচাইয়া লইয়া মহুয়া একদিন রাত্রে চুপি চুপি নদের চাঁদকে কাঁধে ফেলিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় হইতে পলাইল। ছয় মাস পরে নদের চাঁদ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। মহুয়া এবং নদের চাঁদ বনের ভিতর সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

হঠাৎ একদিন দূর হইতে শিকারীর বাঁশী শুনিতে পাইয়া মহুয়া একান্ত বিষন্ন হইয়া পড়িল, কারণ এই বাঁশীর আওয়াজ দ্বারা তাহার পালঙ সই তাহাকে হুমরার দলের আগমন সঙ্কেত করিয়া সাবধান করিতেছে। অবশেষে হুমরার দল আসিয়া পড়িল। হুমরা বেদে গর্জন করিয়া মহুয়ার হস্তে পুনরায় বিষলক্ষের ছুরি তুলিয়া দিল, এবং নদের চাঁদকে বধ করিতে বলিল। মহুয়া তখন একবার পালঙ সই ও আরেকবার পতির পানে চাহিয়া বিলাপ করিতে করিতে ছুরি আপন বক্ষে আমূল বসাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। হুমরার আদেশে বেদের দল নদের চাঁদের প্রাণবধ করিল।

মহুয়ার এই শোচনীয় পরিণতিতে হুমরা বেদের মন ভাঙ্গিয়া গেল—সে সত্য সত্যই মহুয়াকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিত ও ভালবাসিত। হুমরা অনেক কাঁদিল এবং অনুতপ্ত হুমরার আদেশে মহুয়া ও নদের চাঁদের মৃতদেহ পাশাপাশি শোয়াইয়া কবর দেওয়া হইল। এইরূপে সতীসাধ্বী মহুয়া মরণপারে আপন স্বামীর সহিত মিলিত হইল।

মহুয়ার পালঙ সই মহুয়ার কবরের উপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। সে বনের ফুল দিয়া কবর সাজায় এবং—

"পালঙ সই-এর চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা।
এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চাঁদের কথা॥"

২। **মলুয়া**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই গাথাটির আরম্ভে চন্দ্রাবতীর একটা বন্দনা আছে। সেইজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পালাটিই চন্দ্রাবতীর রচনা। কিন্তু এই অনুমান সঠিক বলিয়া মনে হয় না।

জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষে দেশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। চান্দ বিনোদকে তাহার মাতা মাঠে যাইতে বলিল। এইস্থানে পল্লীগ্রামের বারমাসী সুখ-দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। একটি বছর কাটিয়া গেল—ঘরে কিছু নাই। বিনোদ তখন কুড়া শিকারে যাইবার জন্য মায়ের অনুমতি চাহিল। উপবাসী পুত্রকে শিকারে পাঠাইয়া মাতা গৃহে পাগলিনীর ন্যায় দিন কাটাইতে লাগিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে বিনোদ আড়ালিয়া গ্রামে আসিয়া পড়িল। একটি পুকুরের পারে কুড়া রাখিয়া বিনোদ কদম গাছের তলায় নিদ্রা গেল। মলুয়া সন্ধ্যাবেলা জল নিতে আসিয়া চাঁদ বিনোদকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল ও তাহার মন সমর্পণ করিল। এইখান হইতেই তাহাদের পূর্বরাগের সূচনা।

বিনোদ তাহার মনের কথা দিদির নিকট ব্যক্ত করিল। বিনোদের দিদির কাছে বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনোদের মা ঘটক পাঠাইলে, এই দুঃখ-দারিদ্র্যের সংসারে তাহার আদরের একমাত্র কন্যা মলুয়াকে বিবাহ দিতে পিতার মন সরিল না। বিনোদ ইহা শুনিয়া কুড়া শিকারে যাইয়া অনেক ধন উপার্জন করিল ও তৎপরে মলুয়াকে বিবাহ করিল।

সুখে দিন কাটিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন দেশের কাজী স্নানের ঘাটে মলুয়াকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং দুষ্ট কাজীর ষড়যন্ত্রে বিনোদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। মলুয়া তাহার সকল গহনা বেচিয়া সংসার চালাইতে লাগিল। এই দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া চাঁদ বিনোদ একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া উপার্জনের চেষ্টায় বাহির হইয়া গেল।

শাশুড়ীকে লইয়া বড় দুঃখে মলুয়ার দিন কাটে। মলুয়ার মা তাহার দুঃখের খবর পাইয়া তাহার পাঁচ ভাইকে পাঠাইল। কিন্তু স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া মলুয়া কোথাও গেল না।

কিছুদিন পরে উপার্জন করিয়া বিনোদ বাড়িতে ফিরিল। পুনরায় উভয়ের মিলনে সুখে দিন কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কাজীর চক্রান্তে বিনোদের উপর 'পরওয়ানা' জারি হইল। কাজীর লোক আসিয়া বিনোদকে ধরিয়া লইয়া

গেল। মলুয়া তখন সকল খবর দিয়া পালা কোড়ার মারফত ভাইদের নিকট চিঠি পাঠাইল। পাঁচ ভাই বিনোদকে উদ্ধার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল কাজীর লোক মলুয়াকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মনের দুঃখে মাতা ও পোষা কোড়া লইয়া বিনোদ দেশান্তরী হইল।

কাজী মলুয়াকে দেওয়ানের কাছে দিয়াছে। দেওয়ান মলুয়াকে নিকা করিতে চাহিলে, ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মলুয়া তিন মাস সময় চাহিল। তিনমাস পরে দেওয়ান পুনরায় মলুয়ার কাছে আসিল। মলুয়া তখন প্রথমে কাজীর প্রাণদণ্ডের হুকুম করাইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিল। তারপর মলুয়ার নির্দেশে নৌকা সাজাইয়া দেওয়ান মলুয়াকে সঙ্গে করিয়া কোড়া শিকারে বাহির হইল। মলুয়া পালা কোড়া ছাড়িয়া ভাইদের নিকট সংবাদ পাঠাইল। খবর পাইয়া পাঁচ ভাই পানসী লইয়া মলুয়াকে উদ্ধার করিয়া আনিল। মলুয়া স্বামীর সহিত গৃহে ফিরিল।

কিন্তু আত্মীয়-স্বজন মলুয়াকে সমাজে লইতে রাজী হইল না। কেন না সে তিনমাস মুসলমানের গৃহে ছিল। বিনোদ তখন জ্ঞাতিকুটুম্বগণের পরামর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মলুয়াকে ত্যাগ করিল। মলুয়ার এই দুঃসময়ে তাহার ভাইরা তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু আপন স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া মলুয়া কোথাও যাইতে রাজী হইল না। 'বাইর কামুলী'র কাজ করিয়া সে স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল এবং তাহারই অনুরোধে বিনোদ পুনরায় বিবাহ করিল।

একদিন বিনোদ কোড়া শিকারে বাহির হইয়াছে হঠাৎ একটা কালসাপ তাহাকে দংশন করিল। পথের লোক বাড়িতে খবর দিল। মা কাঁদিতে লাগিল। মলুয়া তখন পাঁচ ভাইকে সঙ্গে লইয়া মৃতস্বামীসহ নৌকায় করিয়া গাড়রী ওঝার বাড়ি গেল। ওঝা বিষ নামাইয়া দিতেই বিনোদ ভাল হইয়া গেল।

বিনোদকে বাঁচাইয়া লইয়া মলুয়া যখন ঘরে ফিরিল তখন সকলেই তাহাকে ঘরে তুলিয়া লইতে বলিল। কিন্তু বিনোদের মামা, পিশা প্রভৃতি কয়েকজন জ্ঞাতি প্রবল আপত্তি জানাইল। মলুয়া তখন চিন্তা করিল যে, সে যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার স্বামীর কলঙ্ক ঘুচিবে না। সুতরাং, তাহার প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই উচিত। মলুয়া একটি ভাঙ্গা নৌকায় উঠিয়া বসিল।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে মাঝ দরিয়ায় যখন পৌছিল তখন ভাঙ্গা নায়ে জল উঠিয়া নৌকা প্রায় ডুবু ডুবু। তীরে দাঁড়াইয়া তাহার শাশুড়ী, ননদ সকলে তাহাকে ফিরিবার জন্য কত অনুরোধ করিল। কিন্তু মলুয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ। বিনোদ কাঁদিতে লাগিল। মলুয়া গুরুজনদিগকে প্রণাম ও সমবয়স্কদিগকে প্রীতি জানাইয়া অতলে তলাইয়া গেল।

৩। **চন্দ্রাবতী**—রচয়িতা নয়ানচাঁদ ঘোষ।

চন্দ্রাবতী সুবিখ্যাত মনসাভাসান লেখক কবি বংশীদাসের কন্যা। পিতা ও কন্যা একত্রে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দেবীর ভাসান রচনা করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী বাঙ্গলাভাষায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন। চন্দ্রাবতী চরিত্র ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, নয়ানচাঁদ রচিত এই গাথাটিতে তাঁহার জীবনের যে করুণ প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রণয়গাথাগুলির ভিতর স্থান না পাইলে বর্ণিত প্রণয়গাথাগুলির মধ্যে একটি অপূরণীয় ফাঁক রহিয়া যাইবে, সেজন্য গাথাটির সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইখানেই বিবৃত করিতেছি।

চন্দ্রাবতী পিতার শিবপূজার ফুল তুলিতেছে ও তাঁহার সাথী জয়ানন্দ ডাল নোয়াইয়া ধরিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছে। এইরূপে গাথাটির শুরু। বাল্যসাহচর্যের প্রভাবে চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের মনে পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম সঞ্চারিত হইল। জয়ানন্দ এক পত্রে তাহার মনের গোপন কথা চন্দ্রাবতীর নিকট ব্যক্ত করিলে পত্র পড়িয়া চন্দ্রাবতী খুব কাঁদিল এবং মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ঘটক আসিয়া জয়ানন্দের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহ প্রস্তাব করিলে চন্দ্রাবতীর পিতা সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। হঠাৎ অঘটন ঘটিল। জয়ানন্দ এক যবনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিল। এই কথা জানাজানি হইয়া গেল। চন্দ্রাবতী পাষাণ প্রতিমার মত হইয়া গেল। সারাদিন কিছু খায় না, কাহারও সহিত কথা বলে না, সারারাত্রি অঝোরে কাঁদে। পিতা কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া তাহাকে একান্তমনে শিবপূজা করিতে ও রামায়ণ লিখিতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্রাবতী সমস্ত ভুলিয়া একমনে শিবপূজা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে জয়ানন্দের গভীর অনুতাপ হইলে ফিরিয়া আসিয়া শেষবারের

মত একবার চন্দ্রাবতীকে দেখিতে চাহিয়া পত্র পাঠাইল। চন্দ্রাবতী পিতাকে এই কথা জানাইলে তিনি কন্যাকে বিচলিত হইতে নিষেধ করিয়া একান্তমনে শিবপূজা করিতে উপদেশ দিলেন। চন্দ্রাবতী তখন দুয়ারে কপাট লাগাইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিল। জয়ানন্দ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কত সাধ্য-সাধনা, কত অনুরোধ করিতে লাগিল শুধু একবার দর্শনলাভের আশায়, কিন্তু চন্দ্রাবতী তখন ধ্যানমগ্না। অবশেষে জয়ানন্দ মন্দিরের কপাটে লিখিল—

"শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী॥
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোর না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত॥"

এই কথা লিখিয়া জয়ানন্দ নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল।

ধ্যান ভাঙ্গিলে চন্দ্রাবতী বাহিরে আসিয়া কপাটের লেখা দেখিতে পাইল। যবনস্পৃষ্ট হইয়া মন্দির অপবিত্র হইয়াছে সুতরাং চন্দ্রাবতী চোখের জলে ভাসিয়া নদীতে তর্পণ করিতে গেল। সেখানে জলে ভাসমান জয়ানন্দের মৃতদেহ দর্শনে চন্দ্রাবতী পাষাণমূর্তির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত।

৪। **কমলা**—রচয়িতা দ্বিজ ঈশান।

এই গাথাটি রূপকথা প্রকৃতির। প্রচলিত রূপকথার উপর ভিত্তি করিয়াই সম্ভবতঃ গায়েন এই গাথাটি রচনা করিয়াছেন।

হুলিয়া গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি মানিক চাকলাদার। তাহার সুধন নামে এক পুত্র ও কমলা নামে এক কন্যা। সুধন যেমন রূপবান, কমলাও তেমনি রূপবতী।

সেই গ্রামে চিকন নামে এক গোয়ালিনী ছিল। তাহার স্বভাব-চরিত্র অতিশয় মন্দ ছিল। কেহ আপন মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে হইলেই তাহার সাহায্য লইত।

কমলার পিতার হিসাবরক্ষকের কাজ করিত নিদান নামে এক ব্যক্তি। স্নানের ঘাটে কমলাকে দেখিয়া 'কারকুন' (হিসাবরক্ষক) মুগ্ধ হইল ও তাহার মনে কুচিন্তা জাগিল। কমলাকে লাভ করিবার মানসে সে চিকন

গোয়ালিনীর শরণাপন্ন হইল এবং তাহার মারফত কমলার নিকট কুপ্রস্তাব করিয়া একটি পত্র পাঠাইল। কমলা গোয়ালিনীকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন কারকুন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া জমিদারের কাছে কমলার পিতার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনিল যে, মানিক চাকলাদার মাটি খুঁড়িয়া সাত ঘড়া মোহর পাইয়া নিজের ঘরে রাখিয়াছে। এই পত্র পাইয়া জমিদার চাকলাদারকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। এদিকে কারকুন কমলার ভাইয়ের কাছে এই সমাচার দিয়া পিতার উদ্ধারের জন্য তাহাকে পাঠাইল। জমিদার একসঙ্গে পিতাপুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিল। কারকুন এই অবসরে চাকলাদার হইয়া বসিল এবং কমলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল। কমলা তাহাকে অপমান করিয়া মাতাকে লইয়া মামার বাড়ি চলিয়া গেল। কমলা মামার বাড়িতে আছে জানিয়া কারকুন কমলার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়া কমলার মামাকে এক পত্র দিল। কমলার মামা সমস্ত জানাইয়া কমলাকে তাড়াইয়া দিবার নির্দেশ দিয়া স্ত্রীকে এক পত্র দিল। কমলার মামী এই নিষ্ঠুর কার্য করিতে না পারিয়া বিছানার উপর পত্রটি ফেলিয়া রাখিল। মামীর বিছানায় রক্ষিত পত্র পাঠ করিয়া কমলা মনের দুঃখে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া রাত্রিবেলা ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। দুঃখে কষ্টে হাঁটিতে হাঁটিতে পথে এক মইষালের দেখা পাইল। লক্ষ্মীদেবী ছদ্মবেশে তাহাকে ছলনা করিতেছেন মনে করিয়া মইষাল সাগ্রহে কমলাকে ঘরে স্থান দিল। কমলার যত্নে মইষালের সব দুঃখ দূর হইল।

একদিন কোড়া শিকারে আসিয়া এক দেবতুল্য রাজপুত্র কমলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল ও মইষালের নিকট কমলাকে চাহিয়া লইল। রাজনন্দন প্রদীপকুমার কমলাকে আপন প্রাসাদে লইয়া গেল। প্রদীপকুমার ও কমলা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলিল। কিন্তু কমলা আপন পরিচয় দিল না। বলিল যে, সুদিন আসিলে সে তাহার পরিচয় দিবে।

একদিন কমলা শুনিল যে, রাজার মন্দিরে নরবলি হইবে। কুমারের কাছে তাহাদের পরিচয় পাইয়া কমলা বুঝিতে পারিল তাহারাই তাহার পিতা ও ভ্রাতা। তখন কমলা তাহার পরিচয় দিবে বলিয়া কুমারকে এক ধর্মসভা আহ্বান করিতে বলিল এবং কারকুন, চিকন গোয়ালিনী, মামা, মামী এবং মইষাল বন্ধু সকলকে আনাইতে বলিল। এইমত ব্যবস্থা হইলে, কমলা

ধর্মসভায় দাঁড়াইয়া বারমাসী সঙ্গীতের মাধ্যমে সকলের সামনে আপন পরিচয় ব্যক্ত করিল। তখন রাজার আদেশে কারকুনকে পূজায় বলি দেওয়া হইল এবং কমলার সহিত প্রদীপকুমারের বিবাহ হইয়া গেল।

৫। **দেওয়ান ভাবনা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সকল গাথায় বর্ণিত তাহাদের কোনটিতেই রচয়িতার নামোল্লেখ থাকিত না। সতর্কতার খাতিরেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে কবি বা গায়েনগণ নিজেদের নাম প্রকাশ করিতেন না। এই গাথাটিতে একটি সুন্দরী নারীর উপর দেওয়ান ভাবনার নির্মম অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার দিনে এই রকম ঘটনা হামেশাই ঘটিত।

অপরূপ সুন্দরী সুনাই শিশুকালেই পিতাকে হারাইয়া মাতার সহিত আসিয়া মাতুলালয়ে থাকিতে লাগিল। সেখানে সুনাই বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতে লাগিল। জলের ঘাটে মাধবের সহিত সুনাইয়ের ইতিমধ্যে দেখাশোনা হয় ও পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। মাধব ঐ গ্রামেরই ছেলে।

এদিকে দুর্জন বাঘরা দেওয়ান ভাবনার কাছে গিয়া সুনাইয়ের রূপ বর্ণনা করিলে ভাবনা সুনাইয়ের মামার নিকট বিবাহের প্রস্তাব আনিল। প্রচুর টাকার লোভে সুনাইয়ের মামা চুপি চুপি এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেল। জনরবে এইকথা সুনাই জানিতে পারিল এবং মাধবকে এক পত্র দিল। পরদিন জলের ঘাট হইতে দেওয়ান ভাবনার লোক সুনাইকে ধরিয়া লইয়া গেল। কিন্তু নদীপথে যাইবার সময় মাধব তাহাকে উদ্ধার করিল ও তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবনা মাধবের পিতাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। মাধব পিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া বন্দী হইল এবং তাহার পিতা ছাড়া পাইল। ঘরে ফিরিয়া সুনাইয়ের শ্বশুর পুত্রশোকে কাতর হইয়া সুনাইকে বলিতে লাগিল যে তাহারই কারণে একমাত্র পুত্রকে হারাইতে হইল। সুনাই যদি দেওয়ান ভাবনার কাছে যায় তাহা হইলে দেওয়ান মাধবকে ছাড়িয়া দিবে। এইকথা শুনিয়া সুনাই মনস্থির করিয়া ফেলিল এবং চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া দেওয়ান ভাবনার কাছে চলিল। দেওয়ান ভাবনার কাছে যাইবার সময় সুনাই "সঙ্গে লইল জড়ের লাড়ু কটরায় ভরিয়া।"

সুনাইয়ের অনুরোধে দেওয়ান ভাবনা মাধবকে ছাড়িয়া দিল। সুনাইয়ের বিষয় মাধব কিছুই জানে না। তাই মুক্তি পাইয়া সে আপন দেশে ফিরিয়া গেল।

গভীর রাত্রে উদ্দেশে মায়ের পায়ে প্রণাম জানাইয়া ও মাধবের কথা স্মরণ করিতে করিতে সুনাই বিষপান করিল। দেওয়ান ভাবনা যখন ঘরে প্রবেশ করিল তখন সুনাই বিষের ঘোরে পালঙ্কের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে। এইভাবে আপন পতির প্রাণ বাঁচাইয়া, আপন সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য সুনাই অকালে আত্মবিসর্জন দিল।

গাথাটি ছোট। কাহিনীটি হৃদয়গ্রাহী এবং বর্ণনার গুণে তাহা আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত করুণ রসপ্রধান গাথা যখন গায়েনরা আসরে পরিবেশন করিতেন, তখন সুরের মাধ্যমে এই করুণ কাহিনীগুলি আরও করুণ হইয়া শ্রোতাদের হৃদয়ে আঘাত দিত। ছাপা অক্ষরে এই সমস্ত গাথার মূলরস অনেকাংশে ক্ষুন্ন হইয়া যায়।

৬। **রূপবতী**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই গাথাটির মূল উপকরণ প্রচলিত রূপকথা হইতে গৃহীত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

রামপুর শহরের রাজা রামচন্দ্র। নবাবকে ভেট দিবার জন্য নবাবের শহরে গিয়া রাজা রহিয়া গেলেন। ঘরে বয়স্থা রূপবতী কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। রাণী চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন, এবং রাজাকে পত্র দিলেন। রাণীর পত্রে কন্যার বিষয় অবগত হইয়া নবাব রাজার নিকট এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন। রাজা গৃহে ফিরিয়া চিন্তায়-ভাবনায় অস্থির হইয়া স্থির করিলেন—

"কাইল দেখবাম যার মুখ সকালে উঠিয়া॥
মালী ডোম আইজঙ্গ না করব বিচার।
কন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার॥"

রাণী এই কথা শুনিয়া গোপনে রাজার বাড়ির নফর মদনের সহিত রূপবতীর বিবাহ দিয়া তাহাদের নৌকায় করিয়া অন্যদেশে পাঠাইয়া দিলেন। (পাঠান্তরে—রাণী মদনকে সকালে হুকায় জল দিবার ছুতা করিয়া রাজার সামনে যাইতে নির্দেশ

ধর্মসভায় দাঁড়াইয়া বারমাসী সঙ্গীতের মাধ্যমে সকলের সামনে আপন পরিচয় ব্যক্ত করিল। তখন রাজার আদেশে কারকুনকে পূজায় বলি দেওয়া হইল এবং কমলার সহিত প্রদীপকুমারের বিবাহ হইয়া গেল।

৫। **দেওয়ান ভাবনা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সকল গাথায় বর্ণিত তাহাদের কোনটিতেই রচয়িতার নামোল্লেখ থাকিত না। সতর্কতার খাতিরেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে কবি বা গায়েনগণ নিজেদের নাম প্রকাশ করিতেন না। এই গাথাটিতে একটি সুন্দরী নারীর উপর দেওয়ান ভাবনার নির্মম অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার দিনে এই রকম ঘটনা হামেশাই ঘটিত।

অপরূপ সুন্দরী সুনাই শিশুকালেই পিতাকে হারাইয়া মাতার সহিত আসিয়া মাতুলালয়ে থাকিতে লাগিল। সেখানে সুনাই বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতে লাগিল। জলের ঘাটে মাধবের সহিত সুনাইয়ের ইতিমধ্যে দেখাশোনা হয় ও পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। মাধব ঐ গ্রামেরই ছেলে।

এদিকে দুর্জন বাঘরা দেওয়ান ভাবনার কাছে গিয়া সুনাইয়ের রূপ বর্ণনা করিলে ভাবনা সুনাইয়ের মামার নিকট বিবাহের প্রস্তাব আনিল। প্রচুর টাকার লোভে সুনাইয়ের মামা চুপি চুপি এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া গেল। জনরবে এইকথা সুনাই জানিতে পারিল এবং মাধবকে এক পত্র দিল। পরদিন জলের ঘাট হইতে দেওয়ান ভাবনার লোক সুনাইকে ধরিয়া লইয়া গেল। কিন্তু নদীপথে যাইবার সময় মাধব তাহাকে উদ্ধার করিল ও তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবনা মাধবের পিতাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। মাধব পিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া বন্দী হইল এবং তাহার পিতা ছাড়া পাইল। ঘরে ফিরিয়া সুনাইয়ের শ্বশুর পুত্রশোকে কাতর হইয়া সুনাইকে বলিতে লাগিল যে তাহারই কারণে একমাত্র পুত্রকে হারাইতে হইল। সুনাই যদি দেওয়ান ভাবনার কাছে যায় তাহা হইলে দেওয়ান মাধবকে ছাড়িয়া দিবে। এইকথা শুনিয়া সুনাই মনস্থির করিয়া ফেলিল এবং চোখের জল চাপিয়া রাখিয়া দেওয়ান ভাবনার কাছে চলিল। দেওয়ান ভাবনার কাছে যাইবার সময় সুনাই "সঙ্গে লইল জড়ের লাড়ু কটরায় ভরিয়া।"

সুনাইয়ের অনুরোধে দেওয়ান ভাবনা মাধবকে ছাড়িয়া দিল। সুনাইয়ের বিষয় মাধব কিছুই জানে না। তাই মুক্তি পাইয়া সে আপন দেশে ফিরিয়া গেল।

গভীর রাত্রে উদ্দেশে মায়ের পায়ে প্রণাম জানাইয়া ও মাধবের কথা স্মরণ করিতে করিতে সুনাই বিষপান করিল। দেওয়ান ভাবনা যখন ঘরে প্রবেশ করিল তখন সুনাই বিষের ঘোরে পালঙ্কের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে। এইভাবে আপন পতির প্রাণ বাঁচাইয়া, আপন সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য সুনাই অকালে আত্মবিসর্জন দিল।

গাথাটি ছোট। কাহিনীটি হৃদয়গ্রাহী এবং বর্ণনার গুণে তাহা আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত করুণ রসপ্রধান গাথা যখন গায়েনরা আসরে পরিবেশন করিতেন, তখন সুরের মাধ্যমে এই করুণ কাহিনীগুলি আরও করুণ হইয়া শ্রোতাদের হৃদয়ে আঘাত দিত। ছাপা অক্ষরে এই সমস্ত গাথার মূলরস অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়।

৬। **রূপবতী**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই গাথাটির মূল উপকরণ প্রচলিত রূপকথা হইতে গৃহীত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

রামপুর শহরের রাজা রামচন্দ্র। নবাবকে ভেট দিবার জন্য নবাবের শহরে গিয়া রাজা রহিয়া গেলেন। ঘরে বয়স্থা রূপবতী কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। রাণী চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন, এবং রাজাকে পত্র দিলেন। রাণীর পত্রে কন্যার বিষয় অবগত হইয়া নবাব রাজার নিকট এই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিলেন। রাজা গৃহে ফিরিয়া চিন্তায়-ভাবনায় অস্থির হইয়া স্থির করিলেন—

"কাইল দেখবাম যার মুখ সকালে উঠিয়া॥
মালী ডোম আইজঙ্গ না করব বিচার।
কন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার॥"

রাণী এই কথা শুনিয়া গোপনে রাজার বাড়ির নফর মদনের সহিত রূপবতীর বিবাহ দিয়া তাহাদের নৌকায় করিয়া অন্যদেশে পাঠাইয়া দিলেন। (পাঠান্তরে—রাণী মদনকে সকালে হুকায় জল দিবার ছুতা করিয়া রাজার সামনে যাইতে নির্দেশ

দিয়া দিলেন। মদন সেইমত করিলে রাজা সকালে উঠিয়াই তাহার মুখ দেখিয়া তাহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিলেন)।

মাঝিমাল্লারা তাহাদের দুইজনকে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থলভূমিতে নামাইয়া দিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। এইখানে কাঙ্গালীয়া ও জাঙ্গালীয়া নামে দুই ভাই জেলে তাহাদের দেখিয়া আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। জাঙ্গালীয়ার স্ত্রী পুনাই রূপবতী ও মদনকে বড়ই আদরের সহিত গ্রহণ করিল।

কিছুদিন বাদে পিতামাতাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে মদন রূপবতীর নিকট সাতদিনের জন্য বিদায় লইয়া গেল কিন্তু আর ফিরিল না। এদিকে রূপবতী শুনিল যে, রাজা মদনকে ধরিয়াছেন এবং বলি দিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। এইকথা শুনিয়া স্বামীর নিকটে যাইবার জন্য রূপবতী কাঁদিতে লাগিল। তখন পুনাই নৌকা সাজাইয়া জাঙ্গাইলাকে লইয়া রূপবতীর সহিত রাজার দরবারে উপস্থিত হইয়া পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। কন্যার জন্য রাজার মন কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার আদেশে মদন মুক্ত হইল এবং মহাধূমধামে রূপবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইল।

তখনকার দিনে অনূঢ়া বয়স্থা কন্যার পিতা কিরূপ উভয় সঙ্কটে পড়িতেন তাহারই ইঙ্গিত এই গাথাগুলিতে পাওয়া যায়।

৭। **কঙ্ক ও লীলা**—রচয়িতা দামোদর দাস, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া।

কবিকঙ্ক ঐতিহাসিক চরিত্র। ইনি বিপ্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবিকঙ্কের জীবনের বিয়োগান্ত প্রণয়-মধুর কাহিনীটি পূর্ববঙ্গে বহুল প্রচারিত ছিল। কবি হিসাবে কবিকঙ্ক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই করুণ প্রণয়গাথাটি সার্থক কবির জীবনের ব্যর্থ অংশটি প্রকাশ করিয়াছে।

কঙ্ক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র। শিশুকালে মাতৃপিতৃহীন হইয়া এক চণ্ডাল কর্তৃক সে লালিতপালিত হয়। শিশুর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চণ্ডাল-চণ্ডালনীও গত হইল। অবশেষে গর্গ নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পথ হইতে তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। গর্গপত্নী তাহাকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কঙ্কের কপালদোষে তাহার দশবৎসর বয়ঃক্রম-কালে গর্গপত্নীও পরলোক গমন করিলেন। লীলা নামে গর্গের একটি কন্যা

ছিল। কঙ্ক ও লীলার বাল্যবন্ধুত্ব ক্রমশঃ গভীর প্রেমে পরিণত হইল। সারাদিন দুইজনে একত্রে খেলা করিয়া বেড়ায়। এই সময়ে এক পীর আসিয়া গ্রামে আস্তানা গাড়িল। কঙ্ক গোপনে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাহার নির্দেশে একটি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করিল। এই কথা প্রচার হইয়া গেলে লোকে কানাকানি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। গর্গকে কিছুতেই কঙ্কের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা সকলে যুক্তি করিয়া লীলা ও কঙ্কের নামে কলঙ্ক প্রচার করিতে লাগিল।

এই রটনা শুনিয়া গর্গ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। গর্গ যখন গোপনে কঙ্কের ভাতে বিষ মিশাইতেছিলেন তখন অন্তরাল হইতে লীলার চোখে তাহা পড়িল। লীলা সেই ভাত সামনে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ধেনু লইয়া কঙ্ক গৃহে ফিরিলে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন কঙ্ক লীলাবতীকে সান্ত্বনা দিয়া ও পিতাকে যত্ন করিতে উপদেশ দিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গর্গের গৃহত্যাগ করিল। এদিকে সেই বিষমাখা ভাত খাইয়া গর্গের সুরভি গাভীর মৃত্যু হইল।

এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অনুতপ্ত গর্গ উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন। দৈববাণী হইতে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কুকার্যের জন্য তাঁহার সংসারে ও মনে অশান্তি ও অমঙ্গল দেখা দিয়াছে। গর্গ কঙ্কের খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। লীলা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কঙ্কের চিন্তা করিতে করিতে শয্যা গ্রহণ করিল। কঙ্ককে কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে জনরব উঠিল যে, কঙ্ক নদীতে প্রাণবিসর্জন দিয়াছে। এই খবর শুনিয়া লীলাবতী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে একদিন সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। শোকোন্মত্ত গর্গ যখন লীলাবতীর মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করিতেছেন তখন কঙ্ক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গর্গ সমস্ত ভুলিয়া কঙ্ককে আলিঙ্গন দিলেন। কঙ্কের সহিত গর্গ সংসার ত্যাগ করিয়া নীলাচলের পথে রওয়ানা হইলেন।

৮। কাজলরেখা—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই গাথাটির উপকরণও রূপকথা হইতে গৃহীত। এই গাথাটির সহিত দক্ষিণারঞ্জন মজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি"-র অন্তর্গত সুঁচরাজার গল্পটির বহুল

সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রচলিত লোক-গাথা ও উপকথা হইতেই দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহাই এই সাদৃশ্যের অন্তর্নিহিত কারণ।

ভাটিয়াল মুল্লুকে ধনেশ্বর নামে এক সাধুর কাজলরেখা নামে দশম বর্ষীয়া অতি রূপবতী ও গুণবতী এক কন্যা ছিল। কাজলরেখার ভ্রাতা চার বৎসরের রত্নেশ্বরও অতিশয় রূপবান ছিল।

জুয়া খেলিতে গিয়া ধনেশ্বর সমস্ত সম্পত্তি হারাইলেন। কাজলরেখার বিবাহ দেওয়া দায় হইল। এক সন্ন্যাসী আসিয়া এক শুকপক্ষী ও একটি বহুমূল্য আংটি দিলেন এবং বলিলেন যে, এই শুকপক্ষীর কথানুসারে কাজ করিলে সদাগর আবার সমস্ত ফিরিয়া পাইবেন। ইহার পর কাজলরেখাকে বনে বিসর্জন, ভাঙ্গা মন্দিরে কাজলরেখা কর্তৃক মৃত পতির প্রাণরক্ষা ও দাসীর প্রতারণা। অবশেষে সকল ভুলের অবসান ও কাজলরেখার পতির সহিত মিলন। ধর্মমতি শুকের স্বর্গে গমন। প্রবঞ্চক দাসীকে গর্তে মাটি চাপা দিয়া কাজলরেখার স্বামী তাহাকে লইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

এই গাথাটি অতিরিক্ত ঘটনাপ্রধান এবং গাথাকাব্য অপেক্ষা রূপকথার লক্ষণই ইহাতে অধিক।

৯। **দেওয়ানা মদিনা**—রচয়িতা মনসুর বাইতি।

“দেওয়ানা মদিনা” একটি অপূর্ব রচনা। এই গাথাটিতে বঙ্গনারীর পতিপ্রেম, সহনশীলতা ও ত্যাগের যে মহিমা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে কোথাও বর্ণনার আধিক্য নাই। গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্য পরিবেশ মদিনার মহত্বকে আরও বড় করিয়া তুলিয়াছে।

আলাল-দুলালের মাতা মৃত্যুর সময়ে তাহাদের পিতা দেওয়ান সোনাফরকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে, তাহার অবর্তমানে দেওয়ান আর বিবাহ করিবে না। দেওয়ান বড় কষ্টে আলাল-দুলালের দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংসার অচল হইয়া যায় দেখিয়া অবশেষে সকলের পরামর্শে বিবাহ করিলেন এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বিমাতার চক্রান্তে আলাল-দুলাল সর্বহারা হইয়া রাজ্য হইতে বিসর্জিত হইল। জল্লাদ তাহাদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া প্রাণে না মারিয়া এক সাধুর নিকট তাহাদিগকে দিয়া ফিরিয়া আসিল। সাধু তাহা-

দিগকে হীরাধর ব্যাপারীর নিকট বেচিয়া দিল। কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া আলাল একদিন সেখান হইতে পলাইল। দেওয়ান সেকেন্দর পক্ষী শিকারে আসিয়া আলালকে দেখিয়া লইয়া গেলেন। দেওয়ান আলালের গুণে মুগ্ধ হইলেন এবং পুরস্কার দিতে চাহিলে আলাল বাস্তাচঙ্গ শহরে একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়া থাকিতে চাহিল। এদিকে বান্যাচঙ্গ শহরে পুত্রের শোকে সোনাফর দেওয়ান-এর মৃত্যু হইলে তাহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দেওয়ান হইল। আলাল তাহার পিতৃ সম্পত্তি অধিকার করিয়া দেওয়ান হইয়া বসিল। সেকেন্দার তাহার কন্যার সহিত আলালের বিবাহ দিতে চাহিলে আলাল বলিল, "আমার আর এক ভাই আছে, তাহাকে যদি পাই তাহা হইলে দুই ভাই দুই কন্যাকে সাদি করিব।" তারপর আলাল দুলালের খোঁজে বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এক গাছের তলায় ক্লান্ত হইয়া বসিল। সেখানে কতকগুলি রাখালের মুখে তাহার ও দুলালের জীবনবৃত্তান্ত গীত হইতে শুনিলে সে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল যে, এক গৃহস্থের পুত্র তাহাদিগকে এই গান শিখাইয়াছে। তখন আলাল সেই বাড়িতে গিয়া দুলালের দেখা পাইল ও দুই ভাইয়ের মিলন হইল। দুলালও এক চাষীকন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘরসংসার করিতেছিল। কিন্তু আলালের পরামর্শে দুলাল আপন পত্নী মদিনাকে তালাকনামা দিয়া আলালের সহিত চলিয়া গেল এবং তাহারা দুই ভাই সেকেন্দরের দুই কন্যা মমিনা ও আমিনাকে সাদি করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

এদিকে মদিনা তালাকনামা দেখিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, দুলাল তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। মদিনা দুলালের ফিরিবার আশায় দিন গোণে এবং স্বহস্তে নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া দুলালের জন্য রাখিয়া দেয়। এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। তখন মদিনা পুত্র সুরুজ জামালকে সাজাইয়া আপন ভ্রাতার সহিত তাহাকে দুলালের কাছে পাঠাইল। দুলালের সহিত পথেই তাহাদের দেখা হইল এবং দুলাল তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। দুলাল বলিল যে, তাহারা এখানে থাকিলে তাহার সম্মানহানি হইবে। সুরুজ বাড়ি ফিরিয়া মায়ের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিল। মদিনা এই প্রত্যাখ্যান সহ্য করিতে পারিল না। সে ক্রমশঃ শয্যাগত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটাইল।

এদিকে পুত্রকে ঐরূপে বিদায় করিবার পর হইতেই দুলাল দিবারাত্রি তাহাদের কথাই ভাবিতে লাগিল। মদিনা-সংক্রান্ত সকল কথা মনে পড়িয়া তাহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন সে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া মদিনার নিকট ক্ষমা চাহিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। পথে দুলাল অনেক অমঙ্গল চিহ্ন দেখিল (এইখানে পল্লীগ্রামে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়)। অবশেষে বাড়িতে পৌছিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। তাহার সাড়া পাইয়া সুরুজ ঘরের বাহির হইয়া আসিল এবং দুলাল যখন তাহাকে মদিনার কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন

"চক্ষে আঙ্গুল দিয়া সুরুজ কয়বর দেখায়।"

দুলাল মদিনার কবরের উপর লুটাইয়া পড়িল। ক্ষমা চাওয়া তাহার আর হইল না।

দুলাল আর বান্যাচঙ্গ শহরে ফিরিল না। কবরের উপর এক ডেগুরা (কুঁড়েঘর) বাঁধিয়া পুত্রকে লইয়া ফকিরের ন্যায় দিন কাটাইতে লাগিল।

১০। **ধোপার পাট**—বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত। প্রকৃত রচয়িতা অজ্ঞাত।

তরুণবয়স্ক রাজকুমার ও রজককন্যা কাঞ্চনমালার প্রেমকাহিনী লইয়া রচিত এই গাথাটি বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস ও তাঁহার প্রণয়িনী রজকিনী রামীর প্রেমকথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দীনেশচন্দ্র সেন এই গাথাটিকে চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "যদিও এই গানটির মধ্যে অনেক ছত্র চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে মিলিয়া যায়, তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই সকল কৃষকের গান আদৌ বৈষ্ণব প্রভাবে রচিত হয় নাই।" দীনেশ সেনের এই উক্তি একদেশদর্শী। গাথাটির ভাব ও ভাষাই প্রমাণ করে যে, ইহা ষোড়শ শতাব্দীর পরে রচিত। গাথাটির উপর বৈষ্ণবকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

কোনও এক দেশের রাজপুত্র সেই দেশের রজককন্যা কাঞ্চনের প্রেমে পড়িল। রাজপুত্রের একান্ত অনুরোধে কাঞ্চন রাত্রিবেলা তাহার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু সত্য সত্যই যখন রাত্রিকাল আসিয়া উপস্থিত হইল তখন লোকলজ্জার ভয়ে কাঞ্চন রাজপুত্রের নিকট যাইতে

ইতস্তত: করিতে লাগিল। এই স্থানে কাঞ্চনের উক্তি বড় সুন্দর। কিন্তু ইহার ছত্রে ছত্রে বৈষ্ণবকবির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। বন্ধুর সহিত দেখা করিতে না পারিয়া কাঞ্চন আক্ষেপ করিতেছে :—

"সত্যভঙ্গ হইলরে কুমার পারলাম না আসিতে।
মাও বাপ জাইগ্যা আছে আসিবাম কেমনে॥

(এইখানে ছন্দের অমিল গানের সুরে হয়তো ঢাকা পড়িত)

ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন।
অবলার কুলভয় হইল দুষমণ॥
কিসের কুল কিসের মান আর না বাজাও বাঁশী।
মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণের দাসী॥
একটুখানি থাকরে বন্ধু একটুখানি রইয়া।
কাঁচা ঘুমে বাপ মাও না পড়ুক ঘুমাইয়া॥
আসমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন॥"

এই সকল উক্তির ছত্রে ছত্রে বৈষ্ণবকাব্যের সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এদিকে রাজপুত্র কাঞ্চনের অপেক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে না দেখিয়া একেবারে তাহাদের বাড়ির নিকট চলিয়া আসিয়াছে। তখন কাঞ্চন তাহাকে দেখিয়া বলিতেছে :—

"বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর॥
ভিজিল সোনার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে।
অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে॥
সংসার ঘুমাইয়া আছে কেবল বাজে বাঁশী।
হইয়া ঘরের বাহির কোন পথে আসি॥
কাট্যা গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয়।
এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয়॥"

উপরের ছত্রে ছত্রে বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।

অবশেষে সকল ভয়, লজ্জা বিসর্জন দিয়া রজককন্যা ও রাজপুত্রের প্রেম গভীর হইয়া উঠিল। দেশের লোক ইহা জানিতে পারিয়া রাজার কানে

এই কথা তুলিল। রাজা রাগিয়া ভগবান ধোপাকে (কাঞ্চনের পিতা) তলব করিয়া পাঠাইলেন এবং রাজার হুকুমে রাত পোহাইলেই বাগানের মালীর সহিত কন্যার বিবাহ দিবে বলিয়া ভগবান স্বীকৃত হইল। এই কথা শুনিয়া সেই রাত্রেই রাজপুত্র ও রজককন্যা দেশত্যাগ করিল। রজককন্যার দেশত্যাগের বর্ণনাটি হৃদয়গ্রাহী। একদিকে প্রেমাস্পদের জন্য সকল ছাড়িয়া সে পথে বাহির হইয়াছে, অপরদিকে তাহার মন দেশের মাঠ, নদী, গৃহ, বাগান ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য গুমরিয়া মরিতেছে। সে তাহাদের কত ভালবাসে, তবুও প্রেমের টানে সে সকল ছাড়িয়া আসিয়াছে।

ইহার পর অপর এক রাজার রাজ্যে গিয়া তাহারা রাজার ধোপার বাড়ী স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে আশ্রয় লইল। তাহাদের দেখিয়া—

"চান্দ সুরুজে যেন পথে দেখা পাইয়া।
অবাক্কি লাগিয়া ধুবা রহিল চাহিয়া॥
সূর্য্যের সমান পুরুষ আর চান্দের সমান নারী।
এহারা হইবে কোন রাজার ঝিয়ারী॥"

যাহা হউক, ধোপার ঘরে আশ্রয় নিয়া রাজপুত্রও কাঞ্চনের সহিত ধোপার কাজ করিতে লাগিল।

সেই দেশের রাজকন্যা কাঞ্চন ও তাহার পুরুষের রূপ দেখিয়া অবাক হইল ও কাঞ্চনের সহিত সখিত্ব করিল। দুর্বল মুহূর্তে কাঞ্চন রাজকন্যার কাছে সমস্ত গোপনকথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। রাজকন্যা জানিল এই ধোপা রাজপুত্র। তখন সে কাপড়ের ভাঁজে এক চিঠি পাঠাইয়া রাজপুত্রের নিকট প্রেম নিবেদন করিল। আর রাজপুত্রও—

"পুরুষ ভ্রমরা জাতি ফুলের মধু খায়।
বাসি থইয়া টাটুকা ফুলের মধু খাইতে চায়॥"

এই নীতি অনুসরণ করিল। কাঞ্চনকে ডাকিয়া রাজপুত্র বলিল যে, সে তিন মাসের জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাইতেছে। কাঞ্চন কোনও সন্দেহ করিল না।

"অত না ভাবিল কন্যা শত না ভাবিল।
সরল হইয়া কন্যা নাগরে বিদাইল॥"

রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু কাঞ্চন কিছুই জানিতে পারিল না। এক মাস দুই মাস করিয়া এক বছর কাটিয়া গেল তবুও রাজপুত্রের

দেখা নাই। কাঞ্চন কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটায়। ইতিমধ্যে একদিন রাজ-বাড়ির তাগিদদার ধোপার নিকট কাঞ্চনকে চাহিল আর ভয় দেখাইল যে, কাঞ্চনকে না দিলে সে তাহার প্রাণনাশ করিবে। ধোপা ও ধোপানী কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের বিপদ দেখিয়া ব্যথিতা কাঞ্চন শেষ আশ্রয়কেও ত্যাগ করিয়া চলিল। নদীর পথে তমসা গাজী বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিল। সে নদীর ধারে কাঞ্চনকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহাকে আপন নৌকায় তুলিয়া লইয়া গেল। কাঞ্চন তাহার গৃহে কন্যার আদরে রহিল। কিছুদিন পরে তমসা গাজী পুনরায় বাণিজ্যে গেল। বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া সে পত্নীর নিকট রাস্তার বর্ণনা করিতে করিতে যখন কাঞ্চনের পিতার কথা বলিতেছিল তখন কাঞ্চন তাহা শুনিয়া আকুল হইয়া সমস্ত কথা তমসা গাজীকে বলিল এবং তাহার অনুরোধে তমসা গাজী কাঞ্চনকে পিতার নিকট পৌছাইয়া দিল। পিতা ও কন্যার মিলন হইল। এইখানের বর্ণনা বড়ই করুণ। পিতা কন্যাকে অভিযোগ করিয়া বলিতে লাগিল :—

"ফুলের সঙ্গে ভমরার পিরীত যেমন আগে বুঝা দায়।
এক ফুলের মধু খাইয়া আর ফুলেতে যায়॥
মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেকে উদয়॥
কুলোকের সঙ্গে পিরীত শেষে জ্বালা ঘটে।
যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাতের পিরীত আর ছলেতে কাটে॥"

উপরি-উক্ত প্রতি ছত্রে বৈষ্ণবকবির অনুকরণ লক্ষণীয়।

কাঞ্চন সকলই শুনিল এবং পাগলিনীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। কেহ জানিল না যে রজককন্যা ফিরিয়াছে—সকলে তাহাকে জানিল পাগলিনী বলিয়া। এই অবস্থায় একদিন প্রাসাদে ঢুকিয়া কাঞ্চন শেষবারের মত রাজপুত্রকে দেখিয়া নদীর বুকে ঝাঁপ দিয়া সকল জ্বালা জুড়াইল। রাজপুত্র কিছুই জানিল না। এইভাবে রজককন্যা প্রেমের জন্য গভীর দুঃখ বরণ করিয়া অবশেষে :—

"তারা হইল নিমি ঝিমি রাত্র নিশাকালে।
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা সেইনা নদীর জলে॥"

১১। **মইষাল বন্ধু**—বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত। প্রকৃত রচয়িতা অজ্ঞাত।

মইষাল বন্ধুর দুইটি পালাই চন্দ্রকুমারের অসম্পূর্ণ সংগ্রহ।

মহিষরক্ষক ডিঙ্গাধর ও সুজাতী কন্যার অনুরাগ কাহিনী অবলম্বনে মইষাল বন্ধুর দুইটি পালাই রচিত। কিন্তু পালা দুইটির মধ্যে পার্থক্য অনেক।

প্রথম পালা—শিঙ্গাখালি নদীর ধারে এক গৃহস্থ বাস করিত। তাহার একমাত্র পুত্র ডিঙ্গাধর। পুত্রের দশবৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহার মাতার মৃত্যু হইল। গৃহিণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের সংসারে নানারূপ অকল্যাণ দেখা দিতে লাগিল। অবশেষে দুঃখে কষ্টে গৃহস্থেরও মৃত্যু হইল। অনাথ ডিঙ্গাধর হালের মহিষ বিক্রয় করিয়া কোনওরূপে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন মহাজন বলরাম আসিয়া ডিঙ্গাধরের কাছে তাহার পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ চাহিল। ডিঙ্গাধরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ঋণের বোঝা মাথায় নিয়া মরিলে মানুষের কি দুর্গতি হয় তাহাই চিন্তা করিয়া তাহার মন পীড়িত হইয়া পড়িল। তখন আর কোনও উপায় না দেখিয়া ডিঙ্গাধর বলরামের ঋণের পরিবর্তে তাহার মহিষের রাখালী করিতে লাগিল। বলরামের এক যুবতী কন্যা ছিল। বলা বাহুল্য সেই সাজুতী কন্যা ডিঙ্গাধরের প্রেমে পড়িল। বলরাম-কন্যার রূপবর্ণনা অতি চমৎকার—এইরূপ মার্জিত বর্ণনা যে কবির মন হইতে বাহির হয় সে কবি যে মার্জিত রুচিসম্পন্ন এ কথা বলাই বাহুল্য। কৃষক কবিদের এই মার্জিত রুচির পরিচয় গাথাগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পবিত্রভাবে কত নিপুণতার সহিত স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য বর্ণনা করা যাইতে পারে তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই গাথা-কবিতাগুলি। অনেক শিক্ষিত কবিরও অনুসরণযোগ্য এই বর্ণনাগুলি।

সাজুতী কন্যার নদীতে স্নান করিবার যে বর্ণনা দেখিতে পাই, ডঃ দীনেশ সেনের সংগৃহীত আরও কতকগুলি গাথায় হুবহু ঐ একই বর্ণনা দেখিতে পাই। যেমন:—

"হাটু জলে নাম্যা কন্যা হাটু মাঞ্জন করে।
কোমর জলে নাম্যা কন্যা কোমর মাঞ্জন করে॥"

সুতরাং মনে হয় এই বর্ণনাগুলি কোনও এক কবি আবিষ্কার করিয়া থাকিলেও, অধিকাংশ কৃষককবির মধ্যেই সুপ্রচলিত ছিল।

'মইষাল বন্ধু'র বাঁশের বাঁশীর শব্দে কন্যার মন উতলা হইয়া উঠে। বন্ধুর সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া সাজুতী কন্যার যে আক্ষেপ তাহা বৈষ্ণবকাব্যের

রাধার আক্ষেপ স্মরণ করাইয়া দেয়। গাথাগুলির এই সমস্ত অংশে বৈষ্ণবকবিতার সুর যেন এক হইয়া যায় এবং তখনই উহাদের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এই সমস্ত পালায় উপমাগুলিও ভারি সুন্দর—যেমন,

"সুজন চিন্যা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা।
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাটা॥
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাটা।"—পৃঃ ৪০

অথবা,

"মনের বুঝাই কত মন না মানে মানা।
এ ভরা যৌবন কলসী দিনে দিনে উণা।"—পৃঃ ৪১

আবার 'মইষাল বন্ধু'ও সাজুতী কন্যার কথা ভাবে—

"আসমানেতে ফুটে তারা ছিন্নভিন্ন দেখি।
মইষাল ভাবে এইমত কন্যার দুইটি আঁখি॥"—পৃঃ ৪২

অথবা,

"জলের উপর পউদের ফুল চারিদিকে পাতা।
মইষাল ভাবে কন্যার মুখ পিউরী দিয়া গাথা।"—পৃঃ ৪৩
(পিউরী—পদ্মের পাপড়ী)

এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে মইষাল বন্ধু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল এবং তাহার মহিষ গিয়া বাঁকের ধান সমস্ত খাইয়া ফেলিল। রাজার কাছারি হইতে পাইক আসিয়া বলরামকে ধরিয়া লইয়া গেল। বলরামের স্ত্রী ও কন্যা কাঁদিতে লাগিল। তখন ডিঙ্গাধর আপন দোষ স্বীকার করিয়া জমিদারের নিকট হইতে বলরামকে ছাড়াইয়া আনিল। তাহার পরিবর্তে সে জমিদারের নিকট ছয় বৎসরের জন্য খাটিয়া দিতে রাজী হইল। পিতার শোকে সাজুতী কন্যা কাঁদিয়া মন হাল্কা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার অন্তর পুড়িয়া যাইতে লাগিল। মনের দুঃখ কাহারও কাছে বলিতেও পারে না, আবার সহিতেও পারে না। কিছুদিন পর ডিঙ্গাধর আষাঢ়িয়া মণ্ডল নামে এক মহাজনের নিকট হইতে কর্জ করিয়া বলরামের মহিষ ছাড়াইয়া আনিল এবং জমিদারের কাছে ছাড়া পাইয়া পুনরায় বলরামের নিকট ফিরিয়া আসিল। ইহার পর পালাটির কিছু অংশ পাওয়া যায় নাই।

অতঃপর নানা বিপদের মধ্য দিয়া ডিঙ্গাধর এক ব্যাপারীর নিকট আশ্রয় পাইল। ডিঙ্গাধর ঘর নির্মাণ করিয়া সাজুতী কন্যার খোঁজে চলিল। ভিখারী

বেশে গোপনে ডিঙ্গাধর বলরামের বাড়ি গেল। দেখিল বলরাম মারা গিয়াছে। মা ও কন্যা কাঁদিয়া দিন কাটায়। কন্যার রূপে দুঃখ-কষ্টের ছাপ পড়িয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া ডিঙ্গাধর ঘটক পাঠাইয়া সাজুতী কন্যার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ করিল। কিন্তু কন্যা অসম্মতি জানাইয়া কহিল—

"বাপের মৈষাল ছিল থাকিত বাথানে
কোন দেশে আছে তার না জানি সন্ধানে।"

তখন ডিঙ্গাধর সাজুতী কন্যার সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল। ডিঙ্গাধর ও সাজুতী কন্যার বিবাহ হইল।

গাথাটি এইখানেই শেষ হইলেই বেশ তৃপ্তিজনক সমাপ্তি হইত, কিন্তু দ্বিতীয় শাখায় গাথাটিকে আরও বর্ধিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ গাথার বিয়োগান্ত রূপ আনিবার জন্যই ইহাকে আরও বাড়ান হইয়াছে। শেষ অংশ পাওয়া না গেলেও ইহা অনুমান করা যায় যে, সতীত্ব রক্ষার জন্য সাজুতী কন্যা জীবন বিসর্জন দিয়াছিল।

দ্বিতীয় শাখা:—চাটগাঁয়ের মঘুয়া ডিঙ্গা বাহিয়া যাইতে যাইতে নদীর ঘাটে সুন্দর সাজুতী কন্যাকে স্নান করিতে দেখিল এবং তাহার রূপে মোহিত হইয়া গেল। সেই ঘাটে ডিঙ্গা ভিড়াইয়া সন্ধ্যাবেলা মঘুয়া ডিঙ্গাধরের বাড়ি গিয়া ছল করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইল। গল্পের ছলে ডিঙ্গাধরকে সুন্দর সুন্দর দেশের খবর শুনাইয়া তাহাকে বাণিজ্যে যাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। মঘুয়া ও ডিঙ্গাধর বাণিজ্যে গেল। ছয়দিন পরে রাত্রিকালে একস্থানে ডিঙ্গা বাঁধিয়া মঘুয়া ঘুমন্ত ডিঙ্গাধরকে জলে ভাসাইয়া দিয়া সাজুতী সুন্দরীর ঘাটে গিয়া ডিঙ্গা ভিড়াইল। ডিঙ্গাধর ফিরিয়াছে মনে করিয়া সাজুতী কন্যা সাজসজ্জা করিয়া ডিঙ্গাবরণ করিবার জন্য সখিদের সঙ্গে লইয়া ঘাটে গেল। 'হাটু জলে' নামিয়া যখন কন্যা গলুইয়ে সিন্দূরের ফোটা দিতেছিল তখন দুষমণ মঘুয়া চোঁ মারিয়া তাহাকে ডিঙ্গায় তুলিয়া লইয়া ডিঙ্গা ছাড়িয়া দিল। তখন ডিঙ্গা উজান স্রোতে দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিল। আর—

"দেখ দেখ না দেখ দেখ চলিল ভাসিয়া।
পারে থাইক্যা পারের লোক রহিল চাহিয়া॥
সাজুতী সুন্দরী কন্যা কান্দে থাপাইয়া মাথা।
রাক্ষসে হরিল যেমন জঙ্গলার সীতা॥"

গাথাটি এই পর্যন্তই পাওয়া গিয়াছে।

"মইষাল বন্ধু"র দ্বিতীয় পালাটিও সাজুতী কন্যা ও ডিঙ্গাধরের প্রেম লইয়া রচিত, তবে বর্ণিত ঘটনার কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায় তাহা আগেই বলিয়াছি।

১২। **কাঞ্চনমালা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

কাঞ্চনমালার কাহিনীটি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে মনে হয় পল্লী-অঞ্চলে এককালে এই গাথাটি বহু প্রচলিত ছিল। দীনেশ সেনের সংগ্রহে যে আকারে এই গাথাটিকে পাইতেছি তাহার সহিত দক্ষিণারঞ্জন মজুমদারের 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র 'মালঞ্চমালা'-র কাহিনীটি বহু অংশে মিলিয়া যায়। দীনেশ সেনের সংগ্রহে এই গাথাটি গীতি-কথার আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কাঞ্চন কন্যার নামে রচিত বিভিন্ন ছোট বড় কেচ্ছা গাথা মুসলমান কবিগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। যথাস্থানে সেগুলির কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইবে। এইরূপে দেখা যায় যে, দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র অধিকাংশ কাহিনীই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন আকারে গীত হইত, যেমন :—মধুমালা, কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা, পুষ্পমালা (সখীসোনার গান তুলনীয়), শঙ্খমালা (ভেলুয়াসুন্দরী তুলনীয়), শীতবসন্তের গল্প, সুঁচরাজার গল্প ইত্যাদি। এইসকল কাহিনীর কোনও কোনও অংশ সংগৃহীত গাথাগুলিতে পাই। দক্ষিণারঞ্জন গ্রামাঞ্চল হইতেই তাঁহার রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং গাথাগুলির অধিকাংশই তখনও পুঁথির আকারে অথবা লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংগৃহীত না হইলেও, গ্রামাঞ্চলের লোকমুখে ইহাদের কাহিনী সুপ্রচলিত ছিল, হয় গাথা না হয় গীতিকথার আকৃতিতে। অঞ্চলভেদে কাহিনীগুলির স্থান, কাল ও পাত্রে কিছু পার্থক্য আপনা হইতেই সৃষ্টি হইত। সুতরাং সর্বপ্রথম দীনেশ সেন কর্তৃক এই কাহিনীগুলি পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত গাথার আকারে মুদ্রিত হইলেও এই সুপ্রচলিত গাথাগুলির প্রকৃত উৎসস্থল নিরূপণ করা আজ অসম্ভব।

আচার্য দীনেশ সেনের সংগ্রহে কাঞ্চনমালার পালাটি সম্পূর্ণ গাথার আকারে মুদ্রিত না হইয়া একটি গদ্যপদ্যময় গীতিকথার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। গাথাটির অন্তর্গত কাহিনীটি নিম্নে দেওয়া হইল।

রাজসভায় নৃত্য করিবার সময় তালভঙ্গের অপরাধে পরীর রাজার শাপে কাঞ্চনমালা মানুষের ঘরে আসিয়া জন্ম নিল। ভরাই নগরে সাধু সদাগরের

কন্যারূপে কাঞ্চনমালা জন্ম নিল। সদাগরের পুত্রকন্যা ছিল না। এক সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ফল খাইয়া রাণী গর্ভবতী হইলেন। সন্ন্যাসী সদাগরকে নির্দেশ দিয়া গেল—

"চন্দ্র সম সেই কন্যা হবে রূপবতী।
তার গুণেক তোমার যত খণ্ডিবেক দুর্গতি॥
কিন্তু এক কথা শুন হইয়া সাবধান।
নবম বচ্ছরে কন্যা দিবে গৌরীদান॥
নয় বছর পরে যদি দণ্ডেক ভারাও।
সাগরে ডুবিবে তোমার চৌদ্দখানা নাও॥
পুরীতে লাগিবে তোমার বেহুতি আগুনি।
ক্রুদ্ধ হইয়া ধনস্থলে বসিবেন শনি॥"

এদিকে কাঞ্চনমালা ক্রমে নয় বৎসরের হইল। সদাগর তাহাকে পাত্রস্থ করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে যখন নয় বৎসর পুরিতে আর মাত্র অর্ধদণ্ড বাকী তখন—

"মনে, মনে ভাবি সাধু মন মত্ত হইল।
অর্ধদণ্ড থাকতে সাধু পরতিজ্ঞা করিল॥
এর মধ্যে যার মুখ দেখিবাম কাছে।
তার কাছে দিবাম কন্যা কপালে যা আছে॥"

এমন সময় এক ভিখারী বামুন আসিয়া সদাগরের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার ক্রোড়ে একটি ছয়মাসের অন্ধশিশু। সাধু তখন মনের দুঃখ মনে চাপিয়া এই শিশুর সহিতই কন্যার বিবাহ দিল এবং কাঞ্চনকে সন্ন্যাসীর সকল কথাই জানাইল। কাঞ্চনের মা আগেই মারা গিয়াছিল। অন্ধশিশুস্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া মনের দুঃখে কাঞ্চন গৃহত্যাগ করিল।

কাঞ্চন শিশুস্বামী ক্রোড়ে বনে বনে ঘুরিতে ঘুরিতে এক সন্ন্যাসীর দেখা পাইল। সন্ন্যাসী তাহার স্বামীর চক্ষুদান করিল। অতঃপর ঘুরিতে ঘুরিতে কাঞ্চন এক কাঠুরের গৃহে আশ্রয় পাইল। এইভাবে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। এই সময়ে কাঞ্চনের কপাল ভাঙ্গিল। এক রাজা বনে শিকার করিতে আসিয়া কুমারকে দেখিল এবং তাহার কপালে রাজটীকা দেখিয়া তাহাকে জোর করিয়া আপন দেশে নিয়া গেল। তখন কাঞ্চনমালা কাঠুরাণীদের সহিত

কাষ্ঠ সন্ধানে গিয়াছিল। ঘরে ফিরিয়া কুমারকে না দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িল।—

"কাঞ্চনমালার কান্দনেতে বৃক্ষের পাতা ঝরে।
গহন বনের পশু পক্ষী উইড়া ঝুইড়া মরে॥"

কাঞ্চনমালা পাগলের মত সেই কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেশ-বিদেশে কুমারকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। এইখানে নানান দেশ ও সেই সমস্ত দেশের অধিবাসীদের বর্ণনা কবি প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়াছেন। কৃষককবির বর্ণনার গুণে সেই সমস্ত দেশগুলি তাহাদের অধিবাসীসমেত চোখের সম্মুখে যেন ভাসিয়া ওঠে।

এইভাবে ছয় বৎসর ঘুরিয়া কাঞ্চন সুমাই নগরের রাজা বিদ্যাধরের রাজ্যে পৌছিল। রাজকন্যা কুঞ্জলতার এক দাসীর প্রয়োজন শুনিয়া কাঞ্চন কাঠুরে ও কাঠুরাণীর নিকট বিদায় লইয়া রাজকন্যার দাসীবৃত্তি গ্রহণ করিল। অনেক চোখের জল ফেলিয়া কাঠুরে দম্পতী কাঞ্চনকে বিদায় দিল। রাজকন্যা কুঞ্জলতার স্বামীই কাঞ্চনমালার বহু অনুসন্ধিত কুমার। কুমারের মুখে গল্প শুনিয়া কুঞ্জ তাহাকে দিয়া কাঞ্চনের ছবি আঁকাইয়াছিল এবং সেই কন্যার উদ্দেশ করিবার জন্যই সে দাসীর খোঁজ করিয়াছিল। কাঞ্চনকে দেখিয়াই কুঞ্জ চিনিল এই সেই কন্যা, তখন তাহার—

"দুরন্ত ভাবনায় মন উঠাপড়া করে।
খাল কাটিয়া কেন আনিলাম কুম্ভীরে॥"

বিচিত্র মানবের মন। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য কুঞ্জই কাঞ্চনের খোঁজ চাহিয়াছিল। কিন্তু যখন সত্যসত্যই তাহাকে কাছে পাইল তখন তাহার রূপ দেখিয়া সে অজ্ঞাতসারেই আপন দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত পাইয়া চিন্তিতা হইয়া পড়িল। এদিকে—

"রাজপুত্রে পাইয়া কন্যা হইল পাগলিনী।
সাপেতে পাইল যেন তার হারা মণি॥"

কাঞ্চনকে কাছে পাইয়া রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে কুঞ্জকে অবহেলা করিতে লাগিল। আহার, নিদ্রা সকল সময়েই কাঞ্চন না হইলে চলে না। একদিন কুমার শিকারে গেলে কুঞ্জ কাঞ্চনের কাছে তাহার পূর্ব-ইতিহাস জানিতে চাহিল। দুর্বল মুহূর্তে কাঞ্চন সব কথা বলিয়া ফেলিল। কুঞ্জ জানিতে পারিল যে, কাঞ্চন তাহার সতীন। তখন আপন মাতার সহিত যুক্তি করিয়া সে কাঞ্চনকে

বনবাসে দিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ঘটনাচক্রে এই সময় রাজার মৃত্যু হইল এবং রাজ্যে নানারকম অমঙ্গল দেখা দিল। তখন কুঞ্জের চক্রান্তে কুমার বিশ্বাস করিল যে, কাঞ্চন ডাকিনী ও কোনও উপায় না দেখিয়া তাহাকে বনে নির্বাসন দিল। কাঞ্চন বনে বনে কাঁদিয়া বেড়ায়। ছয়মাস পরে হঠাৎ তাহার সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়িল। দাড়াক গাছের নীচে গিয়া কাঞ্চন সন্ন্যাসীকে স্মরণ করিতেই তিনি আসিয়া তাহাকে গাছের খোড়লের ভিতর আশ্রয় দিলেন। নয়দিনের মধ্যে সন্ন্যাসী সেই বনে এক বিরাট সমৃদ্ধ নগর গড়িয়া তুলিলেন এবং ঘোষণা করিলেন—

"নয়া নগরে কন্যা সুবর্ণ পরতিমা।
যোগ্য দিনে এই কন্যা হবে স্বয়ংবরা॥"

রাজকন্যার এক পণ আছে। সে একটা গান জানে। সেই গানের অর্ধেক সে গায়, বাকী অর্ধেক যে পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে কাঞ্চনমালা তাহাকেই বিবাহ করিবে। সাতরাজ্যের রাজপুত্র ফিরিয়া গেল। অবশেষে—

"অন্ধ এক ভিক্ষুক আইয়া দাঁড়াইল দ্বারে।
লড়িত ভর দিয়া যায় চলিতে না পারে॥"

অন্ধের অনুরোধে কাঞ্চন তাহার গানের অর্ধাংশে আপন জীবনী ব্যক্ত করিলে অবশিষ্টাংশে অন্ধ ভিক্ষুক যখন নিজের পরিচয় দিল তখন দুইজনেরই চেনা-জানা হইল। কাঞ্চনমালা অন্ধ সোয়ামীর পদসেবা করিতে লাগিল।

এইভাবে ছয়মাস কাটিল। ছয়মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিলে কাঞ্চন কাঁদিয়া তাহার দুঃখের কথা বলিল। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন যে, কাঞ্চন যদি জন্মের মত স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতে পারে তবেই তাহার স্বামী চক্ষুদান পাইবে এবং শুধু তাহাই নহে, কাঞ্চন স্বামীকে ছাড়িবে—

"মনে না ভাবিয়া দুঃখ সুখে যাইবা ছাড়ি।
অন্ধ স্বামীরে তবে চক্ষু দিতে পারি।"

অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে কাঞ্চন বলিল—

"স্বামীর সুখের লাইগ্যা আমি যাইবাম ছাড়িয়া।
সোয়ামীকে কর সুখী নয়ন দান দিয়া।

তখন সন্ন্যাসী একটি ফল কাঞ্চনমালাকে দিয়া বলিলেন যে, এই ফল খাইলে

তাহার স্বামীর চক্ষু ভাল হইবে। এই ফল কাঞ্চন কুঞ্জমালাকে দিবে, কিন্তু—

"মনে দুঃখ লইয়া যদি দান কর শেষে।
অন্ধ না পাইবে চক্ষু কহিলাম বিশেষে॥"

তখন কাঞ্চনমালা আপন সুখ-দুঃখের কথা ভুলিয়া ফলের সহিত রাজ্যসহ স্বামীকে কুঞ্জর হাতে সমর্পণ করিল।

"চক্ষে নাই যে জল কন্যার বুকে নাই দুখ।
স্বামী এড়ি যায় কন্যা মনে নাই শোক॥
কি জানি কান্দিলে পাছে স্বামী না হয় ভাল।
মনের যত শোক দুঃখ মুছিয়া ফেলিল॥
এ বড় কঠিন পণ নারী হইয়া জিনে।
না জিনিব হেন পণ পুরুষ পরবিনে॥"

১৩। ভেলুয়া—

'ভেলুয়া'-র নামে একাধিক গাথা রচিত হইয়াছিল। দীনেশ সেনের সংগ্রহে এই একই নামে আমরা দুইটি বিভিন্ন পালা পাই। ইহাদের একটি বানিয়াচঙ্গ শহর হইতে ও অপরটি চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দুইটি গাথারই প্রকৃত রচয়িতা অজ্ঞাত। ইহা ছাড়া মুসলমান কবি মোয়াজ্জেম আলি রচিত 'ভেলুয়া সুন্দরী' নামে একটি গাথা ছাপা অক্ষরে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ছাপা অক্ষরে পুঁথিগুলি প্রকাশ করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। বটতলার সুলভ ছাপাখানার মাধ্যমে এই উদ্যম সফলতা লাভ করিয়াছিল। অল্পশিক্ষিত কবিগণ গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত কবিগণের নিকট হইতে গাথাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আপন পাণ্ডিত্যের আরও কিছু সংযোজন করিয়া বটতলার ছাপাখানা হইতে নিজ নামে প্রকাশ করিতেন। এইরূপে অনেক দুর্লভ গাথাও তাঁহাদের উদ্যমে লোকচক্ষুর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এইরূপ ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত কোন গাথাতেই তাহাদের মৌলিকরূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা না থাকায়, গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত গাথাগুলি অনেক বিকৃত হইয়া ছাপা অক্ষরে প্রকাশ লাভ করিত। যাহাই হউক, সংগৃহীত গাথাগুলি আমরা যে আকারে পাইয়াছি তাহার বিবরণ নিম্নে দিতেছি—

"ভেলুয়ার" প্রথম পালাটি পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে শঙ্খপুরের মদন সাধুর কাঞ্চননগর যাত্রা ও তথায় ভেলুয়ার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার; এই অনুরাগের

ফলে উভয়ের মিলন। মদন সাধু গৃহে ফিরিয়া বন্ধুগণের নিকট আপন হৃদয়ভাব প্রকাশ করিল। তাহার পিতা সমস্ত জানিতে পারিয়া কাঞ্চননগরে ঘটক প্রেরণ করিলেন। কৌলীন্যগর্বে ভেলুয়ার পিতা বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাই যে, মদন সাধু পুনরায় কাঞ্চননগরে গিয়া গোপনে ভেলুয়াকে লইয়া শঙ্খপুরে ফিরিয়া আসিল। মদনের পিতা মুরাই সাধু এই অপহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মদনকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন মদন ভেলুয়াকে লইয়া রাংচাপুরে গমন করিলে তথায় আবুরাজার দৌরাত্ম্যের মধ্যে পড়িল।

তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে আবুরাজার দৌরাত্ম্যের বিস্তৃত বিবরণ। আবুরাজা ভেলুয়াকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনিয়া আটক করিল। ভেলুয়া তখন তাহার নির্বাসিত স্বামীর উপদেশানুসারে কৌশলে স্বামীর বন্ধু হিরণ সাধুর দেশে পলাইল। কিন্তু সেখানেও ভেলুয়ার রূপে আকৃষ্ট হইয়া হিরণ সাধু তাহার নিকট কুপ্রস্তাব করিলে, হিরণ সাধুর ভগ্নী মেনকার সহিত ভেলুয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। মেনকা ও ভেলুয়ার সখিত্বের কথা কবি অপূর্ব দরদের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। মেনকা ভেলুয়ার দুঃখে দুঃখী। সে সহজেই তাহাকে আপন করিয়া লইয়াছে।

"দুঃখিনী ভেলুয়া মেনকা বিরহিণী।
দুইজনে শুনে দুইয়ের দুঃখের কাহিনী॥
দুইয়ের মনের কথা দুইয়েতে বুঝিল।
দুইজনে মনে প্রাণে এক হয়ে গেল॥
খাইতে শুইতে কন্যা হইল সহচরী।
ভেলুয়া বিনে নাহি বুঝে মেনকা সুন্দরী॥
এক শয্যায় দুইজনে করয়ে শয়ন।
এক ত নদীর ঘাটে করে দুইয়ে ছান॥
এক থালায় বইয়া দুইয়ে বাড়া ভাত খায়।
এক অঙ্গ হইল যেমন তারা দুইজনায়॥" ইত্যাদি

সখিত্বের এই মধুর ও স্নিগ্ধ বর্ণনা সাহিত্যে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

মদন সাধুকে হারাইয়া ভেলুয়া দুঃখিনী। আবার মদন সাধুর সহিত মেনকার বিবাহের কথা হয় কিন্তু পরে ভেলুয়ার সহিত বিবাহ হওয়ায় তাহা চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু তখন হইতে মেনকা মদন সাধুকেই তাহার স্বামী বলিয়া জানে।

সুতরাং মদন সাধুর অভাবে মেনকা বিরহিণী। এইরূপে ভেলুয়া ও মেনকা দুই সখী একই ব্যথার ব্যথী।

পলায়নকালে ভেলুয়া ও মেনকা বিশাল নদীবক্ষে আবুরাজার লোকজন এবং ভেলুয়ার স্বজনগণের জাহাজ দর্শনে ভীতা হইয়া উভয়েই নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু জনৈক সাধুচরিত্র বৃদ্ধ বণিক তাহাদের উদ্ধার করিল। অতঃপর মদন সাধুর বিরুদ্ধে হিরণ সাধুর হীন ষড়যন্ত্র হইতে মেনকার পরামর্শে মদনসাধু উদ্ধার পাইল। এদিকে বৃদ্ধ সাধুর আশ্রয় হইতে আবুরাজা পুনরায় ভেলুয়াকে আপন অন্তঃপুরে অবরোধ করিল।

পঞ্চম খণ্ডে সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া চৌগঙ্গায় মদন সাধুর আত্মীয়-স্বজনের সাহায্যে ভেলুয়া উদ্ধার পাইল্ এবং মদন সাধুর সহিত তাহার বিবাহ হইল। আবুরাজা উপযুক্ত শাস্তি পাইল। মদন সাধু মেনকাকেও বিবাহ করিল।

এই গাথাটিতে কবিত্ব সম্পদ বিশেষ নাই। তবে বাণিজ্যের যে বর্ণনা পাই তাহা হইতে তখনকার দিনের সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

দীনেশ সেন কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় পালাটির কাহিনীর সহিত পূর্বোক্ত কাহিনীর কোনও মিল নাই। এই পালাটিতে কিছু কিছু বিকৃত রুচি ও অশিক্ষিত পরিহাস রসিকতার পরিচয় মেলে, যাহা দীনেশ সেন প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা-গুলিতে একান্ত বিরল বলিলেও চলে।

এই গাথাটিতে আমীর সওদাগরের চরিত্র-গৌরব বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অপরাপর পালাগানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ চরিত্রগুলি নারী চরিত্রের সান্নিধ্যে কতকটা হীনপ্রভ। কিন্তু এই গাথাটিতে আমীর সওদাগরের চরিত্রবল এবং প্রেমমহিমা উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

সেকালের যুদ্ধবিগ্রহাদি কিরূপে সম্পাদিত হইত, চট্টগ্রামের নিকটবর্তী কোন্ কোন্ স্থানের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইত এবং কি কি অস্ত্রশস্ত্র তখন ব্যবহৃত হইত, এই সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমরা এই গাথাটিতে পাইতেছি।

কাব্যোক্ত ঘটনা ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেন্ শাহের পুত্র নসরত্ শাহের সময় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। দীনেশ সেন এই গাথাটিকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "হামিদুল্লা নামক কোন লেখক 'তারিখী হামিদী' নামক ফার্সী ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই

গীতিবর্ণিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।" যাহা হউক, এই গাথায় বর্ণিত ঘটনাটি সর্বাংশে ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও, বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বহুল প্রচলন হইতে ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইহার মূল উপকরণ কোনও সত্য ঘটনা হইতেই গৃহীত। এই গাথান্তর্গত আমীর সওদাগর ও ভেলুয়ার প্রেমকাহিনী প্রণয় গাথাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য। কাহিনীটি এইরূপ—

শাফলা বন্দরের মালিক মাণিক সওদাগরের পুত্রের নাম আমীর সাধু। আমীর সাধু রূপে, গুণে অনুপম। একদিন আমীর সাধু শিকারে বাহির হইল। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া তাহার ডিঙ্গা আসিয়া মনুহর সওদাগরের রাজ্যে ভিড়িল। সেই সওদাগরের কন্যা ভেলুয়া অপরূপ রূপবতী। ভেলুয়া সাত ভাইয়ের এক বোন, বড়ই আদুরী কন্যা। সে পায়রা নিয়া খেলা করে। আমীর সাধু না জানিয়া ভেলুয়ার পায়রা মারিল। সেই পায়রা আহত অবস্থায় ভেলুয়ার নিকট আসিয়া পড়িলে ভেলুয়া কাঁদিয়া গিয়া তাহার ভ্রাতাদের নিকট নালিশ জানাইল। সাত ভাই খোঁজ করিয়া জানিল যে, এক বিদেশী সওদাগর পায়রা মারিয়াছে। সাত ভাই তখন নদীর ঘাটে গিয়া সওদাগরকে বন্দী করিল। ভেলুয়ার জননী সওদাগরকে আপন বোনপো বলিয়া চিনিল। এবং তাহার বাঁধন খুলিয়া দিয়া অনেক আদর-যত্ন করিল। অতঃপর সকলের ইচ্ছায় ভেলুয়ার সহিত আমীর সওদাগরের মহাধূমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। তারপর ভেলুয়াকে নিয়া আমির সাধু দেশে ফিরিল।

বিভ্‌লা নামে আমীর সাধুর একটি বোন ছিল। সে দেখিতে যেমন কুরূপা, তেমনি কুশ্রী তাহার মন। সুন্দরী ভেলুয়াকে দেখিয়া হিংসায় তাহার প্রাণ জ্বলিয়া গেল। আমীরকে ভেলুয়ার একান্ত আসক্ত দেখিয়া বিভ্‌লা হিংসায়, ক্রোধে অস্থির হইয়া মায়ের কাছে বলিল, এইরূপ ঘরে বসিয়া যদি ভাই দিন কাটায় তবে ঘরের লক্ষ্মী চলিয়া যাইবে। আমীরের মা কন্যার কথায় সায় দিয়া পুত্রকে বাণিজ্যে যাইতে বলিল এবং বৌয়ের আঁচল ধরিয়া ঘরের কোণে থাকিবার জন্য ধিক্কার দিল। অপমানে, দুঃখে, আমীর সওদাগর বাণিজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ভেলুয়ার বিস্তর নিষেধও গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু দিক ভুল হইয়া রাত্রিকালে ডিঙ্গা আবার শাফলা বন্দরেই ভিড়িলে আমীর সাধু রাত্রিতে আসিয়া সকলের অজ্ঞাতে ভেলুয়ার সহিত দেখা করিল। কপালের দোষে সকাল হইলে

আমীর সাধু যখন চলিয়া গেল তখন ভেলুয়া সুখনিদ্রামগ্ন থাকায় দরজা খোলাই রহিল। আমীর সাধুও মনের ভুলে আপনার আগমন সংবাদ মা এবং বোনকে বলিয়া যাইতে ভুলিয়া গেল। (ঠাকুরদাদার ঝুলির 'শঙ্খমালা' তুলনীয়)। ভোর হইলে ননদিনী ভেলুয়ার ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া তাহার নামে কলঙ্ক দিয়া তাড়াইয়া দিতে চাহিল। সে ভেলুয়ার কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিল না। অবশেষে বিভলার মাতা দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে বাহিরের দাসী করিয়া রাখিল।

"দাসীর কাম করি ভেলুয়া খায় দুইবেলা।
যাতনা দিলরে কত ননন্দী বিভ্‌লা॥
বাহুর বাজু খুলি নিল আর গলার হার।
অগ্নিপাটের শাড়ীখানা কাড়ি নিল তার॥
হাতের কাঙ্কন নিল, গলার হাঁছুলি।
কানের শিকল নাকের নথ নিল সকল খুলি॥"

(তুলনীয়—'শঙ্খমালা')

ভেলুয়া আপন দুঃখে বারমাসী গাহিয়া কাঁদে (এই গাথাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বারমাসী গীত)। একদিন দুপুরে ভেলুয়া একাকী জলের ঘাটে জল আনিতে গিয়াছে এমন সময় ভোলা সওদাগর সেই ঘাট দিয়া ডিঙ্গা বাহিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল ও তাহাকে ধরিয়া নিয়া গেল। ভেলুয়াকে নিকা করিবার জন্য ভোলা পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে ভেলুয়া ব্রতের নাম করিয়া ছ মাসের সময় চাহিয়া লইল। ভোলা তাহাতেই রাজী হইল।

এদিকে বাণিজ্য করিয়া আমীর বহু ধনদৌলত নিয়া গৃহে ফিরিল। বিভলা বলিল যে ভেলুয়ার মৃত্যু হইয়াছে। সে মিথ্যা করিয়া একটি কবর দেখাইয়া বলিল সেখানেই ভেলুয়াকে কবর দেওয়া হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সদাগর কবরের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাঁদিবার পর সদাগরের ভেলুয়াকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে সে কবর খুঁড়িয়া দেখিল যে, কবরে একটি কাল কুকুর রহিয়াছে। তখন ভেলুয়ার শোকে আমীর ফকির হইয়া ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া দেশান্তরী হইল।

টোনা বারই খুব সুন্দর সারিন্দা বাজাইত। ঘুরিতে ঘুরিতে আমীর সেখানে আসিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। আমীর তাহার নিকট সারিন্দা বাজাইতে

শিখিল ও টোনা বারুই তাহাকে একটি যন্ত্র তৈয়ারি করিয়া দিল। সেই সারিন্দা এমন গুণের হইল যে,

"ভেলুয়া, ভেলুয়া" ডাকে সারিন্দার তার।

সারিন্দা বাজাইয়া আমীর পথে পথে ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে ভোলা সদাগরের দেশে আসিয়া পৌছিল। দোতলার ছাদ হইতে ভেলুয়া আমীরকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। তখন—

"ভেলুয়ার অনুরোধে ভোলা সদাইগর।
ফকিরারে থাকিবারে দিলা একখান ঘর॥"

রাত্রে ভেলুয়া ও আমীরের মিলন হইল।

আমীর বলিল, "আমি চোর নই যে, তোমায় লইয়া পলাইব। আমি কাজীর কাছে বিচার চাহিব।"

কিন্তু ভেলুয়ার রূপ দেখিয়া কাজীরও মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আমীরকে বিদায় দিয়া ভেলুয়াকে ধরিয়া রাখিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আমীর দেশে ফিরিয়া যুদ্ধসাজে প্রস্তুত হইতে লাগিল। যুদ্ধে ভোলা আর কাজীর সৈন্য হারিয়া পলাইল। সকল গণ্ডগোলের কারণ বলিয়া ভোলাকে আনাইয়া আমীর তাহার গর্দান নিল এবং ভোলার ভিটা খুঁড়াইয়া 'ভেলুয়া দীঘি' নামে একটি পুকুর কাটাইল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আমীর যখন কাজীর ঘর হইতে ভেলুয়াকে আনিয়া ডিঙ্গায় তুলিল তখন ভেলুয়ার শেষ নিঃশ্বাস পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে লোকজন সব ভেলুয়াকে কবর দিল। রাত্রে আমীর দেখিল সাতটি পরী আসিয়া ভেলুয়াকে কবর হইতে উঠাইয়া লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল।

মোয়াজ্জেম আলীকৃত 'ভেলুয়া সুন্দরী' গাথাটি দীনেশ সেন সম্পাদিত গাথাটির পূর্ববর্তী সংস্করণ। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাঁহার ইসলামী বাংলা সাহিত্যে এই গাথাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। (পৃঃ ৬০-৬৭)।

এই কাহিনীটিও প্রায় উপরোক্ত কাহিনীর মতই কেবল উপরোক্তটি বিয়োগান্ত এবং আলোচ্যটি মিলনান্ত। এখানে কবি ভেলুয়ার মৃত্যুর পরও আরও কিছু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ করিয়া ভেলুয়া ও আমীর সদাগরের মিলন ঘটাইয়া গাথা শেষ করিয়াছেন।

১৪। মানিকতারা বা ডাকাতের পালা—রচয়িতা জামাইৎউল্লা।

এই গাথাটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় নাই। বিশু নাপিতের একমাত্র পুত্র বাসু কুসঙ্গে মিশিয়া খারাপ হইয়া গেল। আরও চারিটি পুত্রের মৃত্যুশোকে বিশু নাপিত পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছে। বিশুর স্ত্রী একমাত্র পুত্র বাসুকে ফেলিয়া মরিতে পারে নাই। কিন্তু কুসঙ্গী কানুর সহিত মিশিয়া বাসু ডাকাতি করিতে শিখিল। মায়ের শত উপদেশ, অনুরোধেও কোন ফল হইল না। বাসু কানুর সহিত মিলিয়া ডাকাতি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাসুর এই অধঃপতন চোখের উপর দেখিতে দেখিতে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বাসুর মা মরণশয্যা লইল। এইখানে গ্রাম্য কবি গ্রাম্য কবিরাজের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিবার মত। মায়ের অসুখে চিন্তিত হইয়া—

"পহর তিনি হাইটা বাসু যায় যে ত্বরাতরি।
তিনকড়ি যে মস্ত বৈদ্য পাইল তাহার বাড়ী॥
হাক ছাড়িয়া ডাকে বাসু কবিরাজ মশায়।
'আমার মাও যে য্যাহন ত্যাহন তোমাকে যাইতে হয়॥'
তিনকড়ি কবিরাজ শুইনা ধুতি চাদ্দর লইল।
চাদ্দরের খুটির মধ্যে দাঐ বাইন্দা নইল॥
হাতে নইল বাগা নাঠি কান্দে লইল ছাতি।
তুলসী তলায় যাইয়া বৈদ্য ঠেকাইল মাথি॥
কিষ্ট বর্ণ শরীল খানি ত্যালত্যালা তার গাও।
খাটাখুটা নাফা গোফা ফাটা ফাটা পাও॥
কুতকুতিয়া চায় কবিরাজ গুরগুরাইয়া যায়।
পাছে পাছে বাসু নাই উপ্তা হোচট খায়॥
বাসুর বাড়ী যাইয়া বলে বৈদ্য তিনকড়ি।
"তোমার মাও যে ভাল হব খাইলে তিনবড়ি॥
আইজকা দিবা ব্যালের ছাল আর নিমের পাতার ঝোল।
কাইলকা দিবা গরম কইরা সজ ভিজাইনা জল॥
পশ্যু দিবা নীল বড়ীটা কাঞ্জী দিয়া গুইলা।
তশ্যুদিবা নীল বড়ীটা কুয়ার পানি তুইলা॥

শেষামেশি দিবা বাসু এই না ধলা বড়ী।
আরাম হইব তোমার মাও থাকব না জরজারি॥
চাকুইল ধানের ভাত খিলাইও শরীলে ঢাইল জল।
ধলা বড়ী খাওয়াইলে দিও তেতুইলের অম্বল॥"

—পৃঃ ২৪৯

গায়ন যখন অঙ্গভঙ্গি সহকারে এই সব অংশ গাহিত তখন শ্রোতাদের ভিতর হাস্যের রোল উঠিয়া যাইত।

যাহাই হউক বাসুর মায়ের ভাগ্য ভাল। কবিরাজের অব্যর্থ ঔষধ খাইবার আগেই,

"সন্ধাবেলা বাসুর মাও যে চক্ষু মেইলা চাইল।
জর্ম্মের মোত বাসুক থুইয়া সগ্যে চইলা গেল॥"

—পৃঃ ২৫০

ইহার পর সাধুশীলের কন্যা মানিকতারার সহিত বাসুর বিবাহ হইল। বাসুর পূর্বরাগের বর্ণনাটি গ্রাম্য কবির সুরুচির পরিচয় দেয়। মানিকতারা বাসুর ঘরে আসিয়া সুনিপুণ হস্তে সংসার তুলিয়া লইল। রূপবতী, গুণবতী মানিকতারা বাসুর সুখে, দুঃখে, বিপদে বড় সহায় হইয়া উঠিল। ইহার পর মানিকতারা কিভাবে ডাকাতদের জব্দ করিয়া বাসু ও কানুকে উদ্ধার করিল সেই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। গাথাটি অসম্পূর্ণ। তবে মানিকতারার বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় দিবার জন্যই যে গাথাটি রচিত তাহা অনুমান করা যায়।

এই গাথাটিতে মুসলমান কবি একস্থানে হিন্দুদিগের প্রচলিত বিশ্বাস ও প্রথাসমূহের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন। গাথাটির পাত্র-পাত্রী হিন্দু। মানিকতারা ও বাসুর বিবাহের ক্রিয়াকরণকে উপলক্ষ্য করিয়া কবির উক্তি,

"হেন্দুর শাস্ত্র মহাশাস্ত্র এই কতা কি খাটি।
বেবাক ঋণ শুইজ্জা গেল দিয়া এন্দুর মাটি॥"

১৫। **মদনকুমার ও মধুমালা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

আলোচ্য গাথাটি মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি রূপকথা। এই রূপকথার গল্পটি হইতে উপাদান লইয়া বিভিন্ন অঞ্চলের কবিগণ গীতিকথা, গাথা, কেচ্ছাগাথা ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন। এই কাহিনীটি বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই সুপ্রচলিত ছিল। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রচনায় মিলও

যেমন আছে, পার্থক্যও তেমনি দেখা যায়। তবে মূল কাহিনী সর্বত্রই এক। রাজপুত্র মদনকুমার ও রাজকন্যা মধুমালার প্রণয়, বিরহ ও সর্বশেষে বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া উভয়ের মিলন। কালপরী, নিদ্রাপরী কর্তৃক রাজপুত্র ও রাজকন্যার প্রথম মিলন ঘটাইবার উল্লেখ প্রত্যেকটি গাথাতেই পাই। তবে স্থানে স্থানে তাহাদের পরী না বলিয়া অন্য আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। যেমন, দীনেশ সেনের এই সংগ্রহে কালপরী, নিদ্রাপরীর স্থানে পাই ইন্দ্রের সভার দুই নর্তকী। সৈয়দ হামজার মধুমালতীতে রাজকুমারের নাম 'মনুহর' বলিয়া উল্লিখিত। এইরূপে কাহিনী এক হইলেও বিভিন্ন কবির রচনায় পাত্র-পাত্রীর নাম ও স্থানের নামে কিছু পার্থক্য দেখিয়া বোঝা যায় অঞ্চলভেদে পাত্র-পাত্রীর নাম পৃথকরূপে গীত হইত। দীনেশ সেনের সংগ্রহে যে কাহিনীটি পাই তাহা গীতিকথার আকারে লিপিবদ্ধ, কিছু পদ্য এবং কিছু গদ্য। বটতলার ছাপাখানাতেও কতিপয় 'মধুমালা' কাহিনী ছাপা হইয়াছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রচিত 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'-তেও এই রূপকথাটি স্থান পাইয়াছে গীতিকথার আকারে। আব্দুল করিমের পুঁথি বিবরণীতেও 'মদনকুমার-মধুমালার' পুঁথির উল্লেখ পাই। (বাংলা প্রাঃ পুঃ বিঃ—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১১৯ সংখ্যক পুঁথি)। এই পুঁথিটিতে রচয়িতার কোনও নাম পাওয়া যায় নাই। প্রথম হইতে পঞ্চম পাতা নাই, ষষ্ঠ পাতা হইতে ২৯শ পাতা মাত্র আছে। অক্ষর দেখিয়া পুঁথিটি খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। আব্দুল করিম তাঁহার পুঁথি বিবরণীর ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যায় আরও একটি 'মধুমালতী' কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন (পুঁথি সংখ্যা ৫২৩, পৃঃ ৬৩)। শ্রদ্ধেয় করিম সাহেব বলিয়াছেন, "এই পুঁথি ১২৬৩ শকের বৈশাখ মাসের ৩রা তারিখ শনিবার দ্বিপ্রহরে সমাপ্ত হয়। ইহা রচয়িতার নিজহস্তের লেখা। পুঁথির বহিঃপৃষ্ঠে লিখিত আছে,—কবির নিবাস চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাওলা প্রকাশ পোপাদিয়া গ্রামে। হাওলা একটা চাকলার নাম। এই পুঁথিটিতে পাত্র-পাত্রীর নাম মনোহর-মালতী পাই। সৈয়দ হামজার রচনায়ও পাত্র-পাত্রীর নাম মনুহর এবং মালতী। ইহা ছাড়া কতকগুলি কেচ্ছাজাতীয় গাথাতেও এই উপাখ্যানটি পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, মধুমালার কাহিনীটি খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং ইহার বহুল প্রচলনই বিভিন্ন রচয়িতার রচনায় কিছু কিছু পার্থক্যের কারণ। মধুমালা ও মদনকুমারের কাহিনীটি সংক্ষেপে মোটামুটি এইরূপ—

এক রাজা (বিভিন্ন রচনায় রাজার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়)—রাজার কোনও পুত্র-কন্যা নাই। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর কৃপায় রাজা এক পরমসুন্দর পুত্র লাভ করিলেন। তাহার নাম হইল মদনকুমার (বিভিন্ন সংগ্রহে বিভিন্ন নাম)। কিন্তু সন্ন্যাসীর নির্দেশে কুমারকে জন্ম হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত পাতালপুরীতে রাখা হইল। বার বৎসরের পূর্বে চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখিলে অমঙ্গল হইবে সন্ন্যাসী এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির নির্বন্ধে ১২ বৎসর পূরিতে যখন আর সামান্য সময় বাকী তখন কুমার আর কিছুতেই পাতালপুরীতে রহিলেন না, বাহির হইয়া আসিলেন। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। কুমার শিকারে গেলেন। সেখানে রাত্রে দুই পরী তাঁহার তাঁবু হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া মধুমালা (রাজকন্যার নামও বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন রূপে পাই) যেখানে ঘুমাইয়াছিলেন সেখানে নামাইল এবং মদনকুমার ও মধুমালার মিলন হইল। ভোর না হইতেই দুই পরী-ভগ্নী পুনরায় মদনের পালঙ্ক তাঁবুতে রাখিয়া আসিল। এদিকে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মদন 'মধুমালা, মধুমালা' করিয়া পাগল হইলেন। সকলে কুমারকে বুঝাইল তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন এইরূপ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু কুমার কাঁদিতে লাগিলেন—

"স্বপন যদি মিথ্যা হইত তার আংটি কেন আমায় দিত
স্বপনে দেখি।
স্বপন যদি মিথ্যা হইত খাট পালঙ্ক কেন বদল হইত
আমি স্বপনে দেখি।"

(পূর্ববঙ্গ গীতিকা—২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৮)

ওদিকে নিদ্রাভঙ্গে কুমারকে না দেখিয়া বিরহিণী মধুমালাও পাগলিনী প্রায়। কাহারও নিষেধ না শুনিয়া মদনকুমার মধুমালার সন্ধানে বাহির হইলেন এবং বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া, চারি কন্যাকে বিবাহ করিয়া, অবশেষে মধুমালার দেশে গেলেন। মদনকুমার ও মধুমালার মিলন হইল। মধুমালা ও চার কন্যাকে লইয়া মদনকুমার দেশে ফিরিলেন (কোথাও কোথাও চার কন্যার উল্লেখ আবার কোথাও বা তিনকন্যার উল্লেখ)। গাথাটির বহুল প্রচারই এইরূপ বিভিন্নাংশে পার্থক্যের কারণ।

১৬। **সুরৎ জামাল ও অধুয়া**—রচয়িতা জন্মান্ধ কবি ফৈজু ফকির।

বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ানদিগের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে গাথাটি রচিত। মৈমনসিংহের অন্যান্য রচনার মত এই পালাগানে তেমন কবিত্ব-সম্পদ নাই।

এই পালাটি পাঠ করিলে মুসলমান আমলের সমাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা হয়। এই গাথাটিতে হিন্দুনারী ও মুসলমান পুরুষের প্রেমকথা বর্ণিত হইয়াছে।

বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান আলাল খাঁ ও তাহার ছোট ভাই দুলাল খাঁ। দেওয়ান আলাল খাঁ গুণের অবতার। তাঁহার বিবি ফতিমা অন্তঃসত্ত্বা হইলে গণক গুনিয়া বলিল,

"তোমার কুলেতে অইব একটি নন্দন।
রূপেতে আইব পুত্র ছুরৎ জামাল
বাপের চমান বেটা বংশের দুলাল॥"

কিন্তু, "যদি কুড়ি বছরের মধ্যে দেখ পুত্রের মুখ
পুত্রের কারণে তুমি পাইবা বড় ছোক।
রাজ্যের যতেক লোক যে দেখে তাহারে।
তাহার কারণে তোমার পুত্র যাইব মরে॥"

এই কথা শুনিয়া আলাল খাঁ দেওয়ান ভ্রাতা দুলাল ও উজীর নাজীরেব সহিত পরামর্শ করিয়া 'তেরা লেংড়া' মজুরকে ডাকিয়া হাইলা জঙ্গলে এক পুরী নির্মাণ করিবার হুকুম দিলেন।

"এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন
বিবিরে পাঠাইলা সাহেব সেই হাইলা বন।
কুড়ি বছরের খান্ খুড়াকী সঙ্গে তার দিয়া
এক বান্দী সঙ্গে বিবিরি রাখিল আসিয়া।"

এইভাবে বিবিকে জঙ্গলে পাঠাইয়া দেওয়ানের মন উদাস হইয়া গেল, রাজকার্যে মন বসে না। তখন একদিন ভাই দুলালের উপর সমস্ত ভার দিয়া দেওয়ান দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। বলিয়া গেলেন—

"ফকীর হইয়া আমি যাইবাম মক্কার স্থানে
হজরত আল্লার পাড়া পইড়াছে সেখানে।
কুড়ি বছর আমার নামে কর দেওয়ানগিরি।
কুড়ি বছর বাঁচি যদি ফিরিবাম বাড়ী॥"

দেওয়ান চলিয়া গেলেন, দেশের সকল লোক, পশু-পাখী কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে জঙ্গলের পুরীতে ফতিমা বিবির একটি সুন্দর পুত্র হইল। পুত্র ক্রমে বড় হইতে লাগিল। অপরূপ সুন্দর কুমার—

"আল্লাইরে মানিক বাছা কলিজার সাল।
মায়েত রাখিল নাম ছুরত জামাল॥"

যখন শিশু সাত বছরের হইল তখন একদিন দেওয়ান দুলাল শিকার করিতে যাইয়া বনে শিশুকে দেখিল। দেখিয়া গণকবাণী স্মরণ করিয়া তাহার খুব চিন্তা হইল এবং দুষ্ট বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া ফতিমা ও জামালকে বনের মধ্যে মাটি চাপা দিয়া মারিবার ফন্দী আঁটিল। বৃদ্ধ উজীর এই কথা জানিতে পারিয়া ফতিমা বিবিকে সংবাদ দিলে ফতিমা শিশুপুত্রসহ স্বামীর ব্রাহ্মণ বন্ধু দুবরাজ রাজার আশ্রয় নিলেন। এই ব্যাপারে জামাল আপন জন্মপরিচয়-সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিল। ব্রাহ্মণ রাজার দেশে মাতা-পুত্রের দিন কাটে। একদিন রাত্রে সবার অলক্ষিতে জামাল বান্যাচঙ্গ শহরে গিয়া পিতার রাজত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখিয়া আসিল। আসিয়া মাতাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইল। অতঃপর জামাল যখন ষোল বৎসরের হইল তখন ফৌজ লইয়া লড়াই শিখিতে লাগিল। কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে জামাল মায়ের কাছে শিকার করিতে যাইবার অনুমতি নিয়া বাহির হইল। কিন্তু আসলে সে ফৌজ লইয়া পিতার রাজ্যে চলিল। তারপর—

বাপের রাজত্বি দেওয়ান দখল করিল
বির্দ্ধ উজীরে তবে সম্বাদ যে দিল॥

মাকে আনাইয়া লইয়া জামাল খাঁ রাজত্ব করিতে লাগিল।

দুবরাজ রাজার কন্যা অধুয়া অপরূপ রূপবতী। একদিন ফুল তুলিতে গিয়া অধুয়া জামালকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইল এবং বলাবাহুল্য তাহার প্রেমে পড়িল। দাসীর হাতে সে জামালকে পত্র দিল। পত্র পাইয়া জামাল খাঁ পান্‌সী লইয়া দুবরাজ রাজার ঘাটে চলিল। ঘাটে অধুয়া সখীদের সঙ্গে স্নান করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া জামাল তাহার রূপে পাগল হইল। এদিকে কন্যাও জামালকে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া প্রাসাদে ফিরিল। বাড়ি ফিরিয়া জামাল বৃদ্ধ উজীরের হস্তে অধুয়াকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিয়া এক পত্র পাঠাইল দুবরাজ রাজার কাছে। জামালের এই স্পর্ধা দেখিয়া রাজা জ্বলিয়া উঠিল এবং

উজীরের এক কান কাটিয়া, দাড়ি উপড়াইয়া, অঙ্গে লোহার ছেকা দিল। উজীর এই খবর নিয়া ফিরিলে জামাল,—

"বাতাস পাইয়া যেন আগুনি জ্বলিল।
সাজাইতে রণের ঘোড়া আদেশ করিল॥"

জামাল যুদ্ধ করিতে চলিল।

এদিকে দুলাল খাঁ ফকির হইয়া মক্কার পথে খুঁজিতে খুঁজিতে আলাল খাঁর দেখা পাইল এবং তাহার কাছে জামালের নামে মিথ্যা করিয়া লাগাইল। এই কথা শুনিয়া আলাল ভীষণ রাগিয়া গেল। দেশে ফিরিতে পথে দুবরাজের সহিত দেখা হইল। দুবরাজও জামালের উপর অসন্তুষ্ট, কাজেই সেও তাহার বিরুদ্ধেই বলিল। তখন আলাল দুবরাজকে লইয়া সৈন্যসামন্ত সমেত বাম্‌্যাচঙ্গ শহরে চলিল যুদ্ধ করিতে। জামাল এই কথা শুনিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পিতার সাক্ষাতে চলিল। পিতার হুকুমে জামাল বন্দী হইল।

এদিকে দিল্লীর বাদশা ফৌজ চাহিয়া আলালের নিকট পত্র দিলেন। ফৌজ না পাঠাইলে স্ত্রী-পুত্রসমেত আলালের গর্দান যাইবে। তখন সকলে বুদ্ধি দিল জামালকে রণে পাঠাও। বাপের হুকুমে জামাল রণে চলিল। ফতেমা বিবি কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি তো জানেন যে জামালকে মারিবার জন্যই রণে পাঠানো হইতেছে। পথে যাইতে যাইতে জামাল সমস্ত সমাচার দিয়া অধুয়াকে এক পত্র পাঠাইয়া দিয়া গেল।

হাতের আঙ্গুরী আর পত্রখানি দিয়া
অধুয়ার কাছে জন দিল যে পাঠাইয়া॥

পথে যাইতে জামাল নানারূপ অযাত্রা দেখিল। দুইতিন মাস পরে আলালের কাছে জামালের মৃত্যুর খবর আসিল।

আলাল খাঁ ও ফতিমা বিবি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধ উজীর আসিয়া আলালের নিকট সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

এইকথা আলাল খাঁ দেওয়ান যখন শুনিল
পুত্রশোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

আলালের হুকুমে দুবরাজের গর্দান গেল ও দক্ষিণবাগ শহরে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইল।

এদিকে জামালের পত্র পাইয়া অধুয়া চণ্ডীপূজা করিতে বসিল। এমন সময় ফৌজ আসিয়া অধুয়া ও তাহার পিতাকে বান্ধিয়া লইয়া চলিল। বাম্যাচঙ্গ শহরে প্রজাদের কান্না শুনিয়া,

মনে মনে করে কন্যা পতির চিন্তন।

তারপর—

জামালের মৃত্যু কন্যা যখন শুনিল
কেশে বান্ধা বিষের কটুয়া খুলিয়া লইল॥

আলাল খাঁ হুকুম করিলেন অধুয়ার সহিত তাঁহার ঘোড়ার সহিস কেরামুল্লার বিবাহ দিবার জন্য। এইরূপে তিনি দুবরাজ কর্তৃক জামালের নামে মিথ্যাচারণ করিবার প্রতিশোধ লইতে চাহিলেন। কিন্তু যখন—

কেশে ধর্যা অধুয়ারে বাহির করিল।
বিষেতে অবশ অঙ্গ সকলে দেখিল॥

স্বামীর মৃত্যু সংবাদে অধুয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে। তখন আলাল খাঁর,

দেখিয়া কন্যার মুখ ফাট্যা যায় বুক
অন্তরে জ্বলিয়া উঠে মরা পুত্রশোক।
জামাল খাঁর পত্র দেখে কেশে বান্ধা ছিল
এহি পত্র আলাল খাঁ দেওয়ান দেখিতে পাইল।
কন্যার আঙ্গুলে দেখে হীরার আঙ্গুরী
দেখিয়া আলালে কান্দে হাহাকার করি।

এই অঙ্গুরী জামালের ছিল। দেওয়ান আশ্চর্য হইলেন 'সেইত অঙ্গুরী কন্যা কেমনে পাইল।'

তখন দুবরাজ বন্ধুকে সকল কথা জানাইলে শোকগ্রস্ত

"দুই দোস্তে গলাগলি জুড়িল ক্রন্দন
অন্তরে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন।"

দুলালকে দেওয়ানগিরি দিয়া আলাল আবার ফকির হইয়া মক্কায় চলিলেন। বামুন দুবরাজও মনের খেদে মুসলমান হইয়া মক্কার পথে চলিল। রাজ্যের লোক, হাতী, ঘোড়া, গাছ-গাছালি সকলে কাঁদিতে লাগিল।

১৭। মাঞ্জুর মা—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই পালাটি ৪৭০ ছত্রে সম্পূর্ণ। ইহা মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

এই পালাটির নায়ক সেখ মনির জগতের হিতকামী, অথচ স্ত্রীজাতির উপর বিদ্বিষ্ট।

"বিয়া সাদি না করিল রে
আরে ওঝা থাকয়ে একেলা।
স্তীরি জাতি নষ্টা জাতি রে
আরে ভালা নারীর মুখ না দেখিলা।"

তাহার স্ত্রী জাতির প্রতি এমনি ঘৃণা ছিল যে, কোনস্থানে যাইবার মুখে স্ত্রীলোক দেখিলে অযাত্রা- মনে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিত। সে সর্পদংশনের আশ্চর্য মন্ত্রতন্ত্র ও ঔষধ জানিত। সর্পদংশনে মৃতকল্প রোগীকে সে গারুড়ী মন্ত্রবলে পুনরায় জীবনদান করিত।

স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধবয়সে মনির অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া গেল।

মনির তখন প্রৌঢ়, এমন সময় একদিন খবর পাইল যে, নিকটের কোনও গ্রামে এক ব্যক্তি সর্পদষ্ট হইয়াছে। মনির অনেক চেষ্টা করিয়াও অদৃষ্ট দোষে তাহাকে বাঁচাইতে পারিল না। এই সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তির একটি পরমাসুন্দরী শিশুকন্যা ছিল। যখন তাহার পিতাকে সকলে কবর দিতে লইয়া গেল, তখন সেই মেয়েটি—

"ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রে
আরে ভাইরে পুনুমাসীর চান।"

অপয়া বলিয়া তাহাকে কেহ গ্রহণ করিল না। মনিরের মম টলিল। সে শিশুটিকে কোলে লইয়া তাহার নির্জন কুটীরে ফিরিল এবং আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল 'মাঞ্জুর মা'। ক্রমে ক্রমে শিশুটি বড় হইয়া উঠিল। সে মনিরকে খুব সেবাযত্ন করে। এদিকে প্রৌঢ়ত্বের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া মনির বার্ধক্যের কোঠায় পড়িয়াছে। মনির ভাবিল 'মাঞ্জুর মার' মত নিষ্কলঙ্ক রমণীকে কোনও দুরাত্মার হস্তে সমর্পণ করা উচিত নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে সে আপনি

উহাকে বিবাহ করিবে স্থির করিল। তাহার এই সঙ্কল্পের মধ্যে কোনও ইন্দ্রিয়জনিত লালসা ছিল না। তখন,

"জেত্তা চান্দের জুম্মাবার রে
আরে ভালা বাছিয়া গুছিয়া।
মনির ওঝা মাঞ্জুর মায় রে
আরে ভালা রাখল সাদি করিয়া ॥"

কিন্তু মাঞ্জুর মা ইহাতে সুখী হইল না। তাহার প্রথম যৌবন, বৃদ্ধ স্বামীতে কি তাহার মন ভরে? বাল্যকালের খেলার সাথী হাসেনকে সে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। তাহারা উভয়েই ভাবিয়াছিল, ওঝা তাহাদের দুইজনকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবে। কিন্তু ওঝার এই ব্যবস্থায় মাঞ্জুর মা ও হাসেন দুইজনেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিন মনির ওঝার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া দুইজনে গৃহত্যাগ করিল। মনির গৃহে ফিরিয়া মাঞ্জুর মাকে দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার একবারও মনে হইল না যে, মাঞ্জুর মা তাহাকে প্রতারণা করিতে পারে। সে তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পাগলের ন্যায় বনে জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নদীগর্ভে প্রাণ উৎসর্গ করিল। মনির ওঝা নারী বিদ্বেষী ছিল এবং এইভাবে নারীই তাহার প্রাণনাশের কারণ হইল।

এই পালাটিতে অন্য গাথাগুলির সহিত মূলসুরের পার্থক্য দেখা যায়। গাথাগুলির বেশীর ভাগেই স্ত্রীলোককে উচ্চে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই গাথাটিতে পুরুষের মহত্ত্ব দেখান হইয়াছে।

১৮। কাফেন চোরা—রচয়িতা অজ্ঞাত।

নিজাম ডাকাইত, কেনারাম এবং মনসুর এই তিন পালার মধ্যে অনেকটা ঘটনার ঐক্য আছে। তিনজনই দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া জীবনের শেষাধ্যায়ে ধর্মবীরে পরিণত হইয়াছিল।

'কাফেন চোরা' নামক গাথাটিতে মনসুর ডাকাইতের জীবনের পরিবর্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মনসুর ডাকাইতের বিকৃত প্রেম এই গাথার বর্ণিত বিষয়।

দুর্দান্ত চাটগাঁয়ী লুধাগাজীর ঔরসে চেঁউয়া পরীর গর্ভে মনসুর ডাকাতের জন্ম। মনসুর ডাকাতের বাল্যকালের বর্ণনায় কবির বর্ণনাশক্তির পরিচয় মেলে। বাল্যকালেই তাহার পিতা লুধাগাজী ব্যাঘ্রহস্তে নিহত হইল।

যৌবনে মনসুর ডাকাতি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন এক নব বিবাহিত বধূর পাল্কীর উপর চড়াও হইয়া মনসুর সমস্ত কাড়িয়া লইল।

চিন্তাপুর গ্রামে কুর্মাই নদীর কূলে মাঝির সরদার আজিমের বাড়ি। তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অতি সুন্দরী। নাম আয়রা বিবি। আজিম আয়রাকে অত্যন্ত ভালবাসে।

অগ্রাণ মাসে আজিম বাণিজ্য করিতে চলিল। তাহার মা বৌ খুব কাঁদিতে লাগিল। আজিম বাহির হইয়া পথে নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখিতে লাগিল। (এই সংস্কারগুলি এখনও প্রতি গৃহস্থ ঘরেই মানা হয়। এই সংস্কারগুলির কথা অনেক গাথাতেই পাওয়া যাইতেছে)। যেমন—

উড়িয়া যাইতে তার চৈক্ষে হানিল মাছি।
ঘরের থুন বাহির হৈতে মুখে পৈল হাঁছি॥
ডানর থুন আসি সপ বামে গেল ধাই।
পন্থের মাঝে দেখে আজিম ডুমা একটা গাই॥ (শৃঙ্গহীন)
দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছে গোয়াল্যার ছাওয়াল।
(এই দধির ভাণ্ড ভাঙ্গিবার সংস্কার আবার অনেকের মতে মঙ্গলপ্রদ)
জাইল্যার পুতে কাঁদন করে ঘুট্যাত বাজাই জান॥
তিন বিবি বসিয়া রে মাথাত উকুন চায়।
খাইল্যা কলসী লইয়া নারী জল আনিতে যায়॥

এদিকে মনসুর সেই পাল্কীর লুণ্ঠিত বৌটিকে ভুলিতে পারে নাই। একদিন খোঁজ করিতে করিতে গোপনে আসিয়া চিন্তাপুর গ্রামে এক বুড়ির বাড়িতে মিথ্যা পরিচয় দিয়া আশ্রয় লইল।

একদিন দ্বিপ্রহরে আয়রা নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছে। মনসুর ডাকাত একটি গাছের আড়ালে থাকিয়া তাহাকে দেখিল। তাহাকে দেখিয়া মনসুর মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাহার পাপপ্রকৃতি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

চৈত্র মাস, অসহ্য গরম। সন্ধ্যা বাতি দিয়া আয়রা নির্জনে একলা পতির চিন্তা করিতেছে। পতিবিরহে দুঃখিনী আয়রা "মনের সন্তাপে তখন বারমাসী গায়"। পতির কথা চিন্তা করিতে করিতে আয়রা ঘুমাইয়া পড়িল। সিধ-কাটিয়া মনসুর ঘরে ঢুকিয়া মোমবাতি জ্বালিয়া আয়রাকে দেখিল। আয়রা

জাগিয়া উঠিয়া কাঁপিতে লাগিলে মনস্থর তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে লাগিল। তখন,

গোল্লার আবাজের মতন মারিয়া জিক্কার।
পাড়াপড়শীগণে আয়রা ডাকে বারবার ॥

মনস্থরের কোনও হুঁস নাই। চারিদিক হইতে প্রতিবেশী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বেদম প্রহার করিল। প্রহারের চোটে ডাকাত যখন মৃতপ্রায় তখন তাহাকে টানিয়া তাহারা গলায় ফাঁসী লাগাইয়া গভীর জঙ্গলে গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিল।

কিন্তু মনস্থর মরিল না। আস্তে আস্তে ফাঁসির বাঁধন খুলিয়া সে গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

এদিকে স্বামী বিরহে, মনের ধিক্কারে আয়রা অসুখে পড়িল। বহুদিন ভুগিল আয়রা। অবশেষে যেদিন আজিম ফিরিল সেইদিনই আয়রা মারা গেল। আজিম হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে,

মিলিমিশি পাড়াপড়শী ভাই বেরাদর।
ময়দানের মাঝে দিল আয়রার কবর ॥

গভীর রাত্রিতে, চারিদিক নিঝুম, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। কেহ কোথাও নাই। মনস্থর ডাকাত আসিয়া আয়রার কাফেন খুঁড়িয়া বাহির করিল। তাহার পাপাসক্তি এমন চরমে পৌছাইয়াছে যে, মৃত আয়রার ওপরই সে তাহার প্রবৃত্তি তৃপ্ত করিতে আসিয়াছে। সে যখন কাফেন ধরিয়া টানাটানি করিতেছে তখন মরা কন্যা নড়িয়া উঠিল। মনস্থর ভয়ে চমকাইয়া উঠিল। মনস্থর অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। অচেতনতার ঘোরে সে দেখিল,

কয়বর ছাড়ি আসি আয়রা ছায়ে হৈল খাড়া।
হাত লাড়ি বলে কৈন্যা "শুনরে মনস্থর।
আখেরের কথা ভাব দুঃখ হৈব দূর॥
ছাড়ি দাও আজি হৈতে দাগা বাজি কাম।
নমাজ পড় রোজা থাক রাখরে ইমান॥"

মনস্থর বলিল, ডাকাতি না করিলে পেট ভরিবে না। কি করিয়া সে ডাকাতি ছাড়িবে। তখন আয়রা বলিল, ডাকাতি না ছাড়িলেও নিয়মিত

রোজ পাঁচ আক্ত নমাজ পড়িলেও তাহার পাপক্ষয় হইবে। তখন মনস্থর তাহাতেই সম্মত হইল।

ইহার পর আশ্চর্য পরিবর্তন হইল মনস্থর ডাকাতের। মনস্থর আর ডাকাতি করিতে চাহে না। নিয়মিত পাঁচ সন্ধ্যা নমাজ পড়ে।

একদিন দলের লোকের একান্ত অনুরোধে মনস্থর ডাকাতিতে বাহির হইল। মনস্থর লোকজনকে দুয়ারে দুয়ারে রাখিয়া একাই গৃহে প্রবেশ করিল। সে ঘরে ঢুকিয়া সিন্দুক খুলিয়া অনেক টাকা, পয়সা ও দামী শাড়ি দেখিতে পাইল। পাশেই খাটে গৃহের মালিক ও তাহার স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছে। মনস্থর তাহাও দেখিল। হঠাৎ,

এগ্নিকালে কুড়ায় ডাকি জানাইল ফজর।
থাপ্‌দি চাহি দেখে ডাকাত হৈতেছে পহর॥

ইহা দেখিয়া মনস্থর সব ভুলিয়া "লা-এলাহা-ইল-আল্লাহ" ডাক ছাড়িয়া নমাজ পড়িতে বসিল। দলের মানুষ এই চীৎকারে সকলে পলাইল। গৃহস্বামী জাগিয়া উঠিয়া মনস্থরকে দেখিয়া অবাক। তাহার নমাজ শেষ হইলে গৃহস্থ আসিয়া তাহার পায়ের উপর পড়িল। সে মনস্থরকে পীর ভাবিয়াছে। মনস্থর সত্য পরিচয় দিলেও গৃহস্থ বিশ্বাস করিল না। গৃহস্থ তাহার নিকট দীক্ষা চাহিল ও সমস্ত ধন-দৌলত আনিয়া মনস্থরের পায়ের উপর ঢালিয়া দিল। মনস্থর সেই ধন-দৌলত আনিয়া দলের লোককে ভাগ করিয়া দিল এবং নিজে ফকীর হইয়া চলিয়া গেল। মনস্থর পীর হইয়া গেল। তখন হইতে মনস্থর মাঝে মাঝে জঙ্গল হইতে আসিয়া আয়রার কবরকে সম্মান দেখাইয়া ঈশ্বরের মন্ত্র পড়িয়া যাইত।

। ১৯। **আয়না-বিবি**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

আয়নাবিবির পালাটিকে মহুয়া, কমলা, ইত্যাদি পালার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। পূর্ববঙ্গগীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত ধোপার পাটের কাঞ্চনমালার সঙ্গে আয়নাবিবির চরিত্রের বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই পালাটিতে বারমাসীর বর্ণনা, পৌষের আঁধা (কুজ্‌ঝটিকা) এবং শরতের পক্ক শালিধান্য হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ়িয়া নদীর বন্যা এবং ভাদ্রমাসের 'চাদনি' (জ্যোৎস্না) পর্যন্ত এই দেশের ঋতুভেদে যে বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহাতে বাংলার পল্লীচিত্র যেন আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

প্রণয়গাথা হইলেও বাৎসল্যরসের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায় এই পালাটিতে।

বাংলা গাথাসাহিত্যে রমণীদিগকেই সর্বত্র উজ্জ্বলভাবে পাওয়া যায়, পুরুষচরিত্র ইহাদের নিকট পরিম্লান। 'কঙ্ক ও লীলায়' কঙ্ক এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আরও দুই একটি পুরুষ চরিত্রকে খুব উন্নত করিয়াই আঁকা হইয়াছে। তবে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং উজ্জ্বল সদাগর তাহাদের মধ্যে একটি। কাহিনীটি এইরূপ—

চাঁদের ভিটায় উজ্জ্বল সাধুর বাস। শিশুকালে উজ্জ্বলের পিতৃবিয়োগ হয়। মায়ের আদরে উজ্জ্বল বাড়িতে লাগিল। যৌবনে উজ্জ্বল খুব কর্মঠ হইল এবং মায়ের কাছে বিদায় নিয়া বাণিজ্যে চলিল।

ভেরামনার (শ্রীহট্টের নদী) বুকে ভাসিয়া এক গ্রামে রাত্রে ডিঙ্গা ভিড়াইয়া সাধু এক গৃহস্থের ঘরে অতিথি হইল। গৃহস্থ বুড়া মানুষ। তাহার একটি কন্যা। নাম আয়না বিবি। উজ্জ্বল সাধু তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। (গাথাগুলিতে সকল নায়িকাই রূপবতী, কিন্তু রূপের বর্ণনায় বেশ বৈচিত্র্য ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়)।

সাধু পরিচয় দিয়া জানিল যে, কন্যার পিতা ও তাহার পিতা উভয়ে বন্ধু ছিল। সাধু ও কন্যা উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়িল। সাধু বিদায় নিলে আয়নার মনে বিরহের জ্বালা দেখা দিল। মনের দুঃখে আয়না শুখাইয়া যাইতে লাগিল—

> "ঋণচিন্তা রোগচিন্তা সংসারচিন্তা দর।
> যৈবনকালের পীরিতচিন্তা সকল চিন্তার বড়॥"

এদিকে সাধুর অবস্থাও সেইমত হইল। আয়নার ভাবনা করিতে করিতে বাণিজ্যে লোকসান দিয়া ছয়মাস পরে পুনরায় ঘুরিতে ঘুরিতে আয়নার দেশে গিয়া—

> "চরেতে উঠিল উজ্জ্যাল আয়নারে দেখিতে।
> শূন্য ভিটা পইড়া আছে না পায় দেখিতে॥
> পিঞ্জরা রইয়াছে খালি পক্ষী মারছে উড়া।
> খুজ্যা না পায় উজ্জ্যাল সাধু হইল বেহুরা॥"

ইহা দেখিয়া সাধু পাগলের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। গৃহে আর ফিরিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে এক গ্রামে ভিক্ষা লইতে গিয়া এক গৃহস্থের ঘরে আয়নার সঙ্গে দেখা হইল। আয়না উজ্জ্বলের সহিত মামার ঘর ছাড়িয়া পলাইল। উজ্জ্বল গৃহে ফিরিয়া আয়নাকে বিবাহ করিল।

(এই পালাটিতে 'মহুয়া'র সহিত অনেক ছত্রের মিল আছে)

আয়নার সহিত কিছুদিন আনন্দে কাটাইয়া সাধু বাণিজ্যে গেল। আয়না যাইবার সময় অনেক বাধা দিল। সে বলিল, সে যেমন করিয়াই হউক সংসার চালাইবে তবুও উজ্জ্বলকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না। আয়নার আবেদন করুণ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে উজ্জ্বলের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ পাইয়া আয়না পাগলের ন্যায় গৃহত্যাগ করে ও এক দয়াবান গৃহস্থের সাত পুত্রের সাহায্যে এক নদীর চরে কাতর উজ্জ্বল মামুদকে খুঁজিয়া পায়। আয়না স্বামী লইয়া গৃহে ফিরিল কিন্তু গ্রামের লোক বলিতে লাগিল যে আয়না অসতী। সে একা একা কোথায় ছিল তার ঠিক নাই। সমাজ আয়নাকে অস্বীকার করিলে উজ্জ্বল সাধু আয়নাকে লইয়া বাণিজ্যে যাইবার ছল করিয়া এক নদীর চরে তাহাকে নির্বাসন দেয়। আয়না দেশে বিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে এক বেদের দলের দেখা পায়। তাহারা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে গ্রহণ করে। আয়না বেদেদের জীবিকা গ্রহণ করে। আয়নার অনুরোধে বেদের দল অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনবছর পরে একদিন চাঁদের ভিটার দেশে উজ্জ্বল সাধুর ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইল। আয়না বেদেনীর সাজে স্বামীর ভিটায় গিয়া দেখিল যে, বাড়ি ঠিক পূর্বের মত রহিয়াছে। তাহার আপন হস্তে পোঁতা গাছ কত বড় হইয়াছে। কিন্তু স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছেন ও সতীনের কোলে চাঁদপানা একটি পুত্র। আয়নার শ্বাশুড়ী তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে অভিমানিনী আয়না দৌড়াইয়া আসিয়া নৌকায় উঠিয়াই নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিল। সে তাহার স্বামীর সুখী মুখ দেখিয়াছে। তাহার স্বামীর সুখেই তাহার সুখ। সে তাহার সুখের প্রতিবন্ধক হইতে চায় না। আয়না পশুপাখীকে ডাকিয়া বলিতেছে যে, কেহ যেন তাহার আগমনবার্তা স্বামীকে না জানায় (তুলনীয়—ধোপার পাট)। স্বামীর সুখ কামনা করিয়া আয়না নৌকা হইতে মাঝ নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দিল।

উজ্জ্বল সাধু খবর পাইল আয়না আসিয়াছিল। অনুতপ্ত সাধু আয়নার খোঁজে পাগলের মত গৃহত্যাগ করিল এবং

"যারে দেখে কাইন্দা সাধু জিজ্ঞাসা সে করে রে।
ফকির হইয়া সাধু ভালা দেশে দেশে ফিরে॥"

আয়নার শোকে সাধু জন্মের মত গৃহত্যাগী ফকির হইয়া গেল।

।২০। **কমল সদাগর**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এটি একটি পয়ারছন্দে বিরচিত রূপকথা জাতীয় গাথা। এই পালাটি 'শীত-বসন্তে'র রূপান্তর। এই 'শীত-বসন্ত' নামক রূপকথাটিই কাঙ্গাল হরিনাথ 'বিজয়-বসন্ত' নাম দিয়া পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তেও 'শীত-বসন্তে'র রূপকথা আছে।

পালাগানের মধ্যে 'কমল সদাগর', 'জিরালনি' এবং 'মাঞ্জুর মা' এই তিনটিতেই ব্যভিচারিণী পুরমহিলার বর্ণনা দেখিতে পাই। প্রাচীন গাথা-সাহিত্যে রমণীগণের ব্যভিচারের কথা খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।

এই পালায় কোনরূপ বিশিষ্ট কবিত্বের পরিচয় নাই। বাঙ্গলা দেশের পল্লীর খুঁটিনাটি নানাকথায় পালাটি কৌতুকপ্রদ হইয়াছে। কাহিনীটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সরস্বতী বন্দনায় পালাটি আরম্ভ হইয়াছে।

কাঁইচা নদীর ধারে বাসন্তীনগরে কমল সদাগর বাস করে। সদাগরের ঘরে লক্ষ্মীর বসতি। সদাগর পত্নী সুরঙ্গিনী রূপে-গুণে লক্ষ্মীপ্রতিমা। সুরঙ্গিনীর রূপ-গুণের বর্ণনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। সুরঙ্গিনী বারমাসে তের পার্বণ করে। সে বর্ণনাও কবির লেখনীতে অপূর্ব হইয়াছে। সুরঙ্গিনীর দুই পুত্র চানমণি ও সূর্যমণি। সুরঙ্গিনীর মইফুলা নামে এক দাসী ছিল। চানমণি ও সূর্যমণি তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিত। সদাগরের গোবর্ধন নামে এক মুহুরী ছিল। গুণবতী সুরঙ্গিনী হঠাৎ

"তিনদিনের জ্বরের ভাই কি বলিব আর।
সুরঙ্গিনী মরি যারগৈ উডিল হাহাকার॥"

মরিবার সময় সুরঙ্গিনী মইফুলার হাতে পুত্র দুটিকে সঁপিয়া দিয়া গেল। (এই গাথাগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলিতে কোনও ঘটনাই শুধু ঘটনা হিসাবে ব্যক্ত হয় নাই। প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনেই কিছু উপমা, কিছু নীতি-

বাক্য, নতুবা কিছু প্রাঞ্জল বর্ণনা স্থান পাইয়াছে)। সুরঙ্গিনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেশে নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল। একবছর পরে গোবর্ধনের পীড়াপীড়িতে কমল সদাগর আবার বিবাহ করিল। কবি এই জায়গায় একটি ভারী সুন্দর উপমা দিয়াছেন। চিরপ্রচলিত বহু পুরাতন উপমাটিও কবির হাতে সুপ্রযুক্ত হইলে কত মাধুর্যময় হইতে পারে—

"এইরূপে পাড়াপড়শী বুঝাইতে বুঝাইতে।
বিয়ার কথা সদাগর লাগিল ভাবিতে॥
মানুষের মনরে জাইন্য কচুপাতার জল।
লাড়াচাড়া খাইলে ভাইরে করে টলমল॥"

গোবর্ধনের চেষ্টায় ধর্মপুরগ্রামের ধর্মমণির কন্যা রূপবতী সোনাইর সহিত সদাগরের বিবাহ হইল।

ইহার পর বিমাতার কুচক্রে গোবর্ধনের সহায়তায় চানমণি ও সুর্যমণির চরম দুর্দশা হইল। সোনাই প্রলোভন দেখাইয়া গোবর্ধনকে কুপথে টানিল। একদিন সোনাইয়ের পরামর্শে সদাগর বাণিজ্যে গেল। এই অবসরে দুইভাইকে সোনাই খুব যন্ত্রণা দিতে লাগিল। মইফুলাকে হাত করিতে চাহিয়া সোনাই ব্যর্থ হইল। তখন সোনাই মাণিক নামে এক দুর্বৃত্তের সাহায্য নিয়া দুই পুত্রকে কাটিতে আদেশ দিল। কিন্তু মইফুলা টের পাইয়া মাণিককে বাঁধিয়া রাখিয়া দুই পুত্র নিয়া গৃহত্যাগ করিল। জঙ্গলের মাঝে মইফুলা দেখিল যে, দুই কুমারের খুব জ্বর। হঠাৎ গাছকাটার শব্দ পাইয়া মইফুলা নিকটেই লোক আছে বুঝিয়া কুমার দুজনকে শোয়াইয়া সাহায্যের আশায় চলিল। এক কাঠুরিয়াকে দেখিয়া সে তাহার সাহায্য চাহিল। কাঠুরিয়া স্বীকৃত হইলে দুইজন পূর্বস্থানে ফিরিয়া কুমারদের দেখিতে পাইল না। মইফুলা চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কাঠুরিয়া তখন তাহাকে কাঁধে নিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

এদিকে ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে সোনাইএর প্রাণ উড়িল। মইফুলার অন্বেষণে চারিদিকে চর পাঠাইল। চানমণি ও সূর্যমণি মইফুলাকে না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সূর্যমণি জল খাইতে চাহিলে দুইজনে একটি ঝরণায় নামিয়া জলপান করিল এবং সন্ধ্যা হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

দক্ষিণে পাহাড়ী এক মুল্লুক আছিল।
সেই ত মুল্লুকের রাজার মরণ হইল॥

সেই রাজার পুত্র ছিল না। রাজ্যের লোক তখন রাজার তিন পুরুষের ধলা হাতী নিয়া রাজার সন্ধানে গেল। নিদ্রিত দুই কুমারের কাছে গিয়া হাতী চানমণিকে পিঠে তুলিয়া লইলে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া চানমণি ভাই ভাই করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা হইয়া চানমণির সুখ নাই। তখন উজীর বলিল যে, তাহার ভাইকে আনিতে সৈন্য গিয়াছে।

এদিকে ঘুম ভাঙ্গিয়া চানমণিকে দেখিতে না পাইয়া সূর্যমণি কাঁদিতে লাগিল। নদীর পথে এক বাঁশের বেপারী তাহাকে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বেপারীর বাঁশের চালি যখন এক সদাগরের রাজ্য দিয়া যাইতেছিল তখন সেই দেশের সদাগর সূর্যমণিকে কিনিতে চাহিল। সদাগর স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে "দরিয়ার দেবতা চায় একজন মানুষ"। সুতরাং সে সূর্যমণিকে বলি দিবে বলিয়া কিনিয়া লইল। সদাগর সূর্যকে ডিঙ্গায় তুলিয়া নিল ও নানারূপে তাহাকে সাজাইয়া ও অনেক খাওয়াইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিল। জলের ঢেউয়ের ধাক্কায় সূর্য আসিয়া এক চরে ঠেকিল। এক মাছ বেচনী তাহাকে দেখিয়া নিয়া গেল।

চাঁদমণি ভাই ভাই করিয়া কাঁদে। সৈন্যরা খবর আনিল যে, সূর্যমণিকে বাঘে খাইয়াছে। এই খবর পাইয়া চাঁদ অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

এদিকে কমল সদাগর বারবছর বাণিজ্য করিয়া বেড়ায়। একদিন নদীর ধারে মাছ বেচনীর ঘরে সুন্দর কুমারকে দেখিয়া দুই পুত্রের কথা মনে পড়িল। এমন সময় ঘাটোয়াল আসিয়া সদাগরের ডিঙ্গা আটক করিল। তিনদিন পরে নূতন রাজা ঘাটে আসিয়াই সদাগরকে দেখিল এবং চিনিতে পারিয়া "বাবা, বাবা" বলিয়া সদাগরের পায়ে পড়িল। সদাগর চানমণির কাছে সব শুনিল। মাছ বেচনীকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল সূর্যমণিই এই কুমার। তখন সূর্যমণিও বাবাকে চিনিল। সদাগর সূর্যকে তুলিয়া লইয়া চাঁদকে নিয়া দেশে ফিরিল এবং গোবর্ধন ও সোনাইকে পুঁতিয়া ফেলিল। পিতার রাজ্যে সূর্যমণি রাজা হইল। একদিন এক পাগলিনী সতাইএর বারমাসী গাহিতে গাহিতে সভায় আসিলে সূর্যমণি তাহাকে চিনিতে পারিয়া 'মাসী' বলিয়া জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু মইফুলা অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও থাকিল না। সে চোখের জলে ভাসিয়া বারমাসী গাহিয়া বেড়ায়। তাহার মাথা একদম খারাপ হইয়া গিয়াছে।

।২১। **শ্যামরায়ের পালা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন মাচুয়া গ্রামনিবাসী কৈলাসচন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তির নিকট চন্দ্রকুমার দে এই পালাটির প্রথম সন্ধান পান। কিন্তু মৈমনসিংহের বিখ্যাত তীর্থ গুপ্তবৃন্দাবনের কমলদাস নামক এক গায়কের নিকট হইতে শ্যাম রায়ের সমস্ত পালাটি পাওয়া যায়। কমলদাসের একমাত্র সঙ্গী একটি একতারা।

'মহুয়া' এবং 'ধোপার পাটের' সঙ্গে এই পালার ভাব ও ভাষাগত অনেকটা মিল আছে। পূর্বোক্ত দুই পালার ন্যায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গেও এই পালাগানটির অনেক স্থলে ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই তিন পালাতেই নায়কেরা বড়-ঘরের লোক—নিম্নশ্রেণীর রমণীদের প্রেমে পড়িয়াছেন।

মহুয়া ও ধোপার পাটে চরিত্র ও ঘটনাগুলিতে যেরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় শ্যামরায়ের পালায় ঐ সব গুণ ততটা নাই। তবে এই পালাটির বিশেষত্ব ইহার করুণ বিলাপাত্মক সুরটি। কাহিনীটি এইরূপ—

ডোমকন্যা কাঁখে কলসী নিয়া যখন জল আনিতে যাইতেছিল তখন রংমহল হইতে তাহা শ্যামরায়ের নজরে পড়িল এবং শ্যামরায় তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার প্রেমে পড়িল। ডোমকন্যা অপরের বিবাহিতা স্ত্রী, তাহার উপর নীচজাতীয়া। ডোমকন্যা শ্যামরায়কে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু শ্যামরায়ের মন কিছুতেই ফিরিল না। শ্যামরায় ডোমনীকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইল। মা, বোন বুঝাইল, অবশেষে শ্যামরায়ের পিতার কানে এই কথা উঠিল—তখন রাগে জ্বলিয়া—

"লোক লাট্যালে ডাক্যা রায় কোন কাম করিল।
বাড়ী ঘর ভাইঙ্গা ডোমের সায়রে ভাসাইল॥"

ডোমনী শ্যামরায়কে অনেক বুঝাইল কিন্তু শ্যামরায় তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। ডোমনীর সহিত ডোম হইয়া সে গাবরিয়া মুলুকে গিয়া বসবাস করিতে লাগিল। প্রেমের এমনই মাহাত্ম্য !

এখন সেই দেশের যে রাজা সে বড় ব্যভিচারী। গুপ্তচরের মুখে ডোমনীর রূপের কথা শুনিয়া রাজা প্রলুব্ধ হইয়া ডোমনীকে ধরিয়া আনিল এবং শ্যামরায়কে বাঁধিয়া শূলে চড়াইতে আদেশ দিল।

ডোমকন্যা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। রাজাকে বোকা বুঝাইয়া শ্যামরায়কে খালাস করাইল এবং মিথ্যা মিথ্যা রাজার সহিত বিবাহ করিবে বলিয়া একটি

দিন ঠিক করিল। কিন্তু বিবাহের দিন ডোমকন্যা গাবরিয়া রাজার রাণীকে আপন অলঙ্কার পরিচ্ছদ সমস্ত দিয়া কনে সাজাইয়া, আপনি দাসীর সাজ পরিয়া রাণীর সহায়তায় পলাইল।

এদিকে রায় দেশে ফিরিয়া ছয় শত লাঠিয়াল নিয়া গাবরের দেশে চলিল। কিন্তু গাবরের বিষাক্ত বাণ খাইয়া শ্যামরায় মরণের মুখে ঢলিয়া পড়িল। এই সময় শ্যামরায়ের আক্ষেপপূর্ণ কান্নার বর্ণনা মনকে নাড়া দেয়। ডোমনারী তখন শ্যামরায়কে কোলে লইয়া শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে সেও বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই গাথাটিতে কবিত্ব গুণ খুবই কম। গল্পটিও মামুলী। কেবল বিলাপোক্তি ও দুই চারিটি উপমা অংশ বেশ উপভোগ্য।

। ২২। **নছর মালুম**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

'নছর মালুম' পালাটি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় প্রধানতঃ কাঁঠাল-ডাঙ্গার নূরহোসেন ভাইয়োর নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। এই নূরহোসেন ও তাহার জ্ঞাতিরা বংশানুক্রমে পালাগান গাহিয়া আসিতেছে। ইহারা চাটগাঁয়ের লোক। কিন্তু নূরহোসেনের নিকট হইতে সম্পূর্ণ পালাটি পাওয়া যায় নাই। চট্টগ্রামের সমুদ্রকূলে বহু পর্যটন করিয়া কর্ণফুলির মোহানার নিকট রহমন নামক সাম্পানের একজন মাঝির নিকট হইতে আশুতোষ চৌধুরী সম্পূর্ণ পালাটি প্রাপ্ত হন।

"এই পালা গানটির বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় বাঙ্গলার প্রাচীন ঐতিহাসিক কথা। পর্তুগীজ দস্যু হার্ম্মাদদের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি আমরা এই পালাটিতে পাইতেছি। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ের কিছু পরে এই পালাগানটি বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সম্ভবতঃ ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা।"···দীনেশ সেন।

"আরাকানের রাজারা পর্ত্তুগীজদের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজার অধীন মুকুট রায় নামক জনৈক ক্ষুদ্র মগ-রাজা পর্ত্তুগীজদের সঙ্গে একত্র হইয়া জলদস্যুদের প্রভাব বিস্তার করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই পালা গানটিতে 'দিয়াঙ্গের পাড়ি' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। উহা আধুনিক সময়ের দেয়াঙ্গের বন্দর। পর্ত্তুগীজরা এই বন্দরটিকে ডায়াঙ্গ বলিত।

পালা গানটির উল্লিখিত 'গোবধ্যার চর' নামক স্থান কর্ণফুলির মোহানার নিকট। ইহা বর্ষাকালে সমুদ্রগর্ভস্থ হয় এবং তারপর জাগিয়া উঠে। এজন্য ইহা বাসযোগ্য নহে। তবে এই চর বহুদিন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ এবং মগ জলদস্যুদের আড্ডাস্বরূপ ছিল। 'পরীদিয়া' অথবা 'সাহ পরীদিয়া' চট্টগ্রামের দক্ষিণে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে সমুদ্রের একটি দ্বীপ। ইহা পূর্ব্বে মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পালা-বর্ণিত 'অঙ্গা' নগর ব্রহ্মদেশের কোন নগর বলিয়া মনে হয়।" ·····দীনেশ সেন।

পালা গানটি চাটগাঁ অঞ্চলের বলিয়া ভাষা জায়গায় জায়গায় দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়। আল্লার স্মরণ করিয়া পালাটি আরম্ভ হইয়াছে।

নায়িকা আমিনার মুখে বর্ষার বিরহসঙ্গীতে গাথাটির শুরু। আমিনার স্বামী নছর মালুম দু মাসের জন্য বিদেশে গিয়াছে কিন্তু দু বছর হইতে চলিল তবুও সে ফিরিল না। তাই আমিনা আক্ষেপ করিতেছে—

"দুমাসের লাগি গেলা দুবছর যায়।
বনর বাঘে ন্যা খাই মোরে মনর বাঘে খায়॥
নারীর যৈবন জাইন্য জোয়ারের পানি।
কূলে কূলে ভরে আবার ভাডাৎ টানাটানি॥
দা কিনিয়া ন ধারাইলে জামার ধরি যায়।
খাইল্যা ভুঁইয়ে দুইন্যার যত আগাছা গাছায়॥
পাতিলার ভাত ঠাণ্ডা হইলে খাইতে মজা নাই।
হেলি পৈলে সোনার যৈবন কি করিবা আ-ই।"

ছত্রগুলি সুন্দর অর্থপূর্ণ।

আমিনার বাপমায়ে তাহাকে সাঙ্গা করিতে বলিতেছে। কিন্তু আমিনা স্বামীঅন্ত প্রাণা, সাঙ্গা সে করিবে না।

"হাঙার বৌ ন হইয়মরে ন পুইয়মরে হাঙা।
হদ বাজাইয়া চাইয়ম আমার কোপাল কন্নৎ ভাঙা॥"

হায়দরের একমাত্র মেয়ে আমিনা। ছবছর তাহার স্বামী দেশ ছাড়া॥ ঘরামির কাজ করিয়া অতিকষ্টে হায়দর সংসার চালায়। বড় আদরের একমাত্র কন্যা আমিনাকে সে তাহার ভাগিনার সহিত বিবাহ দিয়াছিল। নছর তাহার

মায়ের গর্ভে থাকাকালীন তাহার পিতার মৃত্যু হয় এবং তাহার পাঁচ বছর বয়সের সময় মায়ের মৃত্যু হয়। তখন হইতে সে মামা হায়দরের কাছে থাকে এবং আমিনার সঙ্গে একত্রে বড় হয়। হায়দর নছরকে বড় ভালবাসিত তাই তাহাকে জামাই করিল। কিন্তু,

"কাউয়ার বাসাৎ কোকিলার ছা ন মানিল পোষ।
ঘরবাড়ী ছাড়িল নছর নছিবের দোষ॥"

এছাক মিঞা হামেশাই হায়দরের বাড়ী আসে। আমিনার প্রতি তার মন প্রেমাসক্ত হইয়া উঠে। সে ঠারে ঠোরে সেই কথা আমিনাকে বলিতে চায়, কিন্তু,

"পানির সঙ্গে তেল মিশে না চিনির সাথে নূন।
এছাকের সঙ্গে তেমনি আমিনা খাতুন॥"

গ্রামের মধ্যে এছাক বেশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এছাক বিবাহিত। তাহার বিবির নাম মোজান।

একদিন এছাক আমিনার পিতার নিকট বিবাহ প্রস্তাব আনিল। আমিনার মাতা আমিনার মত চাহিল কিন্তু মত পাইল না। অবশেষে এছাক বুধা নামক এক গুণীনের সাহায্য লইল। বুধা গুণীনের বর্ণনাটি ভারী চমৎকার। আমিনার পিতামাতাকে হাত করিয়া তাহাদের আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া আমিনা যখন একলা বাড়ীতে আছে তখন এছাক গুণীনের তেলপড়া মুখে মাখিয়া সন্ধ্যাবেলা আমিনার কাছে আসিল। কিন্তু আমিনাকে পাইল না। আমিনা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

এদিকে নছর জাহাজের খালাসী হইয়া ঘর ছাড়িয়াছিল। ভাল কাজ দেখাইয়া সে জাহাজের মালুম হইল এবং অনেক টাকা পয়সা জমাইল। সে দক্ষিণ মল্লুকের অঙ্গী সহরে এক ঘর তৈয়ারী করাইল। এই অঙ্গী সহরের অধিবাসিগণের বর্ণনাটি চমকপ্রদ—

আচানক দেশ সেই শুন কহি যাই।
বেপরদা মাইয়া মাইনসার লাজ সরম নাই॥
মরদেরা রাঁধে ভাত নারী হাটে যায়।
ভালা মাছ ছাড়ি তারা নাপ্ ফির পোঁচা খায়॥

(পচা মাছ প্রভৃতিদ্বারা প্রস্তুত খাদ্য)

ওক (বমি) আসে এই না দেশের থানার কথা শুনি।
আঁজিলা কেঁয়াল্লিশ খায় তেলর মাঝে ভুনি॥
মাইয়া মাইন্‌সর জেয়র জাতি বহুত বহুত দামি।
এক পেঁচে কাপড় পিন্ধে আড়াই হাতর থামি। (লুঙ্গি)
মাথার চুল বাবরি ছাঁটা এঙ্গি থাকে বুকে।
ঝোঁড়ার ভিতর পানর খিলি ইহসারাতে ডাকে॥
রূপের ছটা বুকের গোটা নারাঙ্গির তুল।
মাথার উয়র খুতি ধরে বেল কদম্বের ফুল॥
কানর মাঝে সোনার নাধং রাস্তা দিয়া যায়।
মুচকি মুচকি হাসি তারা পুরুষ ভুলায়॥
নারীর রাজ্যে আইল যখন মালুম নছর।
পিরিতির আগুনে দিল করে ধড় ফড়॥

এই দেশে নছর মাফোর কন্যা এখিনকে বিবাহ করিয়া বাস করিতে লাগিল। আমিনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেশ বিদেশে নছরকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কত গুণ্ডা, বদমাইসের হাতে পড়িল, কিন্তু—

নারীর দৌলত সন্তিপনা রাইখতে যদি চায়।
এমন পুরুষ কেহ নাহি কাড়ি লৈয়া যায়॥

ইলসাখালির কূলে বুড়া ক্ষেতিয়াল গফুরের বাড়ীতে অবশেষে আমিনার আশ্রয় মিলিল। (এইখানে বুড়ার বর্ণনাটি বেশ প্রাঞ্জল)। গাথাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু কাহিনীগুলিই মনোমুগ্ধকর নয়, উপমাপ্রধান বর্ণনা, প্রকৃতি-বর্ণনা ও বিভিন্ন বয়সের নরনারীর বর্ণনায়ও অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির বিকাশ দেখা যায়। আমিনা গফুরকে ধর্মের বাপ বলিয়া তাহাকে সমস্ত কথা বলিল এবং তাহার কাছে রহিল। বুড়া-বুড়ির আদরে আমিনা তাহাদের কাছে আছে তবুও মনের দুঃখে তাহার চোখের জল শুখায় না।

শ্বশুর মাফোর অনুরোধে নছর পরাদিয়া নামক চর হইতে প্রসিদ্ধ লাউখ্যা (সামুদ্রিক মৎস) আনিতে চলিল। ফিরিবার পথে নছর হায়দরের বাড়ী আসিয়া দেখিল শ্বশুর মারা গিয়াছে আর শাশুড়ী ভিক্ষা করিয়া দিন চালায়। আমিনা কোথাও নাই, ঘর বাড়ী খালি হা হাঁ করিতেছে। নছরের একে একে পূর্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

অতঃপর পাড়ায় বাহির হইয়া সে আমিনা সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা শুনিতে পাইল। ফিরিবার পথে ঝড়-ঝঞ্ঝায় বাধা পাইয়া নছরের নৌকা গোবধ্যার চরে আটকাইল। এই চরে হার্মাদ দস্যুরা তাহাদের লুটপাট করিয়া লইয়া গেল। এদিকে বুড়ি মরিয়া গেলে গফুর আমিনাকে লইয়া মহা চিন্তায় পড়িল। গফুর মরিয়া গেলে তাহার কি হইবে এই চিন্তায় অস্থির হইয়া একদিন গফুর আমিনাকে সাদি করিতে বলিল। গফুর অনেক বুঝাইল কিন্তু আমিনা কিছুতেই রাজী হইল না।

এমন সময় যুদ্ধ লাগিয়া দেশে অরাজকতা বাধিয়া গেল। একদিন মগেরা গফুরের বাড়ীতে হানা দিল। মগেরা কিন্তু বুড়াকে অভয় দিয়া ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া বার ঘড়া সোনার মোহর বাহির করিয়া দুই ঘড়া গফুরকে দিয়া চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে বুড়া গফুর সমস্ত ধনদৌলত আমিনার হাতে সঁপিয়া দিয়া মরিয়া গেল। আমিনার দুঃখে দিন কাটে।

এদিকে মাঝির গাঁও হইতে সেই দুষমন এছাক খোঁজখবর করিয়া আমিনার সব খবর পাইল। আমিনার মাকে সমস্ত বলিয়া তাহাকে আমিনার বাড়ীতে লইয়া গেল। দুই মায়ে ঝিয়ে দেখা হইয়া অনেক কান্নাকাটি করিল। বুড়ি আমিনাকে মাঝির গাঁওয়ে ফিরিয়া যাইতে বলিলে আমিনা স্বীকৃত হইল না। একদিন রাত্রে এছাকের লোক চুপি চুপি আসিলে বুড়ি দরজা খুলিয়া দিল ও ঘুমন্ত আমিনাকে এছাকের লোকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। আমিনাকে আনিয়া তাহারা নৌকায় তুলিল এবং তাহাকে মাঝির গাঁওএ এছাকের কাছে পৌছাইয়া দিল।

এদিকে হার্মাদরা সমস্ত লুটপাট করিয়া নছরকে পশ্চিম দেশে বেচিয়া দিল। নছর যাহাদের গোলাম হইল তাহারা তাহাকে একখানা নৌকা দিল। তাহাতে করিয়া নছর হাট বাজার করে, বোঝা বয়। একদিন নছর সেই নৌকা করিয়া পলাইল। মাঝ দরিয়ায় তাহার ছোট্ট নৌকা ডুবিয়া গেল। এই সময় একদল জেলে বড় বড় নৌকা লইয়া যাইতেছিল। তাহারা নছরকে দেখিয়া তুলিয়া লইল এবং তাহাকে এক ধান্যব্যাপারীর জিম্মায় দিল।

এদিকে একবছর চলিয়া গেলে নছর অঙ্গী সহরে ফিরিল না দেখিয়া মাফো কন্যার আবার সাদি দিল। নছর কিছুদিন পরে ফিরিয়া দূর হইতেই সমস্ত শুনিয়া আর ঘরে আসিল না। নছর সেই সহর ছাড়িয়া মনের দুঃখে দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিল।

একদিন রাত্রে নছর ক্রন্দনরতা আমিনাকে স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তাহার আমিনাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল। এদিকে এছাক আমিনাকে লুটিয়া আনিয়া নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়াও বশ করিতে পারিল না। তখন তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। আমিনা কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে এছাকও পুনরায় তাহাকে পাইবার আশায় তাহার পিছু পিছু আসিয়া যখন তাহাকে অপমান করিতে উদ্যত—

এমনি কালে ভাঙা ঘর কাঁপে থরহরি।
নছর লইয়া এক বাঁশের ধুনিহারি।
এছাকের মাথায় দিল মস্ত বড় বাড়ি॥

আমিনা ও নছরের মিলন হইল। দুইজনে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

।২৩। **নুরন্নেছা ও কবরের কথা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

গাথাটি মুসলমান কবি কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কবি একাধারে হিন্দু, মুসলমান উভয়েরই দেবদেবীকে বন্দনা করিয়াছেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এত তীব্র ছিল না। কাহিনীটি নিম্নে দিতেছি :—

"ওরে দোয়াঙের পাহাড়ের বিছে বাহার দারিয়া।
নয়াচর পড়িল এক নাম রঙ্গদিয়া।।"

এই রঙ্গদিয়া চরের বুড়া ক্ষেতিয়ালের কন্যা নুরন্নেহা। তাহার চাঁদের মত রূপ। নায়ক মালেকের বাড়ী দেওগাঁ। তাহার পিতার অবস্থা বেশ ভাল ছিল। কিন্তু,

নছিব মন্দ হৈলরে ভাই হইল মন্দ।
সোনামুখর হাসি খোদা কৈরা দিল বন্ধ।।

নৌকাডুবি হইয়া মালেকের পিতা মারা গেল। তখন—

মাও নাই বাপও নাই, নাইরে সোদর ভাই।
দাদী বিণে মালেকের ঘরে কেহ নাই।।
আশী বছরের বুড়ি দুই আক্ত রাঁধে।
সাইগরে জোয়ার আইলে বুগ কুড়ি কাঁদে।।

মালেকের পিতা সাগরে ডুবিয়া মারা গিয়াছিল সেইজন্য সাগরের শব্দেই বুড়ির পুত্রের কথা মনে পড়িয়া যায়। বৃদ্ধার ক্রন্দনের বর্ণনাটি অপূর্ব—

'কাঁদে বুড়ি বাও ধড়ি শুনিতে অদ্‌ভুত।
হারি কুমারীর মত করে "পুত", "পুত" ॥
"জোয়ারে ন আইলি রে পুত ভাডায় না আইলি।
কন হাঙরে কন কুমীরে মোর পুতরে খাইলি ॥"
নাতিরে লইয়া বুকে কাঁদিলরে দাদী।
ছেমরা নাতির মোর না করালি সাদি রে—
পুত না করালি সাদি ॥
আড়া পহল বুড়িরে সেই পাড়া আউল করে।
পুতর শোকে কাঁদি কাঁদি গেলরে হায় মরে ॥

এইভাবে মালেক একেবারেই অনাথ হইয়া পড়িল। তখন দেওগাঁয় আজগর (নূরন্নেহার পিতা) বাস করিত। নজু মিয়ার (মালেকের পিতা) সহিত তাহার সদ্‌ভাব ছিল না।

মালেক একলা ঘরে থাকে, মাঝে মাঝে নূর আসিয়া তাহার ভাত রাঁধিয়া দেয়। মালেকের দুঃখ দেখিয়া আজগর পূর্বের শত্রুতা ভুলিয়া গেল, মালেকের গুণে সে মালেককে ভালবাসিল। নূর মালেকের ঘরের সব কাজ করিয়া দিত। ক্রমে ক্রমে এইরূপ সাহচর্যে উভয়ে প্রেমাসক্ত হইল। নূরন্নেহার মাতাও তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া খাবার খাওয়াইত। কিন্তু এই সুখও মালেকের কপালে সহিল না :—

তুয়ান হৈল সেই না বছর খোদার গজব।
গড়কিতে ভাসাইয়া নিল ঘর বাড়ী সব ॥
(সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস)

দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া গেল।

কেহ বেচে স্ত্রির পুত্র কেহ বেচে মাইয়া।
পেড ফুলিয়া মরে কেহ পাতা সিদ্ধ খাইয়া ॥
আজগরের দুঃখের কথা কি বলিব আর।
ঘরে নাই রে খুদের কণা উয়াসে দিন যায় ॥

এই অবস্থায়, ...

মালেক কোথায় গেল নাইরে খবর।
তার লাগি বহুত দুঃখ পাইলরে আজগর ॥
তখন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কি কাম করিল।
রংদিয়া চরেতে যাইয়া উপনীত হইল ॥
সেখানে জায়গা, জমি ও গরু পাইয়া—
স্তিরি কৈন্যা লৈয়া আজগর থাকে রংদিয়ায়।
সুখে দুঃখে এক মতন দিন কাটি যায় ॥

কিছুদিন পরে বহু জায়গায় ঘুরিয়া মালেক রংদিয়ার চরে আসিয়া পুনরায় নূরন্নেহাকে পাইল। দুজনেই দুজনকে ভুলিতে পারে নাই।

মালেক আজগরের গৃহে আসিলে নূরের মাতা বহু যত্নে তাহাকে খাওয়াইল। নূর রান্না করিল। সে রান্নার যে বর্ণনা কবি দিয়াছেন তাহা অপূর্ব। প্রিয়জনকে খাওয়াইতে সেকালের মেয়েরা কত পরিপাটী করিয়া কত আয়োজনই না করিত তাহা এখানে দেখান হইয়াছে। উভয়েই আশা করিয়াছিল যে, আজগর তাহাদের বিবাহের কথা তুলিবে—কিন্তু উভয়েই নিরাশ হইল। আজগর সেরকম কোন কথাই তুলিল না। রাত্রিতে নূরের চোখে আর ঘুম আসে না। রাত্রিতে উভয়ে সাক্ষাৎ করিল (অপূর্ব সংযমপূর্ণ বর্ণনা পল্লীকবির —আধুনিক যুগের কবি হইলে এই অবস্থায় অনেক কিছুই বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু পল্লীকবি সমস্তই শ্রোতার অনুমানের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন)।

এই সময় হার্ম্মাদদের অত্যাচারে দেশের লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন ছিল।

মালেক আর নূর যখন এইরূপ প্রেমরসে ভাসিয়া দিন কাটাইতেছে তখন—

রংদিয়া আইল একদিন হার্ম্মাদ্যার ডাকাইত।

তাহারা আজগরের সমস্ত লুট করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, উপরন্তু,—

দুরন্ত হার্ম্মাদ্যার ডাকু কিনা কাম করে।
কৈন্যারে বাঁধিয়া লৈল কাঁধের উপরে ॥
মালেককে লৈল তারা হাতে পায়ে বাঁধি।
দুলা কৈন্যা লৈল সঙ্গে করাইব কি সাদি ॥

নূর ও মালেককে নৌকায় তুলিয়া ডাকাতরা নৌকা ছাড়িল। কিন্তু হঠাৎ নৌকার পালের দড়ি ছিঁড়িয়া নৌকা পাক দিতে দিতে এক ধূ ধূ বালুর চরে ঠেকিল। সেখানে কয়েকজন জেলে মাছ ধরিতেছিল, ডাকাতরা গিয়া তাহাদের নৌকায় উঠিল। জেলেরা মার মার করিয়া যাহা হাতের কাছে পাইল তাহা নিয়াই ডাকাতদের মারিতে লাগিল। অবশেষে এক বুড়া জেলে বুদ্ধি করিয়া মরিচের গুঁড়া ডাকাতদের চোখে ছুঁড়িল। তখন ডাকাতরা সব বালুর ওপর পড়িয়া গেল এবং জেলেরা তাহাদের পালের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। মালেকের অবস্থা দেখিয়া তাহারা তাহাকে মুক্ত করিল। নূর মূর্চ্ছা গিয়াছিল অনেক কষ্টে তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। মালেকের মনের বোঝা হালকা হইল। পরদিন জেলেরা নৌকায় করিয়া নূর ও মালেককে নিয়া তিন দিন বাদে তাহাদের রংদিয়ায় পৌছাইয়া দিল। তখন—

কাঁদি বুড়া মালেকরে ধরিল বেড়াই।
দোন চোগর পানি পড়ে গড়াই গড়াই॥
নূররে লইয়া বুকে মা জননী তার।
সোনামুখে মুখ দিয়া চুম্পে বার বার।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই আজগর মালেক ও নূরের মন বুঝিতে পারিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা আজগর মালেককে নিয়া সাগরের ধারে গেল এবং সেখানে তাহার নিকট এক কঠিন সত্যের কথা প্রকাশ করিল। আজগর বলিল যে, মালেক কোনমতেই নূরকে বিবাহ করিতে পারে না। কেন না,

"নাইরে জান আগের কথা রৈয়াছে গোপন।
তোমার বাপ নছু মোরে ভাইবত রে দুষমন॥
তোমার বাপের সাদি হৈল কত রে ধূমধাম।
বজ্জাতি করিয়া কনে রটাইল বদনাম॥
লাহানতি হইল কত তুমি হইলা ঘরে।
তোমার মারে তোমার বাপ তেলাক দিলা পরে॥
বহুত কাঁদিল আওরাত কপাল তার ভাঙা।
আমার ঘরে আইল যখন আমি কৈল্লাম হাঙা॥"

আজগরের সেই স্ত্রীএর গর্ভেই নূরের জন্ম। সুতরাং মালেক ও নূর এক মায়েরই গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহাদের বিবাহ হইতে পারে না। আজগরের

এই কথা শুনিয়া মালেকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে আর ঘরে ফিরিল না। তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে নূর অসুখে পড়িল এবং মালেকের শোকে প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে মালেক সেই রাত্রে রংদিয়া ছাড়িয়া মাল্লাগিরী কাজ লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। নানারূপ ব্যবসা করিয়া পাঁচ বৎসর পরে মালেক মস্ত ধনী হইয়া রংদিয়ায় ফিরিল। কিন্তু নূর আগেই মারা গিয়াছে। পাড়ার লোকের কাছে মালেক সমস্তই শুনিল। তখন খুঁজিতে খুঁজিতে সাগরের পারে তিনটা কবর দেখিয়া মালেক একটি কবরের উপর শুইয়া পড়িল। সারাদিন মালেক কবরে পড়িয়া রহিল। রাত্রিতে এক আলৌকিক কাণ্ড ঘটিল। মাটি কাঁপিতে লাগিল। কবরের মধ্য হইতে নূরন্নেহা মালেককে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

"শুনরে পরাণের ভাই ন করিও দুঃখ।
হিতানেতে একবার আনো তোমার মুখ॥
গায়ে নাইরে গোস্ত আমার লৌ আর শিরা।
ভুলি নাইরে তোমার কথা খুলি নাইরে গিরা॥
খুলিত নাই গিরারে ভাই রইয়ে মনর বান।
মস্ততেও হামিষ্‌খন কাঁদে পরাণ নান॥

কবরের কথা শুনিয়া মালেক আর কবর ছাড়িল না। সঙ্গের লোকজন কত ডাকাডাকি করিল কিন্তু কিছুতে তাহাকে তুলিতে না পারিয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। মালেক কবরের কাছেই তাহার জীবন কাটাইতে লাগিল—

চাইয়া দেখে পাগ্‌লা মালেক চাইয়া দেখে দূরে।
আর কক্ষনো কয়বরের চাইর দিকেতে ঘুরে॥
কি এক ভাবনা ভাবে মুখে নাইরে বাত।
ছিড়া কাপড় ছিড়া কোর্ত্তা টুবি নাই মাথাত॥

। ২৪। **মুকুট রায়**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

মুকুট রায়ের পালাটিও মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত। ইহাকে ঠিক পালাগান বলা যায় না। ইহা গীতিকথার লক্ষণাক্রান্ত। ইহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কোনও চিহ্ন নাই, কিন্তু ইসলাম ধর্মের মহিমা

ঘোষণা করার চেষ্টা আছে। এই পালায় 'শকুন্তলা' ও 'মিরান্দা'র ছায়া পাই। এই পালাগান হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে ছবি আঁকার প্রথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল।

দক্ষিণ মুল্লুকে শিলুই নামে এক প্রতিপত্তিশালী রাজা ছিলেন। রাজার এক অতি রূপবান পুত্র ছিল, তাহার নাম মুকুট রায়। রাজপুত্র যখন কুড়ি বৎসরের হইলেন তখন রাজা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকেই পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য সুন্দরী কন্যার খোঁজে লোক পাঠাইলেন। চারিদিক হইতেই অপূর্ব রূপসী কন্যার ছবি লইয়া লোক ফিরিল, কিন্তু কাহাকেও মুকুট রায়ের পছন্দ হইল না। (চারি কন্যার রূপ বর্ণনা অপূর্ব, চারিটি পৃথক বর্ণনা, চারিটি বর্ণনা পড়িলে চার রকমের রূপ চোখের উপর ভাসিয়া উঠে, কিন্তু কোথাও অশ্লীলতার ছোঁয়া পাওয়া যায় না)। রাজা হাল ছাড়িয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কুমারকে আপন ইচ্ছানুযায়ী বধূ খুঁজিয়া আনিতে বলিলেন।

তখন মুকুট রায় লোক-লস্কর লইয়া কন্যার সন্ধানে চলিলেন। রাজকুমারের পথের বর্ণনাটি ভারী সুন্দর। এক গভীর জঙ্গলে আসিয়া রাজপুত্র সব লোক-লস্করকে বিদায় দিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন—

রক্ত বরমজা গোটা ভাইরে ঘোড়ার বরণ।
কাম সিন্দুর দেখি তাহার বদন॥
চলিবারে পক্ষীরাজ দুই কন্ন খাড়া।
জিহ্বা গোটা দেখি ঘোড়ার জলন্ত আঙ্গেরা।
চারিখানি পাও তার শোভে সুবন ক্ষুরা॥
সেহি ত ঘোড়ার পিষ্ঠে কুমার যখনি বসিল।
জঙ্গলা ভাঙ্গিয়া ঘোড়া শূন্যে উড়া দিল॥

সেই জঙ্গলে রাজপুত্র এক কাঠুরিয়া ভবনে আশ্রয় নিলেন। সাতদিন বাদে কুমার শিকার করিতে গহন বনে প্রবেশ করিলেন এবং একজোড়া হীরামন তোতাকে দেখিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত ধরিবার ইচ্ছায় তাহাদের পিছনে ছুটিলেন। কিছুদূর এইরূপ ছুটিয়া গিয়া কুমার সামনে এক সুন্দরী কন্যা দেখিতে পাইলেন। তাহার,

পিন্ধনে গাছের পাতা গাছের বাকলা।
কন্যার পায়ের রঙ্গে বেউর উজলা॥ ('শকুন্তলা'র ছায়া)

অপরূপ সুন্দরী কন্যা হাতে তীর ধনুক লইয়া ঐ পাখীকেই শিকার করিতে যাইবে এমন সময় পিছন হইতে কুমারের তীরে পাখী মরিয়া মাটিতে পড়িল। চমকিয়া কন্যা পিছন চাহিতেই উভয়ের চারিচক্ষের মিলন হইল এবং উভয়েই পরস্পরকে ভালবাসিল। কন্যা কুমারকে অনেক বুঝাইয়া বলিল যে, সে নীচু জাতি ব্যাধের কন্যা, বনে বনে থাকে, ব্যাধেরা কুমারকে দেখিলেই মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু কুমারের এক পণ। তখন কুমারকে লইয়া কন্যার ভাবনার অন্ত রহিল না। আকুল হইয়া কন্যা ভাবিতে লাগিল কি করিয়া কুমারকে ব্যাধদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। কন্যার আকুলতা কবির ভাষায় জীবন্ত রূপ নিয়াছে। অবশেষে কবি বলিতেছেন—

কান্দিয়া কাটিয়া কন্যা ফালায় ধনুক ছিলা।
কেমুনে পিরীতের জ্বালা বুঝিল বনেলা॥

এক নজরে দেখিয়াই কি করিয়া কন্যা কুমারকে এত ভালবাসিল! সে চিরকাল বনেই লালিতা-পালিতা তাহার হৃদয়ে এমন নিষ্পাপ প্রেম কোথায় লুকান ছিল! কন্যা কিছুদিন অতি সাবধানে কুমারকে ব্যাধের নজর হইতে লুকাইয়া রাখিল, তারপর একদিন সময় ও সুযোগ বুঝিয়া উভয়ে পলাইল। কন্যাকে লইয়া কুমার দেশে ফিরিল। দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গেল—রাজপুত্র বধূ লইয়া ফিরিয়াছেন। কন্যা ও কুমারের খুব আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা জলটুঙ্গি ঘরে দুইজনে বিশ্রম্ভালাপে রত এমন সময় ব্যাধেরা বিষের তীর ছুঁড়িয়া কুমারকে মারিল। তাহারা কন্যা পলাইবার পর হইতেই তাকে তাকে ছিল, সুযোগ বুঝিয়া প্রতিশোধ লইল। কুমারের বুক হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল, কুমার পড়িয়া গেল। কুমারকে কোলে নিয়া কন্যা কাঁদিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইলে সকল কথা জানাজানি হইল। দেশের লোক বলিল, এই কন্যা রাক্ষসী, মাংস খাইবার জন্য স্বামীকে বধ করিয়াছে। রাজা তখন পাত্রমিত্রের সহিত যুক্তি করিয়া একটি সিন্দুক করাইয়া তাহাতে মরা পুত্রের সহিত জীবন্ত কন্যাকে ভরিয়া কুলুপ দিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু—

জলের উপরে সিন্ধুক ভাসিয়া চলিল।

দুই ভাই জেলে জাল তুলিয়া দৈবযোগে এই সিন্দুক পাইল। কুলুপ ভাঙ্গিয়া তাহারা দেখে যে মড়ার সহিত জীবন্ত এক কন্যা (বেহুলার ছায়া)।

তাহারা ভয় পাইয়া পলাইল। তখন কন্যা মরা স্বামী লইয়া বাহির হইল। আক্ষেপ করিয়া কন্যা কাঁদিতেছে, এমন সময় তাহার কান্নায় আল্লার টনক নড়িল। তিনি পয়গম্বরদের ডাকিয়া বলিলেন, 'শীঘ্র করিয়া জঙ্গলে গিয়া কন্যার পতিকে বাঁচাইয়া দাও।' এদিকে ক্রমে ক্রমে মড়ার গায়ে পোকা ফলিল। কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে মড়ার গায়ের পোকা বাছিতেছে এমন সময় বত্রিশ পয়গম্বর আসিয়া বলিল, 'তুমি শীঘ্র নেয়াজার সহরে চলিয়া যাও, আমি তোমার পতির প্রাণ দান করিব। তুমি এখানে থাকিলে মড়া জীবিত হইবে না।'

('পুষ্পমালা তুলনীয়')

এই কথা শুনিয়া কন্যা প্রত্যয় না হওয়াতে পয়গম্বর আশ্বাস দিয়া পুর নবী বলিয়া তিন ডাক দিতেই—

নেয়াজার সরে কন্যায় উড়াইয়া নিল।

এদিকে জীবন্ত পুত্র পাইয়া শিলুই রাজার অপার আনন্দ। কিন্তু কুমার কন্যাকে কোথাও না পাইয়া পাগলের মত হইয়া গেলে রাজা ঢোলক দিলেন,

"যেই জনে পুত্রে মোর ভালা কইরা দিবে।
সুমান করিয়া ভাগ অর্দ্ধরাজ্যে নিবে॥"

এদিকে নেওয়াজের রাজা কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে অধীর (বলা বাহুল্য সেই বনেলা কন্যা নেওয়াজের রাজকন্যা)। রাজা কন্যার বিবাহ দিবেন মনস্থ করিলেন। এদিকে মুরশীদ শিলুই রাজার ঢোল ছুঁইয়া রাজপুত্রকে ভাল করিয়া দিবে বলিল। তাহাকে রাজার কাছে নিয়া গেলে সে বলিল যে, নেওয়াজের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেই রাজপুত্র ভাল হইবেন। এদিকে কন্যার অবস্থাও পতিশোকে তথৈবচ। কন্যার পিতাও কন্যা-আরোগ্য মানসে ঢোল দিলে সেখানেও মুরশীদ আসিয়া ঢোল ধরিল ও তাহার কথামত রাজকন্যা ও রাজপুত্রের মিলন হইল।

ইহার পর কবির ভণিতা। পালাটি অসমাপ্ত। পালার গল্পটি সমাপ্তই মনে হয়, কিন্তু শেষের দুইটি পংক্তি অসমাপ্তের জের টানিয়াছে—

দক্ষিণ মুল্লুকের কথা এইখানে থুইয়া।
পূবেত কাফেরের দেশ শুন মন দিয়া॥

সুতরাং মনে হয় কবির আরও বলিবার ছিল, এবং পালাটি আরও বড় ছিল।

। ২৫। **আন্ধা বন্ধু—প্রকৃত রচয়িতা অজ্ঞাত।**

মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত। এই গাথাটিতে চণ্ডীদাস ও রামীর নামোল্লেখ আছে। সুতরাং এই গাথাটি চণ্ডীদাসের পর রচিত। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা ও আধাবন্ধুর ভাষা প্রায় একরকম—ভাবেও অনেকটা ঐক্য আছে। সুতরাং এই গাথাটির অজ্ঞাত রচয়িতা যে চণ্ডীদাসের প্রভাবমুক্ত ছিলেন না একথা অনস্বীকার্য। কাহিনীটি নিম্নে দিতেছি—

"শুন শুন রাজার কন্যা কহি যে তোমারে।
কাঞ্চন পুরুষ এক তোমার দুয়ারে॥
কান্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি সোনার বরণ।
আখি দুইটি অন্ধ তার বিধাতা দুষ্মন॥
দেখবে যদি সুন্দর কন্যা চল শীঘ্র করি।
কিবা ভিক্ষা দিবে তারে সঙ্গে লহ করি॥
কন্যা সঙ্গে ত লও করি॥"

সুন্দর পুরুষ, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই। রাজার দুয়ারে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। তাহার বাঁশীর মোহন সুরে রাজকুমারী মুগ্ধ হইলেন—

"না জানি অন্ধের বাঁশী কিবান যাদু জানে।
ঘরে বান্ধ্যা বেড়ার মন বাইরে টাইন্যা আনে॥"

এই পালাটিতে ছত্রে ছত্রে গানের ধুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকুমারী শুধু অন্ধের বাঁশীতেই মুগ্ধ হন নাই, তাহাকে ভালও বাসিয়া ফেলিয়াছেন—তাই তাহার দুঃখে রাজকুমারী অস্থির—

রাজার পুত্র যেমন লো ধাই মন কয় যে আমারে।
বড় দুঃখে আন্ধা হইয়া দুয়ার দুয়ার ঘোরে
লো ধাই······॥

দেহে যত সয়লো দূতী অন্তরে না সয়।
কিবান ধন দিলে বল অন্ধ খালাস হয়
লো ধাই·········॥

অবশেষে রাজকন্যার,

চাম্পাবরণ আন্ধার হইল ভূমে পড়ে মালা।
ঝরঝরি নয়ানের জল কান্দে রাজার বালা॥
শুন শুন ওলো ধাই কহি যে তোমারে।
আমার দুইটি নয়ান তুল্যা দিয়া আইও তারে॥
লো ধাই দিয়া.........॥

ভোর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া রাজাও অন্ধের বাঁশী শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং খবর আনিতে লোক পাঠাইলেন।

খবইরা আসিয়া কয় রাজা শুন দিয়া মন।
সোনার মানুষ বাজায় বাঁশী পাগল করে মন॥

রাজা তখন তাহাকে আনিতে হুকুম দিলেন। তাহার রূপ দেখিয়া রাজা অবাক হইলেন। রাজা তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্ধ বলিল, তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কেহই নাই, সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার মত দীন দুঃখী আর কেহ নাই। রাজা তখন দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে আপন রাজ্যে থাকিতে অনুমতি দিয়া বলিলেন,

মন্দিরে থাকিবে তুমি উত্তম বিছানে।
ঘুমতনে জাগিব আমি তোমার বাঁশীর সনে॥
এক কন্যা আছে মোর পরাণের পরাণ।
তাহারে শিখাইবা তুমি তোমার ঐনা বাঁশীর গান॥
এই দুই কার্য তোমার আর কিছু না জান।
সকল সুখ পাইবা কেবল নাই সে দুই নয়ান।
তুমি থাক আমার ঘরে।

রাজকন্যাকে আন্ধা বন্ধু বাঁশী শিক্ষা দিতে লাগিল। অন্ধের মুখের ভাষা কবির গানের মধ্য দিয়া অপূর্ব রূপ নিয়াছে। অন্ধ বন্ধু দুঃখ করিতেছে—তাহার নিকট সকলই আঁধার, সে জন্মান্ধ, চাঁদ, সূর্য আলো কিছুরই রূপ সে জানে না। কিন্তু তবুও তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে রাজকন্যার প্রতি যে ভালবাসা জন্মিয়াছে তাহা সে গোপন করিতে পারে নাই—তাই সে বলিতেছে,

সবার উপুর আছ তুমি অন্তরে সে পাই।
ধিয়ানেতে আছ কন্যা অন্তরেতে পাই॥

ক্রমে ক্রমে রাজকন্যা ও আঁধা বন্ধুর মধ্যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হইল।

এই পালাটিতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রাজকন্যা আঁধা বন্ধুকে বলিতেছে—

আজি হতে তোমায় বন্ধু ছাইড়া নাই সে দিব।
নয়ানের কাজল কইরা নয়ানেতে থুইব ॥
সে কাজল দেখিয়া যুদি লোকে করে দোষী।
হিয়ায় লুকাইয়া বন্ধু শুনবাম তোমার বাঁশী।
হিয়ায় লুকান বন্ধু যুদি লোকে জানে।
পরাণ কটরায় ভইরা রাখিব যতনে ॥
বসন কইরা অঙ্গে পরব মালা কইরা গলে।
সিন্দুরে মিশাইয়া তোমায় মাখিব কপালে ॥
চন্দনে মিশাইয়া তোমায় করব দেহ শীতল।
সুখে দুঃখে করব তোমায় দুই নয়ানের কাজল ॥
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব।
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব ॥
আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।
এমন হইলে ঘুচবো তোমার দুই আখির আঁধার ॥
তোমার বুক লইয়া আমি শুনব তোমার বাঁশী।
মরণে জনমে বন্ধু হইলাম তোমার দাসী ॥

কিন্তু রাজকন্যার এই দশা দেখিয়া অন্ধ তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল এবং দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিল। সে যে রাজকন্যাকে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছে, সে কি করিয়া তাহাকে এই দুঃখের সাগরে ভাসাইবে। সে অন্ধ, রাজকন্যা তাহাকে লইয়া কি করিয়া সুখী হইবে? কিন্তু রাজকন্যা অটলা, অচলা—

বন্ধুরে আরে বন্ধু যেদিন শুন্যাছি তোমার বাঁশী।
কুল গেল মান গেল বন্ধু হইলাম তোমার দাসীরে ॥

এইখানেও রাজকন্যা যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর কথাই মনে পড়ে। (এই পালাটিতে চণ্ডীদাসের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে হয়তো দীনেশ সেন মত প্রকাশ করিতেন যে, চণ্ডীদাসই এই পালা গানের কাছে ঋণী)। কিন্তু স্পষ্ট চণ্ডীদাসের উল্লেখ থাকাতেই বোঝা যাইতেছে যে এই পালা গায়ক চণ্ডীদাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। রাজকন্যার মঙ্গল চিন্তা করিয়া অন্ধ আপন

দেশে চলিয়া গেল। তখন রাজকন্যা বারমাসী গাহিয়া তাঁহার বিরহ কাটাইতেছেন। রাজা তাঁহার বিবাহ দিয়া দিলেন। যে দেশে রাজকন্যার বিবাহ হইল ঘুরিতে ঘুরিতে অন্ধ, একদিন সেখানে আসিল। সেই দেশের রাজার বর্ণনা দিতে গিয়া কবি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার কবিত্ব অপূর্ব,

আরেক রাজার মুল্লুক কথা শুন দিয়া মন।
রাজ্যবাসী যত্তেক লোক ঘুমে অচেতন॥
পাতে ঘুমায় ফুলের কলি পুষ্পেত ভমরা।
রাজার বুকে শুয়ে রাণী এক গাছি ফুলের ছড়া॥

(কিন্তু মনে হয় এই অংশ সম্পূর্ণ অকৃত্রিম নয়, ইহাকে সংস্কার করা হইয়াছে)। এহেন সময়ে অন্ধের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। রাণী চমকিয়া উঠিলেন। (বলা বাহুল্য এই রাণীই সেই রাজকন্যা)। এইখানেব বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব ছত্রে ছত্রে। বাণী সেই বাঁশী শুনিয়া উতলা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাজার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া নিলেন—

নয়ন মুছিয়া কন্যা কহে 'যদি নহে আন।
ধর্ম্ম সাক্ষী ওগো রাজা তুমি আমায় কর দান
—গো আমায কর দান॥'

রাজা রাণীর অবস্থা দেখিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজকন্যা আন্ধা বন্ধুর কাছে গেলেন। আঁন্ধা বন্ধু তাগাকে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইল, কিন্তু যখন রাজকন্যা বলিলেন যে, তাহার জন্য তিনি ঘর, সংসার, কুলমান সব বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন, তখন,

চমকিয়া মুখের বাঁশী হাতেত লইল।
অল্প বুদ্ধি কন্যা হায় কি কাম করিল॥

সে রাজকন্যাকে ঘরে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইল। রাজকন্যার প্রেম খাঁটি, শত দুঃখের আভাস পাইয়াও তাঁহার প্রেম বাধা মানিল না। রাজকন্যা বলিতে লাগিলেন—বাঁশীই তাহার সব, বাঁশীর আওয়াজেই তিনি সকল জ্বালা ভুলিতে পারিবেন। তখন আন্ধা বন্ধু বাঁশী নদীর জলে ফেলিয়া দিলে রাজকন্যা বলিলেন যে, বাঁশী না থাকিলেও তিনি তাহাকে ছাড়িতে পারেন না। যদি বন্ধু তাঁহাকে গ্রহণ না করে তবে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন অন্ধ রাজকন্যাকে

আবার গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া আপনি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অন্ধ রাজকন্যাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইতে চাহে না।

রাজকন্যা রাজ্যের রাণী, সে পথের ভিখারী, সে কিছুতেই রাজকন্যাকে এই দুঃখের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারে না। অন্ধও রাজকন্যাকে গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সে রাজকুমারীর ভালবাসার গভীরত্ব বুঝিতে পারে নাই। রাজকন্যাও অন্ধের সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন—

আসমান হইতে জলে তারা যেন খসে।
জোয়ারিয়া গাঙ্গের ঢেউয়ে সাপল ফুল ভাসে॥
ভাসিতে ভাসিতে দুযে গেল সমুদ্দার।
কাল গরল বাঁশী না বাজিব আর॥
বাঁশী না বাজিব আর।

। ২৬। **সন্নমালা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। এই পালাটিতে ছন্দেব বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে অসম পয়ার কিংবা ত্রিপদী এই দুই প্রচলিত ছন্দের দেখা মিলিলেও কোনটিই অবলম্বিত হয় নাই। ধাঁধাকাবিকা, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতিতে স্বল্পাক্ষর ছন্দ দৃষ্ট হয় এই গাথাটিব মধ্যেও সেইরূপ ৭।৮।৯।১০ অক্ষরের ছত্র আছে। গাথাটি অসম্পূর্ণ, সুতরাং ইহাতে চরিত্রগুলি ফুটিয়া ওঠে নাই। কিন্তু নায়িকার যে একনিষ্ঠ প্রেমেব আভাস এই অসমাপ্ত কাব্যে পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে, পালার শেষভাগে তিনি খুব গৌরবমণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পালাটিতে স্বভাব-সৌন্দর্যের বর্ণনা চিত্তহারী। এই পালাটিকে গাথা না বলিয়া গীতিকথা আখ্যা দেওয়া উচিত। কথা ও সুরেব মাধ্যমে পালাটি বর্ণিত।

রাজকন্যা—মায়ের বুক জোরা।
চান সুরুজ তার,—
বাপের আঁখি তারা॥
ঘরখানি আলা দুয়ারখানি ঝালা।
মায় বাপে রাখে, নাম সন্নমালা॥

এক রাজার ধন-দৌলত, লোকজনের অভাব নাই, কিন্তু রাজার পুত্র নাই। অনেক মানত করিয়া অবশেষে রাজার এক কন্যা হইল। এই কন্যাই সন্নমালা।

রাজকন্যা দেখিতে দেখিতে বিয়ের যোগ্য হইলেন। রাজা তখন গণক ডাকিয়া তাহার আয়ু ও বরের কথা জিজ্ঞাসা করাতে গণক বড় ভয়ানক কথা বলিল। গণক বলিল যে, এই কন্যার অলক্ষীর অংশে জন্ম, ইহা হইতে রাজ্যের অমঙ্গল হইবে, সুতরাং,

সিতাবী কন্যারে রাজা
পাঠাও বনবাসে।

রাজপুরীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। এইরূপে সাতদিন কান্নাকাটি করিয়া অবশেষে কন্যার কথায় রাজা তাহাকে লইয়া বনের মধ্যে এক কুটীরে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলেন।

সন্নমালার বনবাসে দিন কাটে। একমাস পরে হঠাৎ এক সাধুর ডিঙ্গা সেই বনের ঘাটে আটকাইয়া গেল, কিছুতেই ডিঙ্গা নড়ে না। সওদাগরের হুকুমে লোকজন খোঁজখবর করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে কন্যার রূপের কথা বর্ণনা করিতেই সওদাগর কন্যার নিকট গেল ও তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল, "যাহা থাকে কপালে এই কন্যারে লইয়া যাইবাম দেশে।" সাতমাস ঘুরিয়া বাণিজ্যে দ্বিগুণ লাভ করিয়া সদাগর কন্যাকে লইয়া দেশে ফিরিল। সওদাগরের এক পুত্র ছিল। সওদাগরপুত্র ও রাজকন্যা একসঙ্গে লেখাপড়া করে—

এই মতে যায় দিন
পরথম যৌবন, চাঁদ সুরুজে মিলন

সদাগর পুত্র ও রাজকন্যা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসিল। একদিন লেখা-পড়া করিতে করিতে রাজকন্যার কলম মাটিতে পড়িলে, সওদাগর পুত্রকে তুলিয়া দিতে বলিলে সে বলিল,

সত্য কর সুন্দর রে কন্যা সত্য কর বৈয়া
যদি দেই তুলিয়া কলম মোরে করব কিনা বিয়ারে।

রাজকন্যা মহা চিন্তায় পড়িল। আপন অলক্ষণের কথা বলিয়া সে সওদাগরের পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সওদাগরপুত্রের এক পণ। রাজকন্যা তখন নিরুপায় হইয়া মত দিল। এদিকে রাজ্যময় রটিয়া গিয়াছে যে, সওদাগর বন হইতে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা আনিয়াছে। সেই দেশের রাজকন্যা রূপবতী এই কন্যার সহিত সহেলা পাতাইবার ইচ্ছা জানাইয়া সওদাগরের কাছে

দাসী পাঠাইল। রাজকন্যা সন্নমালা ও রূপবতী দুই সই রাজবাড়ীর বাগানে গলাগলি করিয়া বেড়ায়। একদিন রাজকুমার সন্নমালাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং ভগ্নীকে মনের কথা জানাইল। রাজকন্যা এইকথা সন্নমালাকে জানাইলে সে রাজকন্যাকে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা জানাইল। ভগ্নীর মুখে এই কথা শুনিয়া রাজকুমার খাওয়া দাওয়া ছাড়িল। রাজারাণী অস্থির। তাঁহারা জানিলেন যে, কুমার সাপের মাথার মণি চায়। তখন সওদাগরকে হুকুম দিলেন যে, ছয়মাসের মধ্যে সাপের মণি আনিয়া না দিলে সপরিবারে তাহার গর্দান যাইবে। সওদাগর চিন্তায় পড়িলেন এবং পুত্রের কাছে পরামর্শ চাহিলে পুত্র পিতাকে আশ্বাস দিয়া আপনি বাণিজ্যে চলিল। যাইবার সময় কন্যাকে বলিয়া গেল,

শুন শুন সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে।
ছয় মাস থাক তুমি আমার বাপের পুরে॥

ছয়মাস পরে সওদাগরপুত্র দেশে ফিরিল। মণি সে আনিতে পারে নাই। রাজার হুকুমে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া সাপের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। সাপের বিষে সওদাগরপুত্রের অঙ্গ ছাইয়া গেল—

নগরের লোক কাঁদিয়া কাটিয়া
"ভেরায় তুলিয়া পুত্র ভাসাইল জলে।
কান্দিয়া বেকুলা কন্যা ভাসে আখ্‌খি জলে॥"

রাজকন্যা সন্নমালা সওদাগরের নিকট বিদায় নিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত পতির সঙ্গ লইল—

ভাসিয়া চলিল ভেরা মরায়ে লৈয়া।
পাছে পাছে চলে কন্যা পাগল হৈয়া॥
নদীর না পাড়ে পাড়ে কন্যা কান্দিয়া বেড়ায়।
আইঞ্চল ধরিয়া কন্যা দুই চোখ মুছে।
চলিল সুন্দর কন্যা মরা স্বামীর পাছে॥

ইহার পরের অংশ পাওয়া যায় নাই। তবে অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে, শেষাংশটি বেহুলা পালার ন্যায়ই ছিল।

।২৭। **বীরনারায়ণের পালা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই পালাটি নগেন্দ্রচন্দ্র দে ১৯২৯ সনে সংগ্রহ করেন। এই পালাটিও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই।

এই পালাটির বৈশিষ্ট্য—নায়ক বীর নারায়ণের তেজঃপূর্ণ চরিত্র ও একনিষ্ঠ প্রেম। পালাগুলিতে উৎকৃষ্ট নায়িকার অভাব নাই, কিন্তু নায়িকার উপযুক্ত নায়কের সংখ্যা কম। এই অল্প সংখ্যক নায়কের মধ্যে বীরনারায়ণ একজন। পালাটি খণ্ডিত হইলেও যাহারা নগেন্দ্রবাবুকে এই পালাটি দিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল যে, শেষের দিকে বীরনারায়ণ বীরত্ব সহকারে পিতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সোনাকে পাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল। কাহিনীটি এইরূপ—

বীরনারায়ণ জমিদারপুত্র সকালে শয্যা ত্যাগ করিতে গিয়া নানারূপ বাধার ইঙ্গিত পাইয়া ঘরের বাহির হইতে সাহস পাইল না। অবশেষে বিকালের দিকে আর ঘরের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল এবং নদীর ঘাটে গিয়া এক রঙ্গ বিরঙ্গের ডিঙ্গা দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া পড়িল। সন্ধ্যাবেলা মা, বাপের আহ্লাদী কন্যা সোনা জল লইতে ঘাটে আসিয়া বীরনারায়ণকে দেখে এবং তাহার রূপে মুগ্ধা হয়। সোনা তাহাকে মন সমর্পণ করিয়া 'গাঙ্গের কিনার গিয়া নামে গাঙ্গের জলে।'

সাহাদের ডিঙ্গাখানি সন্ধ্যা দেখিয়া ঘাটে ভিড়ায় এবং

ঘাটেতে সুন্দরী কন্যারে আরে সাধু
দেখে আড় নয়ানে।
কন্যার লাগিয়া সাধু
আরে সাধু উচাটন মনে॥

প্রলুব্ধ সাধু লোকজন সমেত আসিয়া কন্যাকে ধরিয়া ডিঙ্গায় উঠিলে কন্যা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই চীৎকারে বীরনারায়ণের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং

কন্যার কান্দনে কুমার বড় দুঃখু পাইল।
চুপ চাপ গিয়া তবে ডিঙ্গাত উঠিল॥

সাধু ডিঙ্গা ছাড়িয়া দিল এবং কন্যার কাছে কুপ্রস্তাব করিতে লাগিল। কিন্তু সোনা কেবল কাঁদিতেই লাগিল।

সাধুর যত কাণ্ড দেখ্যা কুমার পায় দৈছত (ব্যথা)।
কি উপায় করবাইন কুমার হইলা ভাবিত॥

অনেক চিন্তার পর কুমার চুপচাপ ডিঙ্গার সমস্ত অস্ত্রপাতি জলে ফেলিয়া দিল এবং ডিঙ্গার পিছনে গিয়া চুপিচুপি কাণ্ডারীকে মারিয়া ফেলিয়া আপনি কাণ্ডারী

সাজিয়া বসিল। কুমার কাণ্ডারী হইয়া ডিঙ্গা চরে ঠেকাইল। বালিতে ডিঙ্গা এমন আটকাইল যে, মাঝিমাল্লা চেষ্টা করিয়াও ডিঙ্গা নড়াইতে পারিল না। ইহা দেখিয়া সাধু চরে নামিয়া আসিতেই সেই অবসরে কুমার কন্যার কাছে গিয়া তাহাকে শান্ত করিল। অতঃপর কুমার একটি ছোট ডোঙ্গা ভাসাইয়া তাহাতে কন্যাকে তুলিয়া লইয়া পলাইল। সাধু দেখিতে পাইয়া মারমার করিয়া অস্ত্র সংগ্রহ করিতে ডিঙ্গায় উঠিল, কিন্তু ডিঙ্গায় কোনও অস্ত্র খুঁজিয়া পাইল না, এই অবসরে বীরনারায়ণ ও সোনা ডিঙ্গা বাহিয়া তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল। রাত্রি তিনপ্রহরে ডিঙ্গা আসিয়া সোনার বাপের ঘাটে লাগিল।

এদিকে সন্ধ্যাবেলা কন্যা গিয়াছে জল আনিতে। রাত্রি হইয়া গেল কন্যার দেখা নাই। প্রথমে কলঙ্কের ভয়ে বাপ মা চুপচাপ অনেক খোঁজ করিল এবং অবশেষে পড়শীদের জানাইল। তাহারা যখন কন্যার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে তখন বীরনারায়ণ কন্যাকে লইয়া ফিরিল এবং তাহার মুখে সমস্ত শুনিয়া সোনার পিতা "রাধারমণ বুলে রাখছুইন সর্ম্মান বাচাইয়া।" কিন্তু পাড়াপ্রতিবাসীরা এই কথা বিশ্বাস করিল না। তাহারা কন্যাকে কলঙ্কী বলিয়া সমাজে নিতে আপত্তি জানাইল। সকলে কন্যাকে শাস্তি দিতে আসিলে বীরনারায়ণ কন্যার এক হাত ধরিয়া আর এক হাতে রামদাও নিয়া তাহাদের আক্রমণ করিতেই তাহারা পলাইল। তখন সোনা বীরনারায়ণের পায়ে কাঁদিয়া পড়িল—তাহার কি উপায় হইবে? যখন বীরনারায়ণ জানাইল যে, সে কন্যাকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিবে—তখন সোনা বলিল,

"আপনে হইছুইন জমিদার, মুই গিরস্থের নারী।
আপনের লগে মোর পিরীতি পউদ পাতার পানি॥

তাহার চেয়ে,

মুই কলঙ্কিনী নারী ঘুরি বনে বনে।
আনইলে ডুবিয়া মরি আপনের সামনে॥"

এই কথা বলিয়া কন্যা ডুবিতে চলিলে বীরনারায়ণ তাহাকে বাধা দিয়া আপনি মরিতে চাহিলে কন্যা অবশেষে অসমান প্রেম জানিয়াও তাহাতেই

সম্মত হইল। খোলা আকাশের নীচে দুইজনার গান্ধর্ব বিবাহ হইল। ইহার পর দেশে থাকা সম্ভব নয় বুঝিয়া,

সল্লা করিয়া দোহে ডিঙ্গিতে উঠিল।
প্রেমের টানেতে ডিঙ্গা পংখী উড়া দিল॥

বীরনারায়ণ ও সোনার আচরণের তীব্র নিন্দায় দেশ ছাইয়া গেল। প্রজারা জমিদারপুত্রের এ হেন আচরণে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া,

সগলে মিলিয়া তবে রে
আবে সলকি বল্লম লইয়া। (সড়কি)
গাঙ্গের পাড় ধর্‍্যা যায় বিছড়াইয়া বিছড়াইয়া।

জমিদারের কাছে প্রজারা বীরনারায়ণের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইলে তিনি তাহাকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে বীরনারায়ণ ও সোনা বনে বনে ঘুরিয়া, বনের ফল খাইয়া মনের মিলে সুখে দিন কাটাইতেছে। কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন জমিদারের লোক বীরনারায়ণকে ধরিল এবং তাহাকে জমিদারের কাছে নিয়া গেল। সোনা জঙ্গলে একলা রহিয়া গেল। বীরনারায়ণ খাবারের সন্ধানে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে, সোনা এ খবর জানে না। কুমার ফিরিল না দেখিয়া সোনা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বনে তাহাকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। এই অংশটি পল্লীকবির ভাষায় অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী রূপ পাইয়াছে। সোনার দুঃখে বনের পশুপক্ষীর চোখেও জল আসে। বন্ধুবিরহে সোনা বারমাসী গাহিয়া বিলাপ করে এবং

বন্ধুয়ার লাগি কন্যা ধিরে দাওনা হইয়া।

অবশেষে কন্যার মনে সন্দেহ জাগে যে, বীরনারায়ণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাই সে কাঁদে—

বাপ ছাড়লা মাও ছাড়লা আমার লাগিয়া।
শেষ কাটালে কেনেরে বন্ধু গেলা ফাঁকি দিয়া॥
আগে যদি জানতামরে বন্ধু যাইবা ছাড়িয়া।
দরিয়াত ডুবতামরে বন্ধু গলাত কলস লইয়া॥

ইহার পরের অংশ আর পাওয়া যায় নাই। অসমাপ্ত হইলেও কবিত্বগুণে ও বর্ণনা ঐশ্বর্যে পালাটি মহিমান্বিত।

।২৮। রতনঠাকুরের পালা—রচয়িতা অজ্ঞাত।

গাথাটি মৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। গীতি-কথার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত রচনা। কাহিনীটি ভাল, বেশ স্পষ্ট এবং ঘটনাগুলি সুকৌশলে গ্রথিত। কাহিনীটি পড়িয়া অনুমান করা যায় যে, গাথার আকারেই উহা গীত হইত। ঠিকমত সংগৃহীত না হওয়ায় মুদ্রণে সম্পূর্ণ গাথার রূপ ধরা পড়ে নাই। এই পালাটি কতকটা 'ধোপার পাট' পালার অনুরূপ। সেখানে এক রাজকুমার রজককন্যার প্রেমে পড়িয়া শেষে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এই পালাটিতেও রাজকুমার এক মালাকর দুহিতার প্রেমে পড়েন এবং শেষে রাজপুত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় মেয়েটির মৃত্যু হয়। 'ধোপার পাটের' নায়ক রাজপুত্র অতি নির্মম ও কৃতঘ্ন, কিন্তু বর্তমান পালাটিতে নায়ক কিছু-দিনের জন্য এক পতিতা রমণীর মোহে আত্মবিস্মৃত হইলেও শেষে অনুতাপে দগ্ধ হইয়া জীবনের সমস্ত সুখ-সম্ভোগ বিসর্জন দিয়াছিলেন। এই পালার নায়িকা অন্যান্য পালার নায়িকাদের ন্যায়ই রূপেগুণে অতুলনীয়া। কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল।

রাজপুত্র মালাকর দুহিতার রূপে মুগ্ধ। ফুলবাগানে রাজপুত্র তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিল ও রাত্রিতে উভয়ে সাক্ষাৎ করিল। পাড়াপড়শী এই নিয়া কানাকানি করিলে পিতা কন্যার ঘাটে যাওয়া, বাড়ীর বাহির হওয়া বন্ধ করিয়া দিল। তখন বিরহিণী কন্যা পিতার অজ্ঞাতে তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া দুইজনে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল এবং সজিস্তার দেশে গিয়া মালী ও মালিনী পরিচয়ে বাস করিতে লাগিল। এদিকে দেশে রতন ঠাকুরের (রাজপুত্রের) খোঁজ পড়িয়া গেল এবং অনেক খুঁজিয়া দেশের লোক জানিতে পারিল যে, সজিস্তার দেশের মালী-মালিনীই রতনঠাকুর ও তাহার প্রণয়িনী। তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া রঙ্গিলা নামক এক বারবনিতাকে সজিস্তার দেশে পাঠাইল। রতন ঠাকুর রঙ্গিলার মোহে পড়িয়া মালাকর কন্যাকে ভুলিল এবং রঙ্গিলাকে লইয়া পলায়ন করিল। সজিস্তার রাজাও এই বারবনিতার মোহমুগ্ধ ছিলেন। তিনি এই খবরে রাগিয়া গিয়া রতনঠাকুরের ঘরে আগুন দিতে হুকুম দিলেন। লোকজন আগুন দিতে আসিয়া দেখে ঘরে এক সুন্দরী স্ত্রীলোক। তাহারা রাজাকে এই খবর দিলে তিনি তাহাকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলেন। কন্যা নিরুপায় হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিল। এই অবস্থায় কন্যার খেদ

মর্মস্পর্শী। রঙ্গিলার মোহমুক্ত হইয়া যেদিন রতনঠাকুর সজিস্তার দেশে ফিরিল সেদিন সে আর তাহার প্রিয়তমাকে ফিরিয়া পাইল না। রতনঠাকুর তখন কন্যার শোকে পাগল হইয়া দেশে দেশে ঘুরিতে লাগিল। তাহার ক্ষণিক মোহের প্রায়শ্চিত্ত সে এইভাবেই করিল। এই পালাটিতে নায়িকার কোনও নাম নাই—কন্যা বলিয়াই তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

।২৯। **পীর বাতাসী**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই পালাটি চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত। এই পালার নায়িকা দুইটি—সুজন্তী ও বাতাসী। উভয়েই ভ্রষ্টা, স্বামীর প্রতি বিদ্রোহী, কিন্তু বাতাসীর অনুরাগ একনিষ্ঠ। এইসকল একনিষ্ঠ প্রেম শরীর নিরপেক্ষ, "এই সাহসিক বর্ণনা এভাবে পৃথিবীর আর কোন কবি দিয়াছেন কিনা জানি না।"—ডঃ দীনেশ সেন।

কাহিনী—বন্দনা দিয়া পালা আরম্ভ। জন্মদুঃখী হইয়া বিনাথ জন্মগ্রহণ করিল। তাহার জন্মের সাতমাসের মধ্যেই সে পিতাকে হারাইল। তাহার মাতা গাঁয়ের চান্দ মোড়লের কাছে রাঁধুনীগিরি করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। এইভাবে বিনাথ যখন সাত বছরের হইল তখন সে কপালের দোষে মাতাকেও জন্মের মত হারাইল। তখন হইতে—

চাঁন্দের বাড়ীতে বিনাথ করে গরুর রাখালী।
কিছু কিছু কইরা বিনাথ দুঃখ যায় রে ভুলি॥

এইভাবে বিনাথ কুড়ি বৎসরের যুবক হইল ও সুন্দর বাঁশী বাজাইতে শিখিল। চাঁদের জননীকে বিনাথ মা বলিয়া ডাকে। চাঁদের ভগিনী সুজন্তী অপরূপ রূপবতী।

চাঁদ বিনাথকে লইয়া বাণিজ্যে গেল। কিন্তু নৌকাডুবি হইয়া,

সুতের মুখেতে যেমন জলুইর কুটা ভাসে।
বিনাথে ভাসাইয়া নিল কংস নদীর পাকে॥

এই কংসনদীর পারে সুমাই ওঝা বাস করিত। সে খুব দক্ষ ওঝা ছিল। এই ওঝার এক সুন্দরী কন্যা ছিল—তাহার নাম বাতাসী। বাতাসী স্রোতের জলে ভাসিয়া-আসা অজ্ঞান অচৈতন্য বিনাথকে দেখিয়া পিতাকে খবর দিল। ওঝার ঔষধে বিনাথ প্রাণ ফিরিয়া পাইল। চক্ষু চাহিয়াই সে বাতাসীকে দেখিল। তিনমাস পরে বিনাথ সুস্থ হইল। বিনাথ সুমাইকে মন্ত্রগুরু মানিয়া তাহার

নিকট সাপের বিষের মন্ত্র শিখিয়া লইল। বাতাসী ও বিনাথ পরস্পরকে ভালবাসিল। বিনাথ গুরুর কাছে মন্ত্র শিক্ষা করে। এইখানে সাপের মন্ত্রের নানারূপ নাম ও ক্রিয়াপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিনাথ মন্ত্রের ব্যবহারে খুব পারদর্শী হইয়া উঠিল। কিন্তু,

শিক্ষা নাই সে দিয়া সুমাইর হিংসা হইল মনে।
শিষ্যি না হইয়া বিনাথ নিজগুরু জিনে॥

তখন ওঝা বিনাথকে মারিতে যুক্তি করিল।

এইকথা বাতাসী বিনাথকে জানাইলে বিনাথ অনেক কাঁদিল এবং অবশেষে বাতাসীকে বলিল যে, সে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। পীরের মন্ত্রের ভয়ে সে বাতাসীকে লইতে সাহস করিল না। চক্ষের জলে ভাসিয়া বাতাসী বিনাথকে বিদায় দিল। পানসী বাহিয়া বিনাথ আপন দেশে ফিরিল। দেশে ফিরিয়া সে আপন মন্ত্রের গুণে অনেককে সাপের বিষ হইতে বাঁচাইল। ইহাতে তাহার বেশ নাম হইয়া গেল। তখন চাঁদ মোড়ল সুজন্তীর সহিত বিনাথের বিবাহ দিল। কিন্তু বিনাথ ও সুজন্তীর মনের মিল হইল না। সুজন্তী অন্য একজনকে ভালবাসে। এই কথা বিনাথ ক্রমে জানিতে পারিল তখন,

রৈয়া রৈয়া পড়ে মনে বাতাসীর কথা।
বাতাসে আসিয়া কয় কন্যার মনের বেথা॥
স্বপ্নেত দেখায় বিনাথ কন্যা নদীর কূলে খাড়া।
ছিন্ন ভিন্ন চিকণ কেশ হইল আউল দরা॥

এদিকে সুমাই ওঝা সেই দেশে আসিয়া বিনাথের জিয়নমন্ত্র হরণ করিল। সুজন্তীকে হাত করিয়া তাহারই সাহায্যে সুমাই এই কার্য সম্পন্ন করিল এবং গৃহে ফিরিল। বিনাথ বিদ্যা (গুণ) হারাইয়া দেশের লোকের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়িল, সকলে তাহার শত্রু হইয়া উঠিল। তখন সে দেশ ছাড়িয়া চলিল। কোথায় যাইবে ভাবিয়া পায় না। কেবল "রৈয়া রৈয়া উঠে মনে বনের কন্যার কথা।"

এদিকে বাতাসীরও বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু সে কিছুতেই বিনাথকে ভুলিতে পারে না। নদীর ঘাটে বসিয়া তাহার জন্য বিলাপ করে। ঘরে তাহার মন টেকে না। কন্যার বিলাপের মধ্যে স্থানে স্থানে বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব লক্ষিত হয়। একদিন নিশি রাত্রে বিনাথের বাঁশী শুনিয়া কন্যা ঘর ছাড়িয়া

তাহার সহিত পলাইয়া গেল এবং বহুদূরে এক জঙ্গলে দুইজনে ঘর বাঁধিয়া মনের সুখে ঘর করিতে লাগিল। এদিকে বিনাথ দুষ্কর্ম করিয়াছে জানিতে পারিয়া সুমাই ওঝা রাগিয়া আগুন হইল এবং মন্ত্র পড়িয়া পদ্মনাল সর্পকে পাঠাইল বিনাথকে দংশন করিতে।

মন্ত্রপূতঃ সর্প গিয়া বিনাথকে দংশন করিল।

> ঊর্দ্ধনালে সপ্তবিষ উজাইয়া জলে।
> মস্তকে উঠিল বিষ সেই ঊর্দ্ধনালে॥
> ঢলিয়া পড়িল বিনাথ কন্যার যে কোলে।

এই সময় সুমাই ওঝা সেখানে আসিলে বাতাসী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে পড়িল। ওঝা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু,

> লোভেতে পড়িয়া ওঝা লইল টঙ্কাকড়ি।
> জিয়ন মন্ত্ররের গুণ ওঝায় গেছে ছাড়ি॥

সে বিনাথকে বাঁচাইতে পারিল না।

তখন অভাগী ওঝার কন্যা বিনাথকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নদীর পারে গেল এবং বিনাথের সঙ্গে সঙ্গে আপনিও নদীর স্রোতে প্রাণ বিসর্জন দিল।

এই পালাটি গায়েনের পরিচয় দিয়া শেষ হইয়াছে।

। ৩০। **রাজা তিলকবসন্ত**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই পালাটি চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন। এই পালাটিতে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ্য প্রভাব লক্ষিত হয়। এই পালাটিতে মহাভারতের শ্রীবৎস ও চিন্তার উপাখ্যানের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তিলকবসন্তের রাণী ও তাহার সপত্নীর কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ধৈর্য প্রভৃতি গুণ অসামান্য। রাজার বনবাসের চিত্র বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। এই পালাটিতে যেমন তিলকবসন্ত, তেমনি তাহার দুই রাণী—তিনটি চরিত্রই অতি মহৎ। এই পালাটিতে ছন্দের কিছু বৈচিত্র্যও দেখা যায়। কাহিনীতে রূপকথার প্রভাব সুস্পষ্ট।

এক নদীর ধারে তিলকবসন্ত নামে রূপে-গুণে অনুপম জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন।

রাজা-রাণীর অজ্ঞাতে একদিন দুপুর রাত্রে অতিথি ফিরিয়া গেলে করমপুরুষ রাজাকে অমঙ্গলের আশঙ্কা জানাইয়া স্বপ্ন দিলেন। রাজা চমকিয়া জাগিয়া

উঠিলেন এবং রাণীকে সমস্ত বলিলেন। করমপুরুষের বরেই রাজা ধনেজনে সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং কথা ছিল যে, যদি অতিথি বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায় তাহা হইলে রাজা সমস্ত হারাইবেন। কপালদোষে নিজের অজ্ঞাতে রাজা কর্মদোষে দায়ী হইলেন। তখন রাজা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। রাণীও অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া রাজাকে বুঝাইয়া তাঁহার সঙ্গ লইলেন। রাত না পোহাইতেই রাজা ও রাণী বনে চলিয়া গেলেন। ইহার পর কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়া রমণীদের বর্ণনা অতি চমৎকার।

বনে থাকে কাঠুরিয়া।
বুক ভরা দয়া মায়া॥
গাছ কাটে বিরক্ষ কাটে।
বিকায় নিয়া দূরের হাটে॥
শাল চন্দন তাল তমাল আর যত।
বিরক্ষের নাম কহিবাম কত॥
ছয় মাস থাকে বনে।
ছয় মাস থাকে ধনে॥
কাট বিকাইয়া খায়।
এক রাজার মুলুক হইতে আর এক রাজার মুলুকে যায়।

এদিকে আবার—

যত সব কাঠুরাণী।
তারা সব বনের রাণী॥
পিন্ধন পছারা ছান্দে।
মাথার বেণী উঁচু কইরা বান্ধে॥
বনের ফল খায়।
পাতার কুটে শুইয়া নিদ্রা যায়॥ (কুটীরে)।

এবং তাদের—

মুখভরা হাসি চান্দের ধারা।
না জানে ছল—না জানে চাতুরী তারা॥
বনের গমন বনের পথে।
বাঘ ভালুক ফিরে সাথে সাথে॥

মুখভরা হাসি চান্দের ধারা।
না জানে ছল—না জানে চাতুরী তারা ॥
পন্থে পাই টুকায় ফল—টুকায় ময়ুরের পাখা।
ধার্ম্মিক রাজারাণীর সঙ্গে হইল পন্থে দেখা ॥

তখন রাজারাণী ইহাদেরই সহৃদয় আশ্রয়ে রহিয়া গেলেন। তাহারা রাজারাণীর জন্য সুন্দর কাঠের বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দিল। এইভাবে চল্লিশ রজনী কাটিল।

একদিন ধার্মিক রাজা দূরের হাটে চন্দন কাঠ বিক্রয় করিয়া কাহণ নিয়া আসিলে রাণী কাঠুরিয়াদের খাওয়াইবেন বলিয়া বড় যত্নে নানা ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিলেন। রাঁধিয়া বাড়িয়া রাণী স্নান করিতে গেলেন। সঙ্গে কাঠুরিয়া রমণীরাও চলিল। এমন সময় এক সওদাগর সেই পথে বাণিজ্য সারিয়া দেশে ফিরিতেছিল। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিয়া বিফল হয় এবং তাহার অভিশাপে সাধুর ডিঙ্গা চরে ঠেকিয়া গেল। সাধু কাঁদিতে লাগিল—তখন দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া করমপুরুষ বলিলেন,

"শুন শুন সাধু আরে সাধু কহি যে তোমারে।
সতীকন্যা পাও যদি সঙ্গে লইও তারে ॥
সতীকন্যা ডিঙ্গা যদি আঙ্গুলেতে ছোয়।
অবশ্য ভাসিব ডিঙ্গা অন্যথা না হয় ॥"

ঠিক এই সময়েই কাঠুরিয়া রমণীগণের সহিত রাণী ঘাটে আসিয়া পৌছিলেন। রাণীকে দেখিয়া সাধুর লোকেরা চমৎকৃত হইল। সাধু কাঁদিয়া রাণীর পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ডিঙ্গায় পা দিতে বলিল, নহিলে সে আপন মাথা পাষাণে ভাঙ্গিবে।

রাণী দয়ার্দ্রা হইয়া সওদাগরের ডিঙ্গা স্পর্শ করিলেন ও সওদাগরের ডিঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। তখন—

মাঝি মাল্লা কয় সাধু কাণ্ড বিপরীত।
এহি কন্যায় সঙ্গে ত লও যদি চাহ হিত ॥

তখন সাধুও কুবুদ্ধি হইয়া ধরিয়া বান্ধিয়া রাণীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। রাণী হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় রাণীর করমপুরুষের কথা মনে পড়িল। তিনি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলেন "যদি সতী কন্যা হই তাহা হইলে কুড়ি কুষ্ঠিতে আমার অঙ্গ ছাইয়া যাক এবং এই চৌদ্দ ডিঙ্গা আবার বিড়ম্বনায় পড়ুক।" সতী রাণীর প্রার্থনা ফলিল। চৌদ্দ ডিঙ্গা চড়ায় ঠেকিয়া গেল এবং

কুড়িকুষ্ঠিতে রাণীর সোনার অঙ্গ ঢাকিয়া গেল। সকলে রাণীকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। রাণীকে বনে বিসর্জন দিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া রাজা সমস্ত শুনিয়া পাগলের মত বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে কাঠুরিয়াদের কাছে বিদায় চাহিলেন। কাঠুরিয়ারা কিছুতেই রাজাকে বিদায় দিতে সম্মত হইল না, তাহারা তাঁহাকে প্রবোধ দিল যে, রাত্রি ভোর হইলে সব দেশে তাহারা রাণীর খোঁজ করিবে। কিন্তু রাজা রাত্রিতেই কোথায় চলিয়া গেলেন। সকালে রাজাকে না দেখিয়া সকলে হায় হায় করিতে লাগিল।

আর এক দেশের রাজা-রাণী সুখে বাস করেন। তাঁহাদের 'এক কন্যা সাত পুত্র আঁধাইর ঘরের বাতি।' একদিন রাজকন্যা জল আনিতে রাজার ঘরে গেলে রাজা তাহাকে রাণী মনে করিয়া পরিহাস করিলে—'আৎকা দেখে রাজকন্যা বাহির হইয়া যায়'। তখন রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া লজ্জায় পড়িলেন। ভাবিলেন,

অতবড় কন্যা ঘরে।
বিয়া না দিলাম তারে॥

রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ করিল,

সকালে উঠিয়া দেখবাম যারে।
কন্যা বিলাইবাম তারে॥

রাজা সকালে উঠিয়া নতুন মালীর মুখ দেখিলেন এবং তাহার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিলেন। রাজকন্যার মনে কোনও দুঃখ নাই; মালীর ঘরই করিতে লাগিলেন। সতী নারীর পতিই সব। কিন্তু রাজা-রাণী কাঁদিয়া বুক ভাসান। রাজা রাজকন্যাকে প্রাণ ভরিয়া ধনরত্ন দিয়া তাঁহার সব দুঃখ ঢাকিয়া দিতে চান। কিন্তু মালী ও রাজকন্যা তাহা কাঙ্গালকে বিলায়। সুতরাং,

রাজ্যের যতেক কাঙ্গালিয়া না যায় রাজার বাড়ী।
ভিক্ষা লইতে আস্যে তারা মালী রাজার বাড়ী॥

ইহাতে সাত রাজপুত্রের খুব হিংসা হইল। তাহারা ভাণ্ডারীকে হুকুম দিল যে, মালীকে যেন আর কাণাকড়িও দেওয়া না হয়। রাজকন্যা বড় দুঃখে পড়িলেন। খুদকণা খাইয়া তাঁহাদের দিন যায়, তবুও রাজকন্যার মুখের হাসি মিলায় না।

রোজকার মত কাঙ্গাল আসিলে রাজকন্যা আপন গায়ের গহনা দিয়া ভিক্ষুক বিদায় করিলেন। এমন সময় এক অন্ধ বামুন ভিক্ষা লইতে আসিল। কিন্তু এই অন্ধ বামুন আর কিছু চাহে না, সে চক্ষুদান চাহে। এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া রাজকন্যা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সময় মালী ঘরে ফিরিয়া সমস্ত শুনিল এবং ইহাও করমপুরুষের পরীক্ষা বুঝিতে পারিয়া,

কাটারি লইয়া চক্ষু উপারি তুলিল।
ভিক্ষাশূর বাম্মণের হাতে তুল্যা দিল॥

বলা বাহুল্য এই মালীই রাজা তিলকবসন্ত। রাজকন্যা কাঁদিতে লাগিলে মালীরাজা তাহাকে প্রবোধ দিলেন। ইহার পর হইতে অন্ধ স্বামীর বদলে রাজকন্যাই ঝাড়ু লইয়া রাজার বাড়ী পরিষ্কার করেন। রাণী কাঁদিয়া ভাসান কিন্তু পুত্রদের হুকুম নাই, কাজেই কাণাকড়িও রাজকন্যাকে তিনি দিতে পারেন না। একদিন শিকারের বাজনা শুনিয়া মালীরাজা শিকারে যাইতে চাহিলেন। রাজকন্যা অনেক বুঝাইলেন কিন্তু মালী কিছুতেই শুনিলেন না। তখন রাজকন্যা পিতার নিকট হইতে শব্দভেদী ধনু আর ছিলা চাহিয়া আনিলেন। মালীরাজা শিকারে গেলেন। রাজা বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন, হঠাৎ কিসে পা ঠেকিতেই রাজার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। রাজা চাহিয়া দেখেন তাঁহার স্বলারাণী। স্বামীর পা লাগিয়া রাণীর অঙ্গের ক্ষত মিলাইয়া গেল। বার বছর পরে রাজা-রাণীর মিলন হইল। রাণীর মুখে রাজা সমস্ত শুনিলেন। এদিকে সাতভাই রাজপুত্র শিকার না পাইয়া রাগিয়া আগুন। যাইতে যাইতে তাহারা দেখে এক গাছের নীচে এক দেব আর দেবী। তাহাদের সম্মুখে সাতটা হরিণ। সাতভাই মালীকে চিনিতে পারিল। সাতভাই যুক্তি করিল যে. মালীকে মারিয়া হরিণ লইয়া ফিরিবে। কিন্তু বীর তিলকবসন্ত তাহাদের পরাজিত করিয়া তাহাদের কপালে তপ্ত অঙ্গুরীর চিহ্ন আঁকিয়া দিলেন। রাজকন্যার কথা মনে করিয়া তাহাদের প্রাণে মারিলেন না। একটি আংটি তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন যে, 'এই আংটি রাজকন্যাকে দিও, ইহাতে আমার পরিচয় আছে।' ভাইরা রাজকন্যাকে আংটি দিল এবং বলিল যে, অন্ধকে বনের মধ্যে বাঘে খাইয়াছে। রাজকন্যা আংটির কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। তখন রাজকন্যা পবনকুমারী স্বামীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাজা তিলকবসন্তের রাজ্যে আসিয়া

পবনকুমারী এক ধোপার গৃহে আশ্রয় লইলেন। পবনকুমারী একদিন রাণীর কাপড়ের মধ্যে ছিরি অঙ্গুটখানি রাখিয়া দিলেন। সুলারাণী কাপড় খুলিয়া অঙ্গুট পাইয়া রাজাকে দেখাইলেন। তখন রাজা কন্যা আনিতে দোলা পাঠাইলেন। পবনকুমারী স্বামী ফিরিয়া পাইলেন। সুলা আসিয়া সতীনকে আলিঙ্গন দিয়া তুলিলেন। পবনের পিতা সমস্ত শুনিয়া 'অর্দ্ধেক রাজত্বি দিল রাজা বসন্তরে'। এইভাবে রাজা তিলকবসন্ত অভিশাপ মুক্ত হইলেন।

।৩১। **জীরালনী**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই পালাটি অসম্পূর্ণ। ইহা চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক মৈমনসিংহের একটি গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

এই গানটি কতকটা রূপকথার মত। কতকটা রূপকথার মত হইলেও এই গানটি পল্লীরসমাধুর্যে ভরপূর। জলে ডুবিতে ডুবিতে রাজকন্যা তাহার পিতা-বিমাতার উদ্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা বড়ই করুণ। রাজকুমার তুলাই-নির্মিত উদ্যানবাটিতে যে সকল ফুলের বর্ণনা আছে তাহা আমাদের চোখে বাঙ্গলার পল্লীমহিমা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়। এই গানটির ভাষা ও গাথার ছন্দের সুগঠিত অবয়ব দেখিয়া মনে হয় ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। কাহিনীটি এইরূপ—

রাজা চক্রধর একদিন শিকারে গিয়া একটি সোনার হরিণ ধরিয়া আনিলেন এবং রাজকন্যা মেঘমতীর হাতে তাহা সমর্পণ করিলেন। রাজকন্যাকে সকলে আদর করিয়া জিরালনী বলিয়া ডাকিত। রাজকন্যা হরিণ পাইয়া মহা খুসী। একদিন হরিণকে স্নান করাইবার সময় রাজকন্যা দেখিলেন যে, হরিণের শিঙ্গে একটি সোনার কবচ বাঁধা। রাজকন্যা কবচ খুলিয়া লইতেই 'সোনার বন্য হরিণ দেখ কুমার হইল।' রাজকন্যা কুমারকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। কুমারের কথায় রাজকন্যা আবার কবচ বাঁধিয়া দিতেই কুমার সোনার হরিণ হইয়া গেলেন। তখন হইতে রোজ রাত্রে কন্যা কবচ খুলিয়া লয় ও রাজকন্যা ও কুমার সুখে রাত্রি কাটায়। দিনের বেলায় কুমার হরিণ হইয়া থাকে। রাজ্যের কেহই একথা জানিতে পারিল না। রাজকন্যা জিরালনী ও কুমারের গান্ধর্বমতে বিবাহ হইয়া গেল। রাজপুত্রের বিমাতার চক্রান্তেই রাজপুত্র এইভাবে হরিণ হইয়াছেন। এদিকে

আবার জিরালনীর বিমাতাও চক্রান্ত করিয়া জিরালনীর মাতাকে বনবাসে পাঠাইয়াছে আর জিরালনীর বৈমাত্র ভাই তুলাই-এর জিরালনীর উপর প্রচণ্ড আকর্ষণ। একদিন রাজকন্যা কবচ খুলিয়া রাখিয়া আর খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন বাধ্য হইয়া রাজপুত্র সকলের অগোচরে রাজ্য ছাড়িলেন। এদিকে তুলাই রাজকন্যাকে পাইবার জন্য অস্থির। রাজা-রাণী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতদের মত জানিতে চাহিলেন যে, বৈমাত্র ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ সিদ্ধ কিনা? টাকা-পয়সার লোভে পণ্ডিতরা সিদ্ধ বলিয়া মত দিলেন। তখন তুলাই-এর সহিত জিরালনীর বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। জিরালনী নিরুপায় হইয়া নদীর ঘাটে গিয়া একটি নৌকায় চড়িয়া মাঝ নদীতে গেলেন এবং পিতা, মাতা ও ভ্রাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নদীতে ডুবিয়া গেলেন। এক জেলে ও জেলেনী মাছ ধরিতে গিয়া জালে জিরালনীকে পাইল ও লক্ষ্মীদেবী মনে করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিল। জিরালনী জেলে ও জেলেনীকে পিতামাতার ন্যায় ভালবাসিয়া তাহাদের কাছে থাকিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে এক সাধু বাণিজ্য করিতে আসিলেন এবং জিরালনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া জেলে ও জেলেনীকে অনেক বুঝাইয়া, অনুরোধ করিয়া এবং অনেক ধনদৌলত দিয়া রাজকন্যাকে আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। রাজকন্যা কতকগুলি শর্তে সাধুর গৃহে আসিলেন। একদিন কন্যা সাধুর কাছে আপনার পূর্বকথা সমস্ত প্রকাশ করিলেন, কেবল সোনার হরিণের কথা বলিলেন না। অতঃপর ধাইয়ের মুখে শোনা গল্প এই বলিয়া সোনার হরিণের কথা তাহাকে জানাইলেন এবং সেই কুমারের বৃত্তান্ত সত্য কিনা জানিবার জন্য সদাগরকে অনুরোধ করিয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া আপনি সঙ্গে চলিলেন। সদাগর জিরালনীকে পাইবার আশায় রাজী হইয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসাইলেন। কিন্তু চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরাডুবি হইয়া সাধু ও জিরালনীকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

ইহার পর পালাটি আর পাওয়া যায় নাই।

। ৩২। **সোণাবিবির পালা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

পালাটি সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। সামান্য অংশ মাত্র দীনেশচন্দ্র সেনের সংগ্রহে মুদ্রিত হইয়াছে। এই অংশ হইতেই নায়কের প্রেমের গভীরতা

অঙ্কনে কবির অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় মিলিতেছে। কাহিনীর যে অংশটুকু মুদ্রিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল—

নায়ক মামুদের পিতার নাম চান্দ সদাগর। পুত্রের জন্মের পর বাণিজ্যে গিয়া চান্দ সদাগর আঠার বৎসর পরেও যখন ফিরিলেন না তখন মাতার অনুমতি লইয়া মামুদ বাণিজ্য যাত্রা করিল। পথে সোণাবিবিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সে তাহাকে বিবাহ করিল। কিন্তু বিবাহের পর পত্নীপ্রেমে আত্মহারা হইয়া মামুদ বিষয়কর্ম অবহেলা করিতে লাগিল। ফলে তাহাদের অত্যন্ত দুরবস্থা হইল। অবশেষে বন্ধু মমিনের উপদেশে স্ত্রীর দুর্দশা দূর করিতে মামুদ নৌকা লইয়া আবার বাণিজ্যে বাহির হইল। কিন্তু ভাগ্য তখনও তাহার প্রতি প্রসন্ন নহে। ঝড়ে তাহার নৌকা ডুবিয়া গেল এবং কোন রকমে জল হইতে রক্ষা পাইলেও জঙ্গলে অসহায় অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে মামুদ সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পালাটির এই পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

মুদ্রিত অংশে পাই সোণার প্রতি মোহগ্রস্ত হইয়া,

সকল ছাড়িয়া মামুদ গিরেতে বসিল।
সোণার লাগিয়া মামুদ পাগল হইল॥

দিনরাত্রি সোণাকে লইয়া, তাহাকে দেখিয়া, তাহাকে আদর করিয়াই মামুদের কাটিয়া যায়। মামুদ সর্বদাই সশঙ্কিত এই বুঝি সোণার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এই বুঝি তাহার মাথা ধরে। মামুদ সোণার চিন্তায় জগৎ সংসার সকলই ভুলিল।

ইহার পরই নৌকাডুবির পর মামুদের অবস্থা কি রকম হইল সেই অংশটি মুদ্রিতাকারে পাই। এই অবস্থাতেও মামুদ আপন দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া সোণার জন্যই অস্থির। তাহার অবর্তমানে সোণার ঠিকমত যত্ন হইতেছে না, সে ঠিকমত আহার পাইতেছে না, মামুদকে না দেখিয়া সোণা কি রকম মনোকষ্টে দিন কাটাইতেছে, সকলের গঞ্জনা সহিতেছে, কলসীকাঁখে সোণা ঘাটে জল নিতে আসিয়া মামুদের আশাপথ চাহিয়া থাকে, এই সমস্ত চিন্তাতেই মামুদ অস্থির। তাহার মনে ভয় হয়—

এই বিষে বিষেরে সোণা আমার প্রাণে যাইব মারা।
আর না দেখবাম চান্দমুখ বুকে বিন্‌নো থাড়া॥

সোণার প্রতি মামুদের ভালবাসা খুবই গভীর তাই নিজে বিপদে পড়িয়াও সে তাহার দুঃখের কথাই চিন্তা করিতেছে।

।খ। **দ্বিতীয় শ্রেণী** : পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল হইতে যে সমস্ত প্রণয়-গাথা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার বিবরণ দিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত প্রণয়গাথার সংখ্যা কম তাহা আগেই বলিয়াছি। যে দুই চারিটি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কাহিনী রূপকথার ন্যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা পুরাণো ও বিশুদ্ধ প্রণয়গাথা সরূফের 'দামিনী চরিত্র'। ইহা বারমাসী জাতীয় রচনা সুতরাং বারমাসী গাথার সহিত ইহার আলোচনা করিব। এখন প্রণয়-গাথাগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

।১। **চন্দ্রমুখীর পুঁথি**—রচয়িতা খলিল।

"খলিল সম্ভবতঃ সিলেটের লোক ছিলেন। সিলেট—চাঁটিগার মুসলমানদের মধ্যে হিন্দীমূলক আখ্যায়িকার প্রচলন খুবই ছিল। রোমান্টিক এডভেঞ্চার-বিহীন বিশুদ্ধ প্রণয়গাথাও এঁরা অনেকদিন অবধি চালু রেখেছিলেন। এই রকম একটি পুরাণো এবং ভালো গাথা, নাম 'চন্দ্রমুখী' ছাপা হয়েছিল বহুদিন পূর্বে সিলেটী নাগরী হরফে। কাহিনীর উপক্রম মৃগাবতী আখ্যায়িকার মত।" (ইসলামি বাংলা সাহিত্য—সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৩)। বাংলা হরফে যে পুঁথিটি পাই তাহাতেও ভণিতায় খলিলের নাম এবং রচনাকাল ১৩২৪ সাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা পুঁথি নকল করিবার তারিখ, রচনার তারিখ নহে। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

মিছির নগরের রাজা পুরুবেশ্বরের পুত্র কুমার গুলস্নাহর শিকারে গিয়া গন্ধর্বকন্যা মৃগরূপিণী চন্দ্রমুখীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং সখাদের লইয়া গন্ধর্বনগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। বহু দেশ পার হইয়া অবশেষে তাহারা গন্ধর্ব নগরে গিয়া এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় লইল। সুড়ঙ্গপথে মালিনীর ঘর হইতে চন্দ্রমুখীর ঘরে গিয়া গুলস্নাহর প্রণয়লীলা করিতে লাগিল। কুমার ও চন্দ্রমুখীর প্রণয়লীলা বিদ্যা-সুন্দরের প্রণয়লীলা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এদিকে কুমারের সন্ধান করিতে করিতে যখন মিছিরনগরের লোক আসিয়া মালিনীর ঘরে উপস্থিত হইল তখন পিতামাতার জন্য কুমারের মন কাঁদিয়া উঠিল।

বন্ধুদের পরামর্শে রাজপুত্র কৌশলে চন্দ্রমুখীর কাছ হইতে বিদায় নিলেন। বন্ধুরা পরামর্শ দিল,

যেই না পালঙ্কে শুইয়া থাকে চন্দ্রমুখী
সন্ধি করি ফুলের ভেশ তথা যাইও রাখি।
চন্দ্রমুখীর মুখেতে পানের বীড়া দিয়া
সে অঙ্গুলি তোমার লইও খসাইয়া।
ধীরে চালাইও পাও নিশাভাগ হৈলে
তুরিতে সকলে মিলে যাইমু নদীর কূলে।

রাজপুত্রও তাহাই করিলেন এবং বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ঘাটে গিয়া দেশের অভিমুখে নৌকা খুলিয়া দিলেন।

সকালবেলায় নিদ্রাভঙ্গের পর চন্দ্রমুখী কুমারের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিল এবং দরবেশ যোগীর বেশ ধরিয়া কুমারের সন্ধানে নদীর তীর ধরিয়া ছুটিল। রাজকুমারী সহজেই আরামপ্রিয়, এত কষ্ট সহিবে কেন? তাই,

"খনে যাত্র লড় দিয়া খনে যাত্র ধীরে।
গাছের ছিকড় লাগি পড়ি পাছাড় খাএ॥
কোমাল চরণ ফাটি লহু বই্আ যাএ।"

কিছুদূর গিয়া সে একটি ডিঙ্গা দেখিতে পাইল। চন্দ্রমুখীর বিলাপ শুনিতে পাইয়া কুমার অস্থির হইল এবং সখাগণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া দরবেশবেশী চন্দ্রমুখীকে নৌকায় তুলিয়া নিল। কিন্তু সে চন্দ্রমুখীকে চিনিতে পারিল না। গল্পের খাতিরে রাজপুত্রকে অতিরিক্ত বুদ্ধিহীন দেখানো হইয়াছে। তাহা না হইলে চন্দ্রমুখী যখন বলিতেছে,

"নয়ন থাকিতে তুমি জনমের আন্ধ
কেমতে চিনিবাএ তুমি গগনের চান্দ।"

তখনও রাজপুত্র তাহাকে চিনিতে পারিল না।

নৌকা মিছিরনগরের ঘাটে ভিড়িলে রাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়িল। পুত্রসখা জগম্বরের মুখে পুত্রের বিষয় অবগত হইয়া রাণী অবিলম্বে মহাধূমধামে ইন্দ্রের অপ্সরীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। কুমারের জিদে দরবেশবেশী চন্দ্রমুখীও বাসরে গেল। কুমার বলিল, প্রাণের বন্ধু দরবেশকে 'এক পল না

দেখিলে না রহে জীবন।' কাজে কাজেই রাজাকে রাজী হইতে হইল। দরবেশকে পাশের ঘরে রাখিয়া কুমার একলা বাসরঘরে ঢুকিল। দরবেশবেশিনী চন্দ্রমুখীর পক্ষে ইহা মর্মান্তিক হইল। সে তখন আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখিল না এবং মৃত্যুবরণ করিবার পূর্বে আপন পরিচয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় দরবেশ বেশ পরিত্যাগ করিয়া আপন বেশ ধরিল। নববধূরূপে সজ্জিতা হইয়া কুমারের নিষ্ঠুরতায় চন্দ্রমুখী "কাটারি হির্দেতে হানি তেজিল জীবন।" অর্ধরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া কুমারের দরবেশের কথা মনে হইল। দরবেশের সাড়া না পাইয়া পাশের ঘরে আসিয়া চন্দ্রমুখীর মৃতদেহ দেখিয়া সে সকলই বুঝিল। আপন মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া কুমার চন্দ্রমুখীর শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রমুখীর পথ অনুসরণ করিল। স্বামীর বিলাপোক্তি শুনিয়া নববধূ সে ঘরে আসিয়া দেখিল পালঙ্কের উপর স্বামী এবং আর এক পরমাসুন্দরীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামীশোকে হতবুদ্ধি হইয়া নববধূও 'সেই সে কাটারি হানি তেজিল পরাণ'। সকালে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনটি দেহ সংকারের সময় ইসা নবী আবির্ভূত হইলেন এবং সকল শুনিয়া দয়াপরবশ হইয়া তিন-জনের প্রাণদান করিলেন। এদিকে গন্ধর্বনগরীর রাজা কন্যার সন্ধানে চর পাঠাইয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করার পর বৃদ্ধ চর মিছিরনগরে কন্যাকুমারের সাক্ষাৎ পাইল। তখন তাহার অনুরোধে পিতার অনুমতি লইয়া কুমার চন্দ্রমুখীকে লইয়া গন্ধর্বনগরীতে গেল। কন্যার পিতা ফীরোজ শাহ্ কন্যা-জামাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিলেন। তখন—

পুরীতে আনন্দ হৈলা অন্ধকার পরকাশীলা,
চন্দরমুখী আইলা আপন দেশে নারে॥
ওধম খলিলে কএ, শব বাতে দুষী হএ,
কইনা দামান্দ হইলা আনন্দীত নারে।

—পুঁথির পাঠ।

গাথাটির রচনায় বিশুদ্ধ সাধুভাষার ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা দেখা যায়। লিপিকারের অশুদ্ধ বানানে পুঁথিটি ভারাক্রান্ত। গাথাটিতে একটি সহজ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গাথাটির একটি বড় বিশেষত্ব ইহার ত্রিপদীতে মিল নাই। গানের ধুয়া 'নারে' শব্দটি দ্বারা এই মিল বজায় রাখা হইয়াছে।

। ২ । সখীসোণা—রচয়িতা ফকীররাম কবিভূষণ।

সখীসোণা বা শশীসেনার গল্পটি বহুল প্রচারিত। ঠাকুরদাদার ঝুলির পুষ্পমালা গল্পটির কাহিনীর সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠ এবং দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত পুঁথির অন্তর্গত কাহিনীর আশ্চর্য মিল লক্ষিত হয়। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, এই কাহিনীটি তখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সুপ্রচলিত ছিল। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

সখীসোণা রাজকুমারী। তিনি কোটালের পুত্রের সহিত এক গুরুর পাঠশালায় পড়িতেন। একদিন সখীসোণার হাতের কলম ভূমিতলে পড়িয়া গেলে রাজকন্যার অনুরোধে কোটাল পুত্র সেটি তুলিয়া দিলেন। কিন্তু বিনিময়ে কোটালপুত্র রাজকন্যার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি চাহিয়া লইলেন যে, তিনি (কোটালপুত্র) যাহা বলিবেন রাজকন্যাকে তাহা পালন করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটিল। তৃতীয় দিন যখন রাজকন্যার কলম হস্তচ্যুত হইল তখন কোটালপুত্র তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কোটালপুত্রের এই অভিপ্রায় রাজকন্যার দম্ভে আঘাত হানিল। তিনি বলিলেন—

জলে থাকি কুম্ভীর সহিত কর বাদ।
বামন হয়্যা চাঁদে হাত দিতে কর সাধ ॥
কোন লাজে কোঙর কহিলে হেন কথা।
রাজাকে কহিয়া তোর কাটাইব মাথা ॥

(বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়। ২য় খণ্ড।—
দীনেশ সেন)

তখন কুমার উত্তর করিলেন—

আশা পায়্যা ভাষা কথা কহিলাঙ তোরে।
যে হল্য সে হল্য গুণা মাপ কর মোরে ॥
তোরে হেন বচন বলিব নাই আমি।
সত্যে বন্দী থাকিলে হইবে অধোগামী ॥

(বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় : ২য় খণ্ড :
দীনেশ সেন)

এই বলিয়া কুমার রামায়ণ হইতে সত্যরক্ষার বিবিধ আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন।

কুমারের এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা আপন দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সত্যভঙ্গ অপরাধের ভয়ে কুমারকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মনে মনে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইবার সময় গুরুদেবকে বলিলেন—

কহিয় কহিয় গুরু জননীর ঠাঞি।
তোমার কন্যার সনে আর দেখা নাই॥
এইকথা আমার পিতার কাছে বল্য।
তোমার সাধের কন্যা শশিমুখী মল্য॥
কান্দিলে প্রবোধ কর‍্য বুঝায়্যা সাদরে।
গিয়াছে তোমার কন্যা শ্বশুরের ঘরে॥
কন্যা লইয়া চিরদিন কেবা করে ঘর।
আপনার কন্যা যেবা সেহ হয় পর॥

(বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়: দীনেশ সেন)

গুরুকে এই কথা বলিয়া বিদায় নিয়া রাজকন্যা সখীসোণা কোটালপুত্র স্বামীর সহিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

এই খবর রাজবাড়ী পৌছিলে রাজপুরীর সকলে সখীসোণার শোকে অধীর হইল।

ধূলায় লোটায়্যা কান্দে এক শত রাণী।
গড়াগড়ি চলিল কঙ্কন বুকে হানি॥
ঘোড়া-শালে ঘোড়া কান্দে হাতিশালে হাতী।
মৃগ পক্ষী ভুজঙ্গ ধরিতে নারে ছাতি॥

(বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়: ২য় খণ্ড: দীনেশ সেন)

রাজকন্যা রাজ্যত্যাগ করিবার সময় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পথে বৎসহীনা গাভীর দর্শনে তাঁহার মন মায়েদের কথা মনে করিয়া আকুল হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

শতেক মাএর আমি অঞ্চলার নড়ি।
আমি হৈতে মা সব হইল আঁটকুড়ি॥

(বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়: ২য় খণ্ড: দীনেশ সেন)

এই গাথাটির মাঝে মাঝেই রচয়িতা ফকীররামের ভণিতা আছে। কবির রাজকন্যার রূপ বর্ণনায় বৈষ্ণব কবির প্রভাব লক্ষিত হয়।

এইভাবে পথে যাইতে যাইতে রাজকন্যা শশিমুখী ও কোটালপুত্র অনেক বিপদের মধ্যে পড়িলেন এবং সখীসোনার বুদ্ধিমত্তা ও সতীত্বের জোরে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে উভয়ের পুনরায় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন ও মিলনে গাথার সমাপ্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠ স্থানে স্থানে একান্ত দুর্বোধ্য, তবে পুঁথিপাঠে মোটামুটি ধারণা করা যায় যে, এই পুঁথিতেও ঐ একই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত গাথার অধিকাংশেই রচয়িতার নাম ভণিতায় মিলিতেছে। তবে গাথান্তর্গত কাহিনীগুলির সঠিক উৎপত্তির সময় নিরূপিত না হইলে এই লিপিকারেরাই যে গাথাটির প্রকৃত রচয়িতা এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। কাহিনীগুলি গাথার আকারে বহুদিন হইতেই গ্রামাঞ্চলে সুবিদিত ছিল এবং সেই কাহিনীগুলিকে লইয়াই পরবর্তী কবি অথবা গায়েনগণ আপন আপন ভণিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

৩। **মধুমালতী**—রচয়িতা সৈয়দ হামজা।

"সৈয়দ হামজার 'মধুমালতী' প্রকৃত প্রস্তাবে দোভাষী (বিদেশী ভাষা মিশ্রিত) পুঁথি নহে। এই রচনায় আরবী-পারসী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। আধুনিক যুগ।—মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান)। সৈয়দ হামজা-রচিত "মধুমালতী" কাহিনীর সহিত পূর্বোক্ত পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত "মধুমালা ও মদনকুমার" কাহিনীর বিশেষ পার্থক্য নাই। সৈয়দ হামজা রচিত 'মধুমালতী'র উপাখ্যানও অবাস্তর এবং রোমান্টিক রসাশ্রিত। এই রচনাটিতে সামাজিক রীতিনীতি ও বাঙ্গালী জীবনের বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা বিচিত্র পয়ার ছন্দে রচিত। এখানে রাজ্যের নাম কিংকর-নগরী, রাজার নাম সূর্যভান, রাজপুত্রের নাম মনুহর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কন্যার নাম মধুমালতী। এই রচনাটিতে মালতীর মাতা রূপমঞ্জুরী-চরিত্রটি অতিরিক্ত সংযোজনা। এই কাহিনীতে রূপমঞ্জুরীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মনুহর এবং মালতীর পরিণয়ে রচনাটি সমাপ্ত। নূতনত্ব বর্জিত বলিয়া কাহিনীটির বিস্তারিত পরিচয় দিলাম না।

৪। **চন্দ্রাবলী-বিশ্বকেতু**—রচয়িতা দ্বিজ পশুপতি।

শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার "ইসলামী বাংলা সাহিত্য" গ্রন্থে এই কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন (পৃঃ ৩৪—৩৯)। রচনাটি বৃহৎ।

কনকানগর রাজ্যের রাজা অশ্বকেতুর পুত্র বিশ্বকেতু "বিয়াল্লিশ সুরের গীত" শিখিবার ইচ্ছায় মৃগয়ায় বাহির হইল। বনের মধ্যে ইন্দ্রশাপে হরিণীদশা প্রাপ্তা রত্নপুরের চন্দ্রসেন কন্যা চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া সে তাহার পিছনে ছুটিল। হরিণী পথিমধ্যে কামসরোবরে ডুব দিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিতা হইলে, রাজপুত্র তাহাকে পাইবার আশায় সরোবরতীরেই রহিয়া গেল। অতঃপর চন্দ্রাবলী-প্রদত্ত অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া তাহার খোঁজে বিশ্বকেতু রত্নপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথে 'বিয়াল্লিশ সুরের গান' শিখিয়া ও বহু বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া, বহু পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া অবশেষে রাজপুত্র চন্দ্রাবলীকে পাইল। দুইজনের বিবাহ হইল। পথে রাজপুত্র আর এক দেশের রাজকন্যা চিত্রমালাকে রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল এবং রাজকন্যার পিতার ইচ্ছায় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। এখন চন্দ্রাবলী ও চিত্রমালাকে লইয়া রাজপুত্র স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

৫। **মাধবানল-কামকন্দলা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

বাংলায় লিখিত কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই গাথা মুখে মুখে সুপ্রচলিত ছিল। পুষ্পবতীর রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পুষ্পবটু মাধবানল ও কামাবতীর রাজসভার মুখ্য নটী কামকন্দলার প্রণয় কাহিনী লইয়া গাথাটি রচিত। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেনের "ইসলামী বাংলা সাহিত্যে" গাথাটির বিস্তৃত কাহিনী বিবৃতি হইয়াছে (পৃঃ ১০—১২)। কাহিনী গতানুগতিক, নায়ক-নায়িকার মিলনে সমাপ্ত। রাজা বিক্রমাদিত্য কাহিনীর অন্তর্গত একটি চরিত্র এবং তাঁহারই মধ্যস্থতায় মাধবানল ও কামকন্দলার বিবাহ হইল। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছু নাই বলিয়াই মনে হয়, গল্পের খাতিরেই বিক্রমাদিত্যকে টানা হইয়াছে। তবে তাঁহার নামোল্লেখ হইতে অনুমিত হয় যে, গাথাটি তাঁহার রাজত্বের সমসাময়িক অথবা সামান্য পরবর্তী কালেই রচিত হইয়াছিল এবং লোকমুখে প্রচার লাভ করিতে করিতে কাহিনীটি সমস্ত আর্যাবর্তে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত উপরোক্ত গাথাগুলির বিস্তৃত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত গাথাগুলির তুলনায় এইগুলি বহুলাংশে নিষ্প্রভ এবং গাথাকাব্যের লক্ষণও এগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম।

।গ। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রণয় গাথা ঃ

পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য মুসলমান কবিগণরচিত কেচ্ছা গাথাগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এই রচনাগুলিতে গাথাকাব্যের সর্ব লক্ষণ পরিস্ফুট না হইলেও, কাহিনীগুলি যে বিভিন্ন গাথাকাব্যের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত তাহা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"আরিফের 'লালমোহনের কথা' সখীসোনা (বা শশিসোণা) কাহিনীরই ইসলামী রূপান্তর" (ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ২য় সং ঃ ১ম খণ্ড)।

শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাঁহার "ইসলামী বাংলা সাহিত্যে" মোহাম্মদ ইউনুছের 'আবদুল আলী গারুলী ও নিবারণ সুন্দরীর পুঁথি' নামে কেচ্ছা গাথাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন (পৃঃ ১৫৫—১৫৯)। অলৌকিক, অবাস্তব ঘটনার সমন্বয় এবং মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের গুণ প্রদর্শন গাথাটির বৈশিষ্ট্য।

মোয়াজ্জেম আলী রচিত 'ভেলুয়া সুন্দরার কাহিনী' এইরূপ একটি কেচ্ছাগাথা। ডঃ সুকুমার সেনের "ইসলামী বাংলা সাহিত্যে" আমরা এই গাথাটির পূর্ণ বিবরণ পাই (পৃঃ ৬০—৬৭)। কাহিনীটি পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত 'ভেলুয়া' কাহিনীর অনুরূপ। তবে মুসলমান কবি কাহিনাতে 'কালু ও গাজীর' মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই বলিয়া গাথাটিতে বাস্তবতা ক্ষুন্ন হইয়াছে।

"মধুমালা মদনকুমার"এর কাহিনী সুপ্রচলিত। এই কাহিনী লইয়া নানাবিধ রচনার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। সাহ জাবেদ আলি রচিত "ছহি রাজকন্যা মধুমালা ও মদনকুমার" এই কাহিনী লইয়া রচিত একটি কেচ্ছাগাথা। এই গাথাটি প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ। পুস্তকটিতে রচনাকারের নাম, ধাম নির্দেশিত হইয়াছে।

উপক্রমে কবি বলিতেছেন—

"উর্দ্দু কেতাব ভাই বাঙ্গালা করিতে॥
জিয়াদা বিস্তার কাম জানিবে মনেতে।
বাঙ্গালাতে মধুমালা করিতে সায়ের॥
হুবাহুব না হইবে হবে হের ফের।"

(পৃঃ ৪)

অথচ এই সময়ের বহু পূর্বেই কাহিনীটি বাংলাদেশের নিরক্ষর কবিদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং দক্ষিণারঞ্জনের ছাপা পুস্তকও ইহার পূর্বেই বাহির হইয়াছে।

প্রথমেই উর্দ্দু কেতাবের তর্জমা জানাইয়া দিয়া কবি আপন পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কাহিনীটি পূর্বোক্ত কাহিনীর অনুরূপ। রচনায় অমার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, নিরক্ষর গ্রাম্য কবিগণের রচনায় যাহা একেবারেই দুর্লভ। বহুবিধ রাগ, রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিপদী এবং পয়ার ছন্দে রচিত। মাঝে মাঝে তোটক ছন্দও আছে। মুসলমান কবি রচিত হইলেও মাঝে মাঝে হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখে অনুমান হয় তখনকার দিনে হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়েই উভয়ের শাস্ত্রপাঠ করিতে এবং তাহা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেন না। যেমন দণ্ডধরের সহরের বর্ণনা দিতে কবি বলিতেছেন—

"যেমন হাতেম ছিল এমন সহর।
কাঞ্চন সহরে ঘর সাহা দণ্ডধর।
বলি রাজা তার কাছে নাহি ছিল দাতা।
তাহার দানেতে নাহি উঠাইত মাথা।" ।—পৃঃ ৭।

পাত্র, পাত্রীকে হিন্দু, মুসলমান উভয় নামই দেওয়া হইয়াছে। যেমন,

"হেকমত সাহার বেটা সাহা দণ্ডধর॥
ওরফে আছিল নাম সাহা গজনফর।"

মুসলমানী ভাব ও উর্দ্দু ভাষার আধিক্য। এই কেচ্ছাটিতে মধুমালার একটি বারমাসী গীত পাওয়া যায়।

মোটের উপর কেচ্ছাগাথাটিতে নূতনত্ব কিছু নাই। মামুলী ঘটনার মামুলী বর্ণনা। কবিত্বের নিদর্শন বিশেষ কিছুই নাই।

এইরূপ আরও দুইটি কেচ্ছাগাথা, একটি মোহাম্মদ মুনশী রচিত 'কাঞ্চনমালার কেচ্ছা' ও অপরটি কুমিল্লানিবাসী কবি জিন্নাতালি রচিত 'কাঞ্চনমালা ও পিরুক সদাগরের পুঁথি'। দুইটি কেচ্ছাই উনবিংশ শতাব্দীর রচনা। এক সদাগর পুত্র ও ইন্দ্রসভার নর্তকী কাঞ্চনমালার প্রণয়কাহিনী এই কেচ্ছা দুইটির বর্ণিত বিষয়।

কেচ্ছাগাথাগুলিকে সার্থক রচনা বলা চলে না। তবে এই কেচ্ছাগাথাগুলি হইতে সেকালে প্রচলিত কিছু কিছু গাথাকাহিনীর গল্পগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়

ঐতিহাসিক গাথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্যকবিগণ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া ছোট-বড় নানা আকারের গাথা রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গাথা হইতে বাংলাদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও ধারণা জন্মায় না ইহা সত্য, কিন্তু যে সকল ঘটনা লইয়া গাথাগুলি রচিত, গ্রাম্যকবিগণের রচনার গুণে সেই সকল ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা এই সকল গাথাকাব্য হইতে যেরূপ জানা যায়, কোনও ইতিহাস পাঠেও ঘটনাগুলির তদ্রূপ সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভব নহে। এই সকল ঐতিহাসিক গাথাকাব্যের প্রধান গুণ এই যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা হওয়ায় এই সকল গাথার মাধ্যমে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অতিরঞ্জনের প্রভাব খুব কম। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত যে সকল গ্রাম্যকবির রচনা পাওয়া গিয়াছে, সেই সকল কবি হয় নিরক্ষর নতুবা সামান্য শিক্ষিত ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন নাই। তাই তাঁহাদের রচনায় উচ্চশিক্ষার কোনও স্পর্শ লাগে নাই। গ্রাম্যকবিগণ অতি সহজ, সরল ভাষায় এক একটি সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা (রাজনৈতিক অথবা প্রাকৃতিক যে সকল ঘটনা সমসাময়িক সমাজজীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিত) লইয়া এমন সব কাহিনী রচনা করিতেন যাহা গ্রাম্য গায়েনগণ কয়েকবার শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়া লইত এবং গ্রামে গ্রামে এই কাহিনীগুলি গাহিয়া বেড়াইত। ফলে, ইতিহাস পাঠ না করিয়াও সর্বসাধারণ ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকিত। ইহাই এই ঐতিহাসিক গাথাগুলির প্রধান গুণ। ঘটনাগুলির বর্ণনা পরম্পরাক্রমে রচিত হইয়া কাব্যগুলিকে একটি বিশিষ্ট কাহিনীর আকার দান করিত। কালক্রমে বহুমুখে প্রচারিত হইতে হইতে কোনও কবি রচিত ঐতিহাসিক গাথার মূলকাহিনী সত্যভ্রষ্ট হইয়া কিছু কিছু কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিত, স্থানে স্থানে ইহাও দেখা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখিতে পাই মূল কবি রচিত গাথার অন্তর্গত কাহিনীর কোনও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী অংশ

গায়েনদের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হইতে মূল রচনার সম্পূর্ণ কাহিনী কালক্রমে বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক গাথাকাব্যের এই ধরণের খণ্ডিত ভগ্নাংশের উল্লেখ স্থানে স্থানে পাই। পরবর্তী কালের স্বাক্ষর গ্রাম্যকবিগণ এই সমস্ত ভগ্নাংশগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মূল কাহিনী লিপিবদ্ধ না থাকায় অনেক স্থলেই এইরূপে একটি সার্থক গাথাকাব্যের মূল কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'মহীপালের গীত' নামক গাথাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজা মহীপাল নামক কোন এক বাস্তব অথবা কল্পিত রাজার অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া গ্রাম্যকবিগণ অনেক গাথাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এখানে সেখানে লোকমুখে, অথবা পুঁথিতে, পুস্তকে এখন তার দুই এক পংক্তির দেখা মেলে, কিন্তু সম্পূর্ণ কাহিনী আজও উদ্ধার করা যায় নাই। সম্ভবতঃ এই ধরণের রাজ অত্যাচার, জমিদার অত্যাচারমূলক কাহিনীগুলির প্রকাশ্য প্রচারে প্রতিবন্ধকতাই এই সমস্ত গাথাগুলির সম্পূর্ণ কাহিনীরূপ অবলুপ্ত হইবার কারণ। তবে এই সমস্ত ঐতিহাসিক গাথাগুলি যে লোকের মুখে মুখে গাথাকাব্যের আকারে গীত হইত তাহা অনুমান করা যায় এই সব গাথার রচনাভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া। এই সকল ঐতিহাসিক রচনার অধিকাংশের মধ্যেই গানের ধুয়া মেলে, ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কেবল কবিতার আকারে পাঠ না করিয়া এইগুলি গীত হইত এবং এইভাবেই আজ পর্যন্তও ইহাদের অস্তিত্ব টিকিয়া আছে। ঐতিহাসিক গাথার মধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত গ্রাম্যকবিগণ কর্তৃক রচিত সেগুলিতে গানের ধুয়া উল্লিখিত নাই। মনে হয় এই গাথাগুলি পাঠ্য গাথা হিসাবেই প্রচলিত ছিল। 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'কে ইহার একটি দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিক গাথাগুলি এইরূপে লোকমুখে প্রচার লাভ করিতে করিতে অনেক সময় ঐতিহাসিক সত্যভ্রষ্ট হইয়া যে মূল কাহিনী হইতে রূপান্তর লাভ করিত তাহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। ফলে, এই সমস্ত গাথা অনেক সময় কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার উপকরণ জোগাইত। বনবিষ্ণুপুরের দলমাদলের কাহিনী লইয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গাথা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত মারাঠাদিগের যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মদনদেবের অংশ গ্রহণ লইয়াই এই কাহিনী রচিত। বহুল প্রচারের ফলে এই কাহিনী কত বিভিন্ন রূপ লইয়াছে

তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। এইরূপে ঐতিহাসিক গাথাগুলি একদিকে যেমন সর্বসাধারণকে কোনও সত্যঘটনা সম্বন্ধে সম্যক অবগত হইবার বিশেষ সাহায্য করিত, অপরদিকে সেইরূপ বহুল প্রচারের ফলে বিকৃতরূপপ্রাপ্ত হইয়া অশিক্ষিত জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সহায়তা করিত।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নাঞ্চল হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক গাথাগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক গাথাগুলিতে আমরা ঘটনাবলীর প্রকৃত রূপ পাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাথাগুলি রচিত হইয়াছে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার উপর কল্পনার রং ফলাইয়া এবং ইহার ফলে এই শ্রেণীর গাথাগুলি হইতে ঘটনার প্রকৃত রূপ পাওয়া যায় না। প্রথমোক্ত গাথাগুলিকে 'বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক গাথা' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গাথাগুলিকে 'ঐতিহাসিক কাহিনীর ছায়াবলম্বনে রচিত গাথা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এখন দুই শ্রেণীর অন্তর্গত গাথাগুলিকে লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। যে সমস্ত খণ্ডিত গাথাংশ হইতে কাহিনীর সামান্য পরিচয়ও উদ্ধার করা সম্ভব নয় সেগুলিকে এখন আর গাথার অন্তর্ভুক্ত না করিয়া ছড়া নামে অভিহিত করাই সমীচীন।

। ক । প্রথম শ্রেণী—বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক গাথা :

নিম্নলিখিত গাথাগুলিকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, যেমন :—

। ১ । মহারাষ্ট্র পুরাণ, । ২ । হেষ্টিংসের রাস্তার গান, । ৩ । সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, । ৪ । বানভাসীর গান, । ৫ । মহীপালের গীত, ইত্যাদি।

এই সমস্ত গাথাগুলির ভিতর দিয়া ঘটনাগুলি একটি পূর্ণ কাহিনীর রূপ পাইয়াছে এবং এই রচনাগুলি ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া ঐতিহাসিক কাব্যের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কাহিনীগুলির বিস্তারিত আলোচনা এই মতবাদের সত্যতা নির্ধারণে সাহায্য করিবে।

১। **মহারাষ্ট্র পুরাণ**—রচয়িতা গঙ্গারাম।

ঐতিহাসিক গাথাকবিতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই মহারাষ্ট্র পুরাণ। সন, তারিখ নির্দেশিত ঐতিহাসিক গাথাকবিতাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রপুরাণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও মূল্যবানও বটে। এই গাথাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭৮৪ সংখ্যক পুঁথিসংখ্যাভুক্ত। পুঁথিটি মৈমনসিংহ অঞ্চলের। পুঁথিপ্রাপ্তি

সম্বন্ধে ব্যোমকেশ মুস্তাফী সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ত্রয়োদশ ভাগে (১৩১৩) জানাইয়াছেন।

"পুঁথিখানির নাম 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'। পুঁথির রচয়িতার নাম কবি গঙ্গারাম। পুরাণখানি কত বড়, কয় খণ্ডে বিভক্ত, তাহা কিছুই জানা যায় না। আমরা যে অংশটুকু পাইয়াছি, তাহা প্রথম কাণ্ড মাত্র। এই কাণ্ডের নাম 'ভাস্কর পরাভব'। পুঁথিখানির তারিখ শকাব্দা ১৬৭২ সন, ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ পৌষ, রোজ শনিবার। বাংলা ১১৬৪ সালে পলাসীর যুদ্ধ হয়; সুতরাং পুঁথিখানি পলাসীর যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্বে লেখা। লেখকের নাম নাই। ১৩১১ সালে ময়মনসিংহে যে শিল্প কৃষি-সাহিত্য প্রদর্শনী হইয়াছিল, 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সেই প্রদর্শনীতে এই পুঁথিখানি উপস্থিত করিয়াছিলেন।" পুঁথিখানি ১৩০৭ সালে কেদারনাথ মজুমদার মৈমনসিংহের অন্তর্গত ধারীশ্বর গ্রামের রজনীনাথ চৌধুরীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

মহারাষ্ট্র পুরাণকে ঠিক শ্রাব্যগাথা বলা যায় না, পুঁথিটিতে কোথাও সুরের নামোল্লেখ নাই। তবে ইহা পাঠ্যগাথা হিসাবে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ১১৪৮ সালে (১৭৪১ খৃষ্টাব্দে) আলীবর্দী খাঁ নবাবের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত প্রথম বাংলাদেশে আগমন করে। ভাস্করের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে এক বৎসরের মধ্যে বিদ্রোহ দমন হয়; পুঁথিটি লিখিত হয় ১১৫৮ সালে। সুতরাং প্রাপ্ত পুঁথিটির লেখক গঙ্গারাম স্বয়ং রচয়িতা হইলেও রচনাটি ঘটনার প্রায় সমসাময়িক কালেই রচিত হইয়াছিল, অতএব রচয়িতা যে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন একথা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কাব্যটি অসম পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। গাথান্তর্গত কাহিনীটি বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। ১১৪৯-৫০ সালে মারাঠা বর্গীদের পশ্চিমবঙ্গ লুণ্ঠন, আলীবর্দীর পরাভব ও অবশেষে কৌশলে মারাঠা নেতা ভাস্করের হত্যাসাধন মহারাষ্ট্র পুরাণে বর্ণিত কাহিনীর বিষয়। নামকরণে পুরাণের উল্লেখ আছে বলিয়াই বোধ হয় কবি পুরাণের অনুকরণে রচনাটি আরম্ভ করিয়াছেন:

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।
রাত্রদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥

*সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীঙ্গার কৌতুকে স্থির থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥
এত জদি পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
পাপের কারণে পৃথি ভার সহিতে নারে॥

তখন পৃথিবী ব্রহ্মার শরণ লইলে ব্রহ্মা উপায়স্বরূপ নন্দীকে পাঠাইলেন পৃথিবীতে গিয়া সাহু রাজার কণ্ঠে অধিষ্ঠান করিবার জন্য এবং তাহা হইতেই পরবর্তী ঘটনা ঘটিল, এইরূপ গৌড়চন্দ্রিকা দিয়া কবি কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। গাথাটির একটি কাণ্ডই পাওয়া গিয়াছে, যদিও এই একটি কাণ্ডেই আমরা একটি সম্পূর্ণ কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ পাই। গাথাটিকে আরও বড় করিবার ইচ্ছা ছিল, সেইজন্যই পুঁথিটির পুষ্পিকা অংশে উল্লিখিত হইয়াছে—"ইতি মহারাষ্ট্রী পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব।" অন্যথায় কাণ্ডের উল্লেখ থাকিত না।

গাথাটিতে কাহিনীটির যে রূপ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—ব্রহ্মার আদেশে নন্দী গিয়া সাহু-রাজার উপর ভর করিলে, সাহু-রাজা রঘু-রাজার মারফৎ বাদশাহের নিকট বাংলার চৌথ না দিবার কারণ জানিতে চাহিলে বাদশাহ সাহু-রাজাকে আপনি চৌথ আদায় করিবার হুকুম দিলেন। তখন সাহু-রাজা ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলায় চৌথ আদায় করিতে পাঠাইল। ভাস্কর নাগপুর হইয়া পঞ্চকোটের মধ্য দিয়া বর্ধমানে পৌঁছিল এবং সেখানে নবাবের শিবির অবরোধ করিল। বর্গী সৈন্য এইরূপে শিবিরের চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল, কিন্তু নবাবের প্রহরী সৈন্য কিছুই টের পাইল না। প্রভাতে নবাব সমস্ত অবগত হইয়া ভাস্করের কাছে উকিল পাঠাইলেন এবং জানিতে চাহিলেন বাঙ্গলার চৌথ তো বাদশাহের কাছ হইতে যায়, তাহার জন্য বাংলার উপর কিসের জুলুম। তখন ভাস্কর বাদশাহের আদেশ জানাইলে নবাব যখন সিপাহী জমাদারদিগকে চৌথ আদায় করিতে বলিলেন তখন তাহারা বলিল,

"আমরা যত লোকে মারিব বরগীকে
দেশে যেন আইস্‌তে নাহি পারে
বরগী সব মারিব দেশে আসিতে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে।"

শুনিয়া নবাব খুসী হইল। এই অবস্থা দেখিয়া ভাস্কর লুটপাটের হুকুম দিল। এইখানে কবি নবাবের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ
চতুর্দিকে বরগীর তরে রসদ না মিলএ।
কলার আইঠা যত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া।
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল।
বিষম বিপত্ত্য বড় বিপরীত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল।

বর্গীরা অবরোধ করিয়া এমন অবস্থাতেই ফেলিয়াছে যে, নবাবকেও বাধ্য হইয়া 'কলার আইঠা সিদ্ধ' খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া নবাব শিবির ত্যাগের হুকুম দিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে অপারগ বর্গী নবাব সৈন্যের পিছনে দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে চলিল। নবাব কাটোয়ায় পৌছিলে সেখানে সবাই খাদ্য পাইয়া বাঁচিল। এদিকে বর্গীর অত্যাচারে সকলে ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। বর্গীর অত্যাচারের এই কাহিনী গ্রাম্যকবি আন্তরিক আবেগের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ব্যোমকেশ মুস্তফী বলিয়াছেন, "ভাস্করের দ্বিতীয় আক্রমণে তাঁহা কর্তৃক গোব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও স্ত্রী হত্যার যেরূপ অবাধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়াই বোধ হয়।"† কিন্তু ১৩১৩ সালে কাহারও নিকট এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হইলেও, সাম্প্রতিক বিভিন্ন দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনার পরে কাহারও নিকট এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে না। পরন্তু গ্রাম্য কবির এই বিস্তারিত রচনার গুণে তথনকার বর্গীদের নৃশংসতার যে পরিচয় পাই, এখনকার অনেক শিক্ষিত, কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন কবিও সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির এইরূপ যথাযথরূপ ফুটাইয়া তুলিয়া ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে আপন আপন প্রতিভা নিয়োজিত করিতে সাহসী হইবেন কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। এই সমস্ত গ্রাম্যকবিদের রচনায় এমন একটা সহজ, স্বাচ্ছন্দ্য ভাব প্রকাশিত হয় যে, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর

† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৩ : ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২০৭।

অন্তর্গত ঘটনাগুলি যেন চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। বর্গীদের অত্যাচারের বিবরণ দিতে গিয়া কবি বলিতেছেন :—

তবে সব বরগী গ্রাম লুটিতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পলাএ পুঁথির ভার লইয়া
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি হুড়পি লইয়া।
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া যত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।

... ...

দশবিশ লোক আইসা পথে দাঁড়াইলা
তা সভারে সোধায়ে বরগী কোথায় দেখিলা।
তারা সবে বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই
লোকের পলান দেখিয়া আমরা পলাই।

বর্গী নামের এমনই ভীতি! চোখে না দেখিয়াও লোকমুখে শুনিয়াই লোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইতেছে। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে গ্রাম্যকবির ক্ষমতা প্রশংসনীয়। ফুঁটিসাকো নামক স্থানে নবাবের প্রচণ্ড আক্রমণে বর্গীরা পলাইল। পূর্ণিয়া ও পাটনা হইতে ফৌজ আসিয়া নবাবের শক্তিবৃদ্ধি করিলে নবাব কাটোয়ায় আসিল। অষ্টমীর রাত্রিতে প্রতিমা ফেলিয়া ভাস্কর পলাইতে বাধ্য হইল।

চৈত্র মাসে ভাস্কর আবার বাঙ্গলায় আসিল এবং বেশি করিয়া লুটপাট, অত্যাচার করিতে লাগিল। এইখানে কবি বর্গীদের অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা দিয়াছেন। এই সময়ে ভাস্কর লুঠের অপেক্ষা হত্যার মাত্রা বাড়াইয়া তুলিল। কবির পূর্বের বর্ণনা :—

কারু হাত কাটে কারু কাটে নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেএ- তার গলাএ॥

ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কবি পরিণামে বলিতেছেন :

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গোহত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল॥
হাজার হাজার পাপ করিল দুর্ম্মতি।
লোকের বিপত্য দেইখ্যা রুষিলা পার্ব্বতী॥

ভাস্কর কাটোয়াতে ও নবাব মনকরাতে ছাউনী করিল। বর্গীদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে নবাবকে কৌশলের আশ্রয় লইতে হইল। মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরাম ভাস্করের নিরাপত্তার জামীন হওয়াতে :

প্রথম বৈসাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে।

এবং

তুসরত্রি বৈসাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইলা নবাবের স্থানে॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুদ্ধ গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবে মিলিল॥

নবাব ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলে ভাস্কর বসিয়া রহিল। নবাবের বিলম্ব দেখিয়া ভাস্কর পণ্ডিত স্নান-পূজার জন্য উঠিলে :

মুস্তফা খাঁ বোলে চলো সবাই মিলা জাই।
দোপহরিতে আসিব নবাবের ঠাঁই॥
এতেক বুলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল॥
জেইমতে ভাস্কর ঘোড়াএ চড়িতে।
তলয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক মাথে॥

ভাস্কর নিধন হইল, তাহার সঙ্গীরাও নবাব সৈন্যের হাতে নিহত হইল। এইখানেই গঙ্গারামের কাহিনী সমাপ্ত। সামান্য দুটি একটি অপ্রধান ঘটনা ব্যতীত গঙ্গারামের কাহিনীর সহিত ইতিহাসের মিল আছে। গঙ্গারামের রচনায় যে সকল নামের উল্লেখ আছে তাহাও ইতিহাসোক্ত নামের সহিত মিলিয়া যায়। গঙ্গারামের কাব্যে যে দুটি-একটি অতিরিক্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ না থাকিলেও, সেগুলি গঙ্গারামের কল্পনাপ্রসূত মনে

করিবার কোনও কারণ নাই। ইতিহাস রচনাকালে এইরূপ তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে অনেক সময় অনুল্লেখ্য বিবেচনা করিয়া রচনায় স্থান দেওয়া হয় না।

২। **ঐতিহাসিক গান** (হেষ্টিংসের রাস্তার গান)—রচয়িতা মদনমোহন।

হেষ্টিংসের সময় কোম্পানী চণ্ডালগড় হইতে শালিখা পর্যন্ত যে দাঁড়া রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন এই গাথাটিতে তাহার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই কাহিনী লইয়া রচিত আর একটি গাথা বর্ধমান সাহিত্যসভার পুঁথি শ্রেণীভুক্ত। ইহার রচয়িতা দ্বিজ রাধামোহন, নিবাস আবদুলপুর। ইহার লিপিকাল ১২৭০ সাল, ইহা বর্ধমান সাহিত্য সভার ৪৯৬ সংখ্যক পুঁথি। দুইটি গাথারই বিষয়কাহিনী এক। মদনমোহন রচিত গাথাটি শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত "ঐতিহাসিক চিত্র—প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা"য় প্রকাশিত হয়। এই গাথাটি বিষ্ণুপুর হইতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন বাংলা পুঁথির ভিতর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৮৯৯, এপ্রিলে ইহা প্রকাশিত হয়, তখন প্রাপ্ত পুঁথিটিকে শতাধিক বর্ষের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইলে গাথাটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'রাস্তার গান' বিষয়ক দুইটি পুঁথিই বাঁকুড়া-বর্ধমানের গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত এবং কোম্পানীর তৈয়ারী রাস্তা এই অঞ্চল দিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলে সমসাময়িককালে রাস্তা নির্মাণের বিবরণ লইয়া রচিত গাথা সমাদৃত ছিল।

দুইটি গাথায় বর্ণিত কাহিনী এক হইলেও, ভাষা ও ছন্দ পৃথক। কিন্তু ভাবপ্রকাশের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

বাঙ্গালী জাতি ধর্মভীরু। বাঙ্গালী গ্রামবাসিগণের ধর্মভীরুতা ততোধিক। তাই কবি মদনমোহন রাস্তার গানের বর্ণনা দিতে গিয়া রঙ্কিনীদেবীর নাম লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন ঃ

> শুন শুন সর্বজন একমন হঞা।
> রঙ্কিনী যখন আইল জাঙ্গার বাহিঞা॥

এই রঙ্কিনীদেবী সম্পর্কে মেদিনীপুর অঞ্চলে নানারূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

"খড়্গাপুর থানার অন্তর্গত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গাপুর ষ্টেশনের নিকটবর্তী ইন্দা গ্রামে খড়্গেশ্বর নামে মহাদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে।

ইহার অনতিদূরে প্রসিদ্ধ জগন্নাথ রাস্তার পার্শ্বে পীর লোহানী সাহেব নামে এক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। পীর লোহানীর অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কাহিনী অদ্যাপি শ্রুত হওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান সমভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। পীর লোহানী সাহেবের আস্তানার অনতিদূরে একটি প্রাচীন ভগ্নমন্দির দৃষ্ট হয়। লোকে ইহাকে রঙ্কিনীদেবার মন্দির বলে। কিন্তু মন্দিরে এক্ষণে কোন মূর্তি নাই। জনশ্রুতি, যখন ঐ মন্দিরে রঙ্কিনী দেবী ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার আহারের জন্য প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে সন্নিহিত প্রত্যেক গ্রামবাসী গৃহস্থকে একটি মনুষ্য প্রদান করিতে হইত। একদিন এক দুঃখিনী বিধবার পালা উপস্থিত হয়। বিধবার একটি অল্পবয়স্ক পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। পুত্রকে আহারের জন্য দেবীকে প্রদান করিতে হইবে, এই চিন্তায় দুঃখিনী জননী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দুঃখিনীর ক্রন্দনে মর্মাহত হইয়া পরদুঃখকাতর পীর লোহানী সাহেব বিধবার পুত্রের পরিবর্তে স্বয়ং দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেবীর সহিত পীর সাহেবের যুদ্ধ হইলে দেবী পরাস্ত হইয়া মন্দিরের চূড়া ভগ্নকরতঃ পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করেন। অতঃপর দেবী জঙ্গলভূমির নিবিড় কাননে প্রবেশ করিয়া এক রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন।……… রঙ্কিনীদেবী ও পীর লোহানী সাহেব-সংক্রান্ত নানাপ্রকার কাহিনী অদ্যাপি শ্রুত হয়।"

(মেদিনীপুরের ইতিহাস : যোগেশচন্দ্র বসু)

কবি মদনমোহন তাঁহার গাথায় রঙ্কিনীদেবীর এই পলায়নের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তবে রাস্তা নির্মাণের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক বোঝা গেল না। হয়তো ইহার পূর্বের অংশে সেসব বিবরণ ছিল। কালক্রমে তাহা লুপ্ত হইয়া দুইটি পংক্তি রহিয়া গিয়াছে।

অতঃপর মহারাজ চৈতন্যসিংহের সহিত যুদ্ধে হারিয়া গিয়া হেষ্টিংস চণ্ডালগড় হইতে পলাইলেন এইখান হইতে গাথার কাহিনী আরম্ভ। হেষ্টিংসের পলায়নের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন :

"চৈতন্য সিংহ মহারাজ বলে সর্বজন।
চলিলা তার সনেতে   চলিলা তার সনেতে,
রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল।
দেখরঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল॥

পালাল প্রাণ লইআ, পালাল প্রাণ লইআ,
সব ছাড়িআ কলিকাতা পঁহুছিল।
আট্‌কোচনের সাহেব মেলি, আট্‌কোচনের সাহেব মেলি,
রঙ্কিনী কহিল।"

এইভাবে পলায়ন করিয়া হেষ্টিংস সম্ভবতঃ অপমান বোধ করিলেন এবং প্রচুর সৈন্য নিয়া পুনরায় চৈতন্য সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তি করিয়া কোম্পানীকে চণ্ডালগড় হইতে শালিখাঘাট পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করাইবার হুকুম দিলেন।

এই রাস্তা নির্মাণের ধারাবাহিক বিবরণে যে সমস্ত অঞ্চলের নাম পাই সকলই ভৌগোলিক নাম। বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটে এই রাস্তার যে সীমানা পাই তাহার সহিত মদনমোহন বর্ণিত রাস্তার সীমানা হুবহু মিলিয়া যায়।*

গাথার বিবরণে পাই চণ্ডালগড়ে থানা করিয়া সেখান হইতে রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ করিয়া বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নয়ানজুলি, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, খাটুল (বর্তমান ঘাটাল), হরিপাল, ভূরশূট পরগণা, কাটরাজুলা হইয়া রাস্তাটি "শালিখাঘাটে উতরিল গিআ।" উপরোক্ত জায়গাগুলি বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়ার অন্তর্গত। তাহা হইলে রাস্তাটি এইসমস্ত জেলার উপর দিয়া গিয়াছে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। কবির বর্ণনা কৌশলে রাস্তাটির একটি পূর্ণাবয়ব খসড়া যেন অনুমান করিয়া লওয়া যায়। কাহিনী কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নহে, কিন্তু রচনার গুণে বর্ণনাটি একটি নিরেট কাহিনীর রূপ

* "The old Military Grand Trunk Road from Calcutta to the North West enters Bankura from Burdwan, and traversing the Southern half of the district runs in a north-westerly direction south of and nearly parallel to the Dhalkishor and enters the Manbhum district near the village of Raghunathpur, passing on its way through ***Katalpur, Bishnupur, Onda, Bankura and Chhatra.*** This road is now divided into three sections viz., part of the Bishnupur-Howrah road, part of the Raniganj-Midnapur road and part of the Bankura-Raghunathpur road. Formerly the section from Bankura to Bishnupur was much used by pilgrims on their way to the great temple of Jagannath at Puri".—(Bankura District Gazetteer).

গ্রহণ করিয়াছে। রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্যে বেগার ধরিয়া খাটানো হইয়াছিল। দ্বিজ রাধামোহনের রচনায় তাহাদের দুর্দশার বর্ণনাটি চমৎকার :

ফেলাএ লাঁগল মাঠে
ফেলাএ লাঁগল মাঠে পালায় ছুটে· যত চাষীগণ
বেগার ধরিতে আইল কত শত জন।
যেন চৈত মাসে
যেন চৈত মাসে ভক্ত্যা—ধরা
ব্যাপহারা যেদিকে যাকে পায়
হাতে বেঁদে গোপ্তা মেরে রাস্তাতে খাটায়।
হাতে করে বেতের বাড়ি
হাতে করে বেতের বাড়ি তাড়াতাড়ি·মারে (সবার) পিঠে
বেতের ভয়ে যত কোড়া চতুর্দিকে ছুটে।

মদনমোহনের রচনায় রাস্তা নির্মাণোদ্দেশ্যে গাছ কাটার বর্ণনাটি সুন্দর :

পিয়া সাল কমলাগুড়ি, পিয়াসাল কমলাগুড়ি,
বোয়ের কুড়ি·আমড়া আসন সাল।
বয়ড়া আম্লী আর কদলী কাটিল বহু তাল॥
দুদিগে করে খালি, নয়ানজুলি মধ্যে কিছু মাটী।
আর প্রস্থে বার হাত·আধ হাত টাক্ মাটী॥
এড়ায়ে আম কত শত, এড়ায়ে আম কত শত,
কত শত কে করে গণন।
উচ নীচ কেট্যা পথুর গাবা সোজা কৈল্য গণ॥

এইরূপে পথে যাহাই পড়ে তাহাই ভাঙ্গিয়া, কাটিয়া, তছনছ করিয়া রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন কি,

ছামুতে যাহা পড়ে, ছামুতে যাহা পড়ে,
কাটে ছিঁড়ে গাছ পাথর আদি।
দেবতা পেলে ছুঁড়ে ফেলে পঞ্চানন আদি॥

অবশেষে শালিখাঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ শেষ হইলে,

আড়পার কলিকাতাতে, আড়পার কলিকাতাতে
নৌকা পথে গঙ্গা পার হল্য।
সহর দিয়া হুজুর হঞা কুর্ণিশ করিল॥

রাস্তা সমাপ্ত জানিয়া সাহেব আনন্দিত হইয়া 'পাঠাইল বহু সেনাগণ'। সেই নির্মিত রাস্তা দিয়া হেষ্টিংসের সৈন্যদল চৈতন্যসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিল। সর্বশেষে :

শ্রীগুরু ভাবিআ কহে মদনমোহন ॥
মেদিনীপুরে স্থিতি, মেদিনীপুরে স্থিতি,
হল্য ইতি রাস্তার কবিতা।
হরি হরি বল সভে ঘুচিবে ভবচিন্তা ॥

এই বলিয়া গান সমাপ্ত। মনে হয় মদনমোহন মেদিনীপুরের লোক ছিলেন, 'মেদিনীপুরে স্থিতি' বলিয়া তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

দুইটি রচনাতেই গাথার একটি প্রধান লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তাহা একই বাক্যের পুনরুক্তি। শব্দ বা বাক্যের এই পুনরুক্তি হইতেই বোঝা যায় যে, এই গাথাটি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গীত হইত। দুইটি রচনারই ভাষা একেবারেই গ্রাম্য।

।৩। **গোরার গান**—রচয়িতা দ্বিজ দ্বারকানাথ।

এই গাথাটি 'পরিচয়' পত্রিকাতে আশ্বিন, ১৩৬০, তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশক বিনয় ঘোষ গাথাটির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"বীরভূম জেলার দুবরাজপুর চৌকীর কুখুটিয়া গ্রামের দ্বিজ দ্বারকানাথ ১২৮০ সালের (বাংলা) ৯ই ভাদ্র তারিখে একটি কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন। ইংরেজ সৈন্য বীরভূম জেলার ভিতর দিয়ে গন্তব্যস্থানে যাত্রা করবে, তার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও ভীতির সঞ্চার হয়েছে—এই হল কাহিনীকাব্যটির প্রতিপাদ্য বিষয়। সিউড়ীর 'রতন লাইব্রেরী'র পুঁথিশালায় কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত ছিল। প্রীতিভাজন শ্রীঅমলেন্দু মিত্রের আন্তরিক চেষ্টার ফলে কবিতাটি উদ্ধার করেছি।" । পৃঃ ১৮১।

প্রকাশক আবারও বলিতেছেন :

"বোধহয় বাল্যকালের অবিস্মরণীয় স্মৃতিকেই গ্রাম্যকবি শেষজীবনে গ্রাম্য ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। কবির ঢঙে ছন্দে গেঁথে করেছিলেন, কারণ ছন্দোবদ্ধ কবিতা, কাহিনীকাব্য, পাঁচালি ও ছড়ার আবেদন বেশি গ্রামের জনসাধারণের কাছে। কবিতা তাঁর ছাপা হয়নি, পাঠকও তাঁর ছিল না। শ্রোতা ছিল, আর গ্রাম্য কবিয়ালদের মতন তাঁর আবৃত্তি করার ক্ষমতা ছিল। কবিয়ালের

দেশ বীরভূম, সুতরাং দেশীয় ঐতিহ্য বর্জন করে জনসাধারণের সম্মুখীন হতে দ্বারকানাথ ভরসা পাননি। তাই কবিয়ালের ঢঙেই তিনি তাঁর শ্রোতাদের জন্য (পাঠকদের নয়, পাঠকরা মনে রাখবেন) "গোরার কবিতা" রচনা করেছিলেন।" (পৃঃ ১৮৩)

গাথাটির ঐতিহাসিক পটভূমিকা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাংলা ১১৭৬, ইংরাজী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশেযে ভয়াবহ মন্বন্তর হইয়াছিল তাহাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামেপ্রসিদ্ধ। মন্বন্তর-পীড়িত কৃষকগণকে লইয়া কোম্পানী ছিনিমিনি খেলিতে শুরু করেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। জমিদারদের সহিত জমির পাঁচশালা, দশশালা, অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এই বন্দোবস্ত তখন কে গ্রহণ করিবে, বাংলার গ্রাম তখন শ্মশান, কৃষকরা মৃত, অর্ধমৃত, যাযাবর। রাজস্ব বাকীর দায়ে বনেদী জমিদারগণও নির্যাতিত। ইংরাজ আমলে দালালগণ নিলামে জমিদারী কিনিয়া নূতন জমিদার হইতে লাগিলেন এবং এই সব হঠাৎ জমিদারদের দাপট প্রচণ্ড ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই মৃত ও পলাতক। পরিত্যক্ত গ্রাম ক্রমে গভীর জঙ্গলে পরিণত হইল। পশ্চিমবঙ্গে, বীরভূম, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এই সময় বন্যজন্তুর উপদ্রব এত বাড়ে যে ইংরাজ সরকার বাঘ শিকারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। বীরভূম জেলার ভিতর দিয়াই বাংলার প্রাচীন ঐতিহাসিক পথগুলির অন্যতম পথ দেশ-বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। 'হেষ্টিংসের রাস্তার গান' আলোচনা প্রসঙ্গেও ইহা বলিয়াছি। এই পথেই যুগে যুগে ইতিহাসের উত্থান-পতনের পদধ্বনি শোনা গিয়াছে। এই পথে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে একদল ইংরাজ সিপাহীর যাত্রা বর্ণনা করিয়া হিকি সাহেব লিখিয়াছিলেন—"প্রায় ১২০ মাইল সুদীর্ঘ পথ সিপাহীরা অতিক্রম করে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কোথাও কোন লোকালয়ের চিহ্ন নেই। মধ্যে মধ্যে এক একটি ছোট গ্রাম হঠাৎ নজরে পড়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে, কিন্তু তার পরিপার্শ্বের উন্মুক্ত মাঠ বা আবাদী জমি এত সঙ্কীর্ণ যে, সেখানে মাত্র দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্যেরও তাঁবু ফেলার স্থান হয় না। জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুকের উপদ্রব অত্যন্ত বেশী" (হিকির গেজেট, কলিকাতা ২৯শে এপ্রিল, ১৭৮০)।

এই পথ দিয়াই ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আর একদল ফৌজ যাত্রা করে। এই কয়েক বৎসরের ব্যবধানে রাস্তাটির বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। অতএব, গোরাদিগের (ইংরাজ ফৌজ) যাত্রাপথ

সুগম করিবার জন্য শাসকগণের হুকুমে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করিবার ও গোরাদের খাবার যোগাইবার জন্য গ্রামবাসীদের ডাক পড়িল। এই সমস্ত তথ্যই ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপরোক্ত ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়াই আলোচ্য গাথাটি রচিত। গাথাটি রচিত হয় ১২৮০ সালে এবং ঘটনাটি ঘটে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং ঘটনাটি ঘটিবার প্রায় ৫৮ বৎসর পরে গাথাটি রচিত। এই হিসাবে কবিকে প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়।

গাথাটির আরম্ভেই বোঝা যায় যে ইহা শুনিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল, পাঠ করিবার জন্য নহে। গায়েনগণের পালা শুরুর ভঙ্গীতে গাথাটি আরম্ভ :

শুন সবে একভাবে বিপত্তের কাজ
জেন মতে লড়াই দিতে সাজিল ইংরাজ।
থাকে সব বরমপুরে ফোদ (কোর্ট) জুড়ে কি দিব তুলনা
এক এক গোরার পেছু সেপাই তিনজনা।

এইরূপ নয়শত গোরা সৈন্য :

জাবে সব পছিমেতে আচম্বিতে আইল পরয়ানা।
জমিদার লোক স্বনে করিছে ভাবনা।
তারিখ সন ১২২১ সালে অর্ধেক পৌষমাস
আচম্বিতে স্বনে লোকের লাগিল তরাস।

ফৌজ আসিতেছে শুনিয়া সকলেই ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল :

বলে ভাই পড়ল দায়, হায় হায়, রৈইতে'নারি ঘরে
গরু জরু সকল লয়ে পালাও দেশান্তরে।
পালায় সব কলু মালি তিলি তামলী মনে পেয়ে ভয়
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কপাট দিয়ে রয়।

কিন্তু এত সাবধান হইয়াও নিস্তার নাই :

জমিদার গ্রামে গ্রামে পেয়াদালয়ে আনে মণ্ডল ধরি
খাবার খোর দানা দাও বেট আর বেগারি।

ফৌজের সৈন্যগণের বিবিধ প্রয়োজন মিটাইতে মিটাইতে গ্রামবাসী অস্থির হইয়া পড়িল। আপত্তি করিলেই শাস্তি :

"ইজাদার কৈছে তারে মাছের তরে ঘন লাড়ি মাথা
কেওট বলে এত জাড়ে মাছ পাব কোথা ?
শুনে উঠলো রেগে, মাছের লেগে রাখ বেটারে ধরে
দেখে দাপ্ বলে বাপ্, জালে লাগল গিরে।"

সৈন্যদলের এইরূপ অত্যাচারে সমস্ত লোকজন ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইল। এইখানে কবি একটি বেশ মজার কথা বলিয়াছেন :

"বৈরাগী কৈছে দেখ নবদ্বীপে হয়েছিল যে গোরা
নিস্তার করিল জীব শচীর কিশোরা।
দিয়ে হরি নাম কৈল ত্রাণ গৌরচন্দ্র রায়
এবে বিলাতী গোরার হাতে পাছে প্রাণ যায়।"

দিশী ও বিলাতী 'গোরা'-য় কত তফাৎ! উপরোক্ত ছত্রগুলিতে গ্রাম্য কবির স্থূল রসিকতার পরিচয় পাই।

এইরূপে পথে অত্যাচার করিতে করিতে ফৌজ আগাইয়া চলিল। বহরমপুর হইতে যাত্রা করিয়া বীরভূমের মধ্য দিয়া সিউড়ী আসিয়া পৌছিল। এবং,

আগাড়ীর ফৌজ সকল বয় শ্রীকৃষ্ণ নগরে
বীণা বাঁশী যন্ত্র রাশি আসিছে ভারে ভারে।

এইরূপে অবিরত অনেক ফৌজ আসিয়া সিউড়ীতে তাঁবু গাড়িল এবং হৈ-হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়া গ্রামবাসিগণের ত্রাসসঞ্চার করিয়া সেখানে রহিয়া গেল।

বাজিছে জগঝম্প মহিকম্প বাদ্যের বাখান
দুই ভিতে দুই ছড়ি হাতে ফিরিছে কাপ্তান।
যত সব ফোজের গুলি কহি শুনি কিছু-মাত্র সীমা
ফোজ দেখিতে শোক পেয়েছে কুখুটার নিমা।
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথ কুখুটাতে যাহার নিবাস
ফোজের কবিতা কৈল হইয়া উল্লাস॥"

গাথাটি এইখানেই সমাপ্ত। গ্রাম্যভাষা ও অসম পয়ারছন্দে গাথাটি রচিত।

আলোচ্য গাথাটি সর্বপ্রথম 'বীরভূমি' মাসিক পত্রিকার ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শিবরতন মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। (পৃঃ ২২১)।

৪। **বানভাসীর গান—রচয়িতা নফর দাস।**

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিয়াছিল তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া গ্রাম্যকবিগণ বহু গান ও ছড়া রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভূমিকম্প, প্লাবন ইত্যাদি লইয়া রচিত এইরূপ অনেক বড় ছড়া ও গান বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত সংগ্রহের অধিকাংশেই কোনও পূর্ণ কাহিনীর রূপ পাই না। কাজে কাজেই এইগুলিকে গাথা আখ্যা দেওয়া যায় না।

প্রবাসী পত্রিকার, ১৩২০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় শিবরতন মিত্র দামোদরের বান লইয়া রচিত একটি গাথার পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। মিত্র মহাশয় উল্লিখিত 'বান ভাসীর গান'-এ দামোদর নদের বানের ধ্বংসলীলার একটি পূর্ণ কাহিনী পাই। গানটির রচনাভঙ্গীতেও গাথাকাব্যের বৈশিষ্ট্য মিলে।

"নদী সে দামোদরে, বড়াকরে, করছে আনাগোনা।
দুধার মিশায়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা॥
এল বান পঞ্চকোটে—
এল বান পঞ্চকোটে, নিলেক লুটে, ভাঙ্গলো রাজার গড়।"

এই রূপে আগাগোড়া গানটিতে একই কথার পুনঃপুনঃ প্রয়োগ গাথার বিশিষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। গাথাটি ১২৩০ সালের দামোদরের বান লইয়া রচিত। এই সময় পঞ্চকোট হইতে অম্বিকার ঘাট পর্যন্ত দামোদর নদের যে দেশপ্লাবী প্রবল বন্যা হইয়াছিল, তাহা পল্লীকবির রচনায় একটি পূর্ণ কাহিনীর রূপ লইয়াছে। প্রবল বন্যার যথাযথ রূপ বর্ণনা করা প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই সম্ভব। দামোদর নদের বান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই নদে বান ডাকিয়া বছরে বছরে মানুষকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন সালের বান লইয়া বিভিন্ন কবির রচনা পাওয়া যায়।

আলোচ্য গাথাটি ১২৩০ সালের কিছু পরেই রচিত বলিয়া মনে হয়। প্রকাশক বলিতেছেন, "নব্বই বৎসর পূর্বে রচিত পল্লীকবির এই ছড়া বা গান এখনও স্থানে স্থানে লোকমুখে রক্ষিত হইয়া বর্ণিত ঘটনার জীবন্ত সাক্ষ্যরূপে বর্তমান রহিয়াছে। অন্যান্য ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার রচিত আরও ছড়া বা গান এখন লোকমুখে প্রচলিত আছে।" ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কবির রচনাশক্তি বেশ ভালই ছিল। গাথাটি আগাগোড়াই গ্রাম্যভাষায় রচিত।

বন্যার একটি ধারাবাহিক বিবরণ ইহা হইতে মেলে। বান পঞ্চকোটে আসিয়া "হুড় হুড় শব্দে ভাঙ্গে পর্বত পাথর"। তারপর নদী, নালা পার হইয়া বানের জল আসিয়া দামোদরে মিলিল। কিন্তু নদীতে কতই আর জল ধরিবে—

"ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া—

ভাঙ্গলো আদগাঁ ভাড়া, গোপের পাড়া ভাঙ্গলো বাবইজোড়।

তারপর ভাঙ্গিল যে নপুর বল্লভপুর।"

এইরূপে গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া, ধানের গোলা ডুবাইয়া 'চললো বান যোজন জুড়ে'। "তারপর! ভাঙ্গিল গেয়ে পুবরা মদনপুর।" এততেও সাধ মিটিল না। বান তখন পূর্বমুখে চলিয়া কাঞ্চন নগর ভাসাইয়া 'বাবুদের কাঠের গোলাতে' প্রবেশ করিল। তারপর বাঁকা নদীর সহিত মিশিয়া আরও বর্ধিত কলেবর হইয়া বানের জল বর্ধমান শহর ভাসাইল। বন্যার সময় বর্ধমান শহরের দৃশ্যটি কবি এক কথায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"বাজারে নৌকা চলে—

বাজারে নৌকাচলে, কুতূহলে, প্রলয় দেখি বান।

যে যেখানে আছে পলায় ছাড়ি বর্ধমান॥"

ইহার পর রাণীর হাটা, দালান কোঠা, জজসাহেবের কুঠি, রাজবাড়ি সমস্ত ভাসাইয়া— এবারে বান বাহির হলো—

এবারে বান বাহির হলো, রাত পোহালো

চললো মাঠে মাঠে।

গঙ্গায় মিশায় বান অম্বিকার ঘাটে॥

এইরূপে, বারশ ত্রিশ শালে—

বারশ ত্রিশ শালে, বরষা কালে ভাঙ্গলো

নফর দাস।

কেউ হলো পাতুড়ে রাজা—কারো সর্বনাশ॥

গাথাটিতে কবিত্বগুণ বিশেষ কিছু নাই, তবে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নহে।

গাথাটি 'বীরভূমি'র দ্বিতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যাতেও প্রকাশক কর্তৃক সমগ্র আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অংশবিশেষ আব্দুল করিম সাহেবের প্রাচীন পুঁথির বিবরণ—প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৫ম ভাগ, ১ম সংখ্যার ৭৩ পৃষ্ঠায় ১০৭২ সালের দামোদরের বন্যা সম্বন্ধে

রচিত কয়েকটি ছত্রমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ দীনেশ সেন তাঁহার বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৩৮০) দামোদরের বন্যা লইয়া রচিত একটি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন। উপরোক্ত গাথার সহিত ইহার মিল আছে। আলোচ্য গাথাটি "ছাওয়াল গাএন" অর্থাৎ কোনও তরুণবয়স্ক ধর্মোপাসক কর্তৃক ১৬৭৩ সালে বিরচিত। কবির নাম পাওয়া যায় নাই। পুঁথিখানি ১২ পাতায় সম্পূর্ণ। উপরোক্ত গাথাটি আলোচ্য গাথাটির অংশ বিশেষ বলিয়া মনে হয়। শোনা যায় উপরোক্ত গাথাটির রচয়িতা ভাঙ্গামোড়া নিবাসী অনিরুদ্ধ গুপ্ত (সাঃ পঃ পঃ—পৃঃ ৭৩)। উভয় গাথারই আরম্ভ ও শেষ শ্লোক দুইটি এক এবং উভয়কাহিনীই ১০৭২ সালের দামোদরের বন্যা লইয়া রচিত।

।৫। **মহীপালের গীত**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

সেকালের রাজারাজড়া ও জমিদারগণকে লইয়া পল্লীকবিগণ ছোট-বড় নানা আকারের গাথা রচনা করিতেন। কিন্তু যে সকল গাথাকাব্যে রাজা বা জমিদারগণের অত্যাচারমূলক কাহিনী বিবৃত হইত অনিবার্যকারণে সেগুলির প্রচার লোকমুখে বিস্তার লাভ করিতে পারিত না এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজা মহীপালকে লইয়া যে সমস্ত গান রচিত হইয়াছিল এই কারণেই সেগুলি আজ একেবারেই অবলুপ্ত হইয়াছে। অথচ মহীপালের গানগুলি রচিত হইবার বহু শতাব্দী পরেও যে তাহাদের বিক্ষিপ্ত অংশবিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাস রচিত (১৫৭২ খৃঃ) চৈতন্য-ভাগবতে। 'ধান ভাঙ্গতে মহীপালের গীত' এই প্রচলিত প্রবাদটির ভিতরও এই গানটির প্রতি সাধারণের অনুরাগের আভাস পাওয়া যাইতেছে। 'মহীপালের গীত'-এর সম্পূর্ণ অংশ কোথাও পাওয়া যায় নাই, সেজন্য এই গাথার অন্তর্গত কাহিনীর পূর্ণ রূপ উদ্ধার করা আজ আর সম্ভব নয়।

ডঃ দীনেশ সেন তাঁহার 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র সংকলনে এইরূপ একটি গাথার সামান্য অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সামান্য অংশ হইতে কোনও কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব নয়, কিন্তু গাথাটির এই সামান্য অংশ হইতেও রাজা মহীপালের অত্যাচার সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লওয়া যায়।

ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন—"এই পালাগানটি রঙ্গপুর অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল। পালবংশের দশম শতাব্দীর সুবিখ্যাত মহীপালকে লইয়া এই পালা

রচিত। পালাটির বর্ণনা একেবারে অবিশ্বাস না করিলে বলিতে হইবে প্রথম মহীপালের জীবনের ইতিহাস-পরিত্যক্ত কোন অংশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে।"

কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রথম মহীপাল অপেক্ষা দ্বিতীয় মহীপালই অধিকতর অত্যাচারী রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় আনুমানিক ১০৭৫ খৃঃ হইতে। ডঃ দীনেশ সেন এই গাথাটিকে পালবংশের প্রথম মহীপালের জীবনের ইতিহাস-পরিত্যক্ত অংশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু এই গানগুলি দ্বিতীয় মহীপাল-এর জীবন লইয়া রচিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকাল শেষ হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে বৃন্দাবন দাসের উক্তিতে আমরা গানগুলি সম্বন্ধে লিখিত ইঙ্গিত পাই। মহীপালের জীবিতকালে তাঁহার অত্যাচারমূলক কাহিনী লইয়া গাথা রচনা করিবার সাহস নিশ্চয়ই কাহারও হইতে পারে না। তাহা হইলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এই সকল গান রচিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তখনকার রচনার অকৃত্রিম রূপ আজ আর কোনও মতেই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। লোকমুখে প্রচলিত হইতে হইতে পরিবর্তিত হইয়া ইহা কালোপযোগী ভাষা ও ভাব পরিগ্রহ করিয়াছে, ডঃ দীনেশ সেনের সংগৃহীত গাথাটি পাঠ করিলেই তাহা বোঝা যায়। এই লিখিত রচনাটির ভাব ও ভাষা কিছুতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বের হইতে পারে না। তবে 'মহীপালের গান'-এর প্রথম রচনাকাল যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং ইহাতেই অনুমান করা যায় যে, গাথার উৎপত্তিকাল বহু প্রাচীন। অতএব ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা গাথাকাব্যের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, ডঃ দীনেশ সেনের এই উক্তিকে একেবারেই অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে ডঃ সেন যে দাবী করিয়াছেন তাঁহার প্রকাশিত গাথাগুলির কোন কোনটি ঐ সময়ের রচনা ইহা একেবারেই ভ্রান্ত, প্রকাশিত গাথাগুলির ভাব ও ভাষাই তাহার প্রধান প্রমাণ।

'মহীপালের গান'-এর যে অংশটুকু আমরা ডঃ দীনেশ সেন প্রকাশিত সংগ্রহে পাই তাহার কাহিনীঅংশ এইরূপ—

মহীপাল রাজা কর্তৃক খনিত দীঘিতে স্নান করিতে যাইবে বলিয়া লীলা সাজসজ্জা করিতেছে—

চুয়া চুয়ে বাট্যারে লীলা বাসর কোটারা ভরে।
আমলা মতি বাঁট্যারে লীলা আবের কোটারা ভরে॥

লীলা গ্রাম্যবালা। তাহার উপর মহীপাল রাজার অত্যাচারের বিষয় লইয়াই এই গাথাটি রচিত হইয়াছিল তাহা এই সামান্য অংশ হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। 'রঙ্গপুরের বিশাল মহীপাল-দীর্ঘিকা এখনও বর্তমান। ইহা মহীপাল রাজার আদেশে খনিত হইয়াছিল।'

লীলার পিতামাতা তাহাকে দীঘিতে যাইতে মানা করিলেও—

বাপেরো মানা না শুনে লীলা চললো দীঘির ঘাটে।
মায়েরো মানা না শুনে লীলা চললো দীঘির ঘাটে।

ইহার পরের বর্ণনা চিরাচরিত পালাগানের বর্ণনা। এই বর্ণনা আমরা আরও কয়েকটি গানে পাইয়াছি (ভেলুয়া দ্রষ্টব্য)—

হাটু পানিতে নাম্যারে লীলা হাটু মাঞ্জন করে।
মাজা পানিতে নাম্যারে লীলা গাও মাঞ্জন করে।
ইত্যাদি ....

এদিকে খবরিয়ার মুখে রাজা মহীপাল খবর পাইলেন যে, যে লীলার জন্য তিনি পাগল সেই লীলা ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছে।

মহীপাল রাজা অথবা রাজপ্রেরিত লোক তখন গিয়া লীলার জলে ভাসমান চুল ধরিয়া টানিলে লীলা কাঁদিতেছে—

কে ধরিল কে ধরিল আমার চুলের দুখে মল্যাম।
বাপের মানা না শুন্যা আমি দীঘির ঘাটে মল্যাম।
কলঙ্কিনী লীলা গো আমি কলঙ্কিনী হলাম।
মায়ের মানা না শুনে আমার সকল সম্মান গেল॥

রাজা দেশের রক্ষক। সেই রক্ষক যখন ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায় তখন দেশের কুলবধূদের কি চূড়ান্ত দুর্ভোগ ভুগিতে হয় এই সব গাথা তাহারই বর্ণনা দিয়াছে। এই ধরণের গাথাগুলি দেশের ইতিহাসের এক একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের প্রমাণ।

গাথাটি এই পর্যন্তই প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাংশ খুবই দুর্বল। পয়ার ছন্দের এক ভাঙ্গা বিকৃত রূপে গাথাটি রচিত। ছত্রের শেষে অনেক জায়গায় মিল নাই। মহীপালের সম্বন্ধে রচিত গাথাগুলির অবিকৃত রূপ লুপ্ত হইয়া না গেলে বাংলার ইতিহাস লাভবান হইত ইহা বলাই বাহুল্য।

।৬। **সাঁওতাল বিদ্রোহের গান**—রাইকৃষ্ণ দাস।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহ লইয়া রচিত একটি গাথা গৌরীহর মিত্রের "বীরভূমের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)"-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে পুঁথিটি অবলম্বন করিয়া ইহা প্রকাশিত হয় তাহা সিউড়ী রতন লাইব্রেরীর ২০৯৬ সংখ্যক পুঁথি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। ইহার ভণিতাংশটুকু শুধু আবদুল করিম সাহেব তাঁহার পুঁথিবিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন। (বাং প্রাঃ পুঃ বি—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২৬৫ সংখ্যক পুঁথি). এই গাথাটি সর্বপ্রথম শিবরতন মিত্র কর্তৃক দ্বিতীয় বর্ষের 'বীরভূমি'র চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বীরভূমের ইতিহাস" প্রণেতা বলিয়াছেন যে, এই কবিতাটি একজন প্রত্যক্ষদর্শী গ্রাম্যকবির স্বহস্ত লিখিত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কবি স্বয়ং লোক মারফৎ এই কবিতাটি গ্রন্থকারের পিতা শিবরতন মিত্রের কাছে পাঠাইয়া দেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। গ্রাম্যকবি এই বিদ্রোহের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। ছন্দবহুল রচনাটি গীতোপযোগী। এই রচনাতে গাথাকাব্যের বৈশিষ্ট্য—এক কথার পুনরুক্তি—প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রয়োগ করিয়া কবি ইহাকে বিশিষ্ট গাথাকাব্যের রূপদান করিয়াছেন।

কাহিনীটিতে শুধু সাঁওতালগণের বিদ্রোহ ও তাহাদের অকথ্য অত্যাচারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্রোহের পরিণতির উল্লেখ কাহিনীটিতে নাই। রচনাকার সাঁওতালদের নির্মমতার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াও তাঁহার রচনাশেষে বলিয়াছেন :—

আমি ভাবি মোনে (২), সাঁওতালগণে রাখিলে জে যুক্ত্যাতি
জে কিছু লিখিলাম আমি সকলি ও সত্তি

সাঁওতালগণের একতা ও ধনিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের সুনিয়ন্ত্রিত অভিযানের পরিকল্পনাই কবির প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তাই সাঁওতালগণের এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে কবি সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের শোচনীয় পরাজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ না করিয়াই রচনা সমাপ্ত করিয়াছেন।

রচনাটি বৃহৎ। গ্রাম্যভাষার মাধ্যমে গীতচ্ছন্দে রচিত। গীত হইবার উদ্দেশ্যেই কবি ইহা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই

গ্রামাঞ্চলেও গাথার প্রচলন কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই রচনাকার ইহা গৌরীহর মিত্রের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গাথা কাব্যের কদর ক্রমশঃই যে কমিয়া যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়াই কবি আপন রচনা প্রচারের উদ্দেশ্যেই গৌরীহর বাবুর হস্তে তাহা দিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই গ্রামাঞ্চলে গাথাসমূহ লোকমুখে সুপ্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতেই ক্রমশ ইহার প্রচলন কমিতে কমিতে বর্তমান শতাব্দীতে ইহার প্রচলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। যন্ত্রের গান ও ছবিই এখন গ্রামবাসীদের নিকট অধিক আদরণীয়। তাই গ্রামাঞ্চল হইতে গাথা সংগ্রহ করা এখন একেবারেই অসম্ভব কার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছাপার অক্ষরে যে সমস্ত গাথা পাই তাহাই এখন আমাদের তখনকার সমাজ, ব্যক্তি ও গ্রাম্যজীবনের খুঁটিনাটি বিষয় জানিবার একমাত্র উপকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গাথা রচয়িতা কৃষ্ণদাশ আপন পরিচয় দিয়াছেন—

কাত্রস্থ কোলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণদাশ
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয় জে নিবাষ।
জেলা বিরভূমে তাহে নোনি পরগণা
লাট্টুরাম তাহে নাঙ্গুলের থানা।

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান নেতা সিধু, কানু দুই ভাইকে কবি উল্লেখ করিয়াছেন শুভবাবু (সুবাদারের অপভ্রংশ) বলিয়া—

শুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে, সাঁওতাল ঝুকেছে।
বেটারা কোক ছাড়িল—
বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হইল, হাজারে হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হল্য ভার।

মুখে এক প্রকারের শব্দ করিয়া, নাগরা পিটাইয়া, মদ মাংস খাইয়া সাঁওতালদের বিদ্রোহের যে চিত্র কবির রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যেমন ভয়াবহ তেমনি বীভৎস। সাঁওতালদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া দেশ ছাড়িয়া লোক পলাইতে লাগিল। লুটপাট ও অত্যাচারের ঘটনাগুলি গ্রাম্যকবিগণ কিরূপ জাজ্বল্যমানরূপে বর্ণনা করিতেন তাহা আমরা 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ও 'হেষ্টিংসের রাস্তার গান' আলোচনাকালে দেখিয়াছি। এখানেও দেখি কবি অনর্গল, একের পর এক,

তাহাদের অত্যাচার ও লুটপাটের বর্ণনা আপন গ্রাম্য ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। যেমন—

গেল কুমড়্যাবাদে, গেল কুমড়্যাবাদে, সকল ফদে হইল একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা কল্যো ছারখার।
পোড়াইলে ধানের গোলা, পোড়াইলে ধানের গোলা, তিল জুল্যা,
সরিষা আদি জত।
গরু মহিষ ছাগল ফেঁড়া পুড়িল কত শত।
পূর্বে হনুমান, পূর্বে হনুমান, লঙ্কাখান, জেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়।

এইরূপে সমগ্র বীরভূমের উপর যখন সাঁওতালগণ তাণ্ডবলীলা চালাইতেছে তখন,

সাহেব হুকুম দিলে, সাহেব হুকুম দিলে, ফয়ের বলে, যুনে সেফাইগণ
হাজারে হাজার সাঁওতাল মারে ততক্ষণ।

তখন বর্ষাকাল,

১২৬২ বারষ বাসট্টি সাল, বারষ বাসট্টি সাল, বরসাকাল বানের বড়বিদ্ধি
আন্ধারপুরে মানুষ কেটে কল্যো গাদাগাদী।
কাটিলে বিষ্ণুপুরে, কাটিলে বিষ্ণুপুরে, হারা তাঁতিরে প্রিয়েযুলার মাঠে
বিপন গোপকে তিরিয়ে মারেল পখুরের ঘাটে।

সাঁওতালগণের অত্যাচারে গ্রামবাসিগণ বিব্রত হইয়া উঠিল। আলানচকের নন্দদাসের গরু সাঁওতালগণ লইয়া গেল। নন্দদাস—

তখন বস্ত্র ছাড়ি, তখন বস্ত্র ছাড়ি, কপ্নি পরি, সাঁওতাল সাজিল
চুন যুখান পাতে ভরি কড়চে গোজিল।
হাতে ধনুখান, হাতে ধনুখান, টাঙ্গিখান, কান্দেতে লাগিয়ে
সাঁওতালের বুলি জানি এই সাহষ করিয়ে
সাঁওতালের সঙ্গে, সাঁওতালের সঙ্গে, নানারঙ্গে কথায় ভুলিয়ে
জল খাওআ ছলনা করি আনিল ছাড়িয়ে।

গাথাটিতে বিদ্রোহের বর্ণনা এইখানেই সমাপ্ত। অতঃপর কবি আপন পরিচয় প্রদানান্তে ২৩শে শ্রাবণে কুলকুড়ি গ্রামে লুটের কথা উল্লেখ করিয়া গাথা সমাপ্ত করিয়াছেন।

"বীরভূমের ইতিহাস" হইতে জানা যায় যে, সাঁওতালগণের এই দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া গভর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শিক্ষিত সৈন্যগণের নিকট সাঁওতালগণ পরাজিত হইল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সরকারীভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের সম্পূর্ণ শাস্তির কথা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

ইংরাজ সৈন্যের গুলিতে বহু সাঁওতাল প্রাণ হারায়, কিছু পলাইয়া যায় আর কিছু ধরা পড়ে। বিদ্রোহী নেতা কানুর ফাঁসী হয়। পরে, সিধুকে তাহার স্বগ্রাম পাঁচকেথিয়ায় ধরিয়া লইয়া গিয়া বহুসংখ্যক সাঁওতাল ও অপরাপর জাতির সম্মুখে মিঃ পোটেণ্ট সাহেব তাহার ফাঁসী দেন। অপরাপর সাঁওতালদের সিউড়ীর দক্ষিণে উন্মুক্ত ময়দানে সর্বজনসমক্ষে ফাঁসী দেওয়া হয়।

বিদ্রোহের কারণস্বরূপ 'বীরভূমের ইতিহাস' প্রণেতা বলিয়াছেন যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বহু সাঁওতাল জঙ্গলাকীর্ণ দামন-সীমানার মধ্যে বসবাস স্থাপনের জন্য প্রবেশ করে ও কৃষিকর্ম করিয়া ইহাকে বাসোপযোগী করিয়া তোলে। অন্যান্য পাহাড়িয়া জাতির মত তাহারা এইখানে বসবাসের অন্যান্য সুবিধা ও অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, কেবল প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়াছিল। ইহার ফলে তাহারা অসহায় হইয়া পড়িলে স্থানীয় মহাজন ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার অজুহাতে ঋণজালে জড়াইয়া ফেলিয়া তাহাদের উপর ঘোর অত্যাচার চালাইতে লাগিল। অত্যাচারের ফল ফলিল—তাহাই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতালগণের এই বিদ্রোহ অভিযান কার্যতঃ ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে চালিত হইলেও তাহাদের আক্রোশ মূলতঃ স্থানীয় মহাজনদের উপর ছিল এবং এই কারণেই তাহারা সর্বাগ্রে মহাজনদের আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে এবং তাহাদের জিনিসপত্র লুট করিয়াছে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ লইয়া রাজমহল মহকুমার পাঁচকেথিয়ার বাজার-চৌধুরী ধনকৃষ্ণ রুদ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একটি দীর্ঘ গ্রাম্য কবিতা রচনা করেন (ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা—সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯৩)। কিন্তু ইহাকে গাথাকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না বলিয়া এখানে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

। ৭। **কীর্তিচন্দ্রের গাথা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

একটি ছোট পল্লীগাথার আধুনিক রূপায়ণের মধ্যে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের দানশীলতা, পরাক্রম এবং মৃত্যুকাহিনীর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। গাথার অন্তর্গত কাহিনীটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের ঘটনা লইয়া রচিত। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে জগৎরামের মৃত্যু হইলে রাজবংশের নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠ কীর্তিচন্দ্র বিষয়াধিকারী হন। কীর্তিচন্দ্র তাঁহার জমিদারীর এলাকা বিস্তৃত করেন এবং এই সূত্রে ঘাটালের নিকটে চন্দ্রকোণার রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। আলোচ্য গাথাটিতে কীর্তিচন্দ্রের চন্দ্রকোণা অভিযানেরও উল্লেখ আছে। রাজার মৃত্যুতে রাজ্যব্যাপী এক শোক বর্ণনায় গাথাটি শেষ হইয়াছে।

। ৮। **কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের গাথা**—রচয়িতা কৃষ্ণহরি দাস।

উত্তরবঙ্গের কবি কৃষ্ণহরি দাসের লেখা একটি ঐতিহাসিক কাহিনী গাথা-কাব্যের আকারে পাওয়া গিয়াছে (রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৪)। ঘটনাটি ১১৯০ সালের। রঙ্গপুরের বর্ধনকুটির নয় আনির জমিদার সীতারাম রায়কে রাজার দেওয়ান নিযুক্ত করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া কলিকাতায় কোম্পানীর নিকট লেখা হইয়াছিল। এদিকে রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড রাজাকে ধরিয়া বসিল যে, রামবল্লভ রায়কে বহাল করিতে হইবে। রাজা সে অনুরোধ ঠেলিতে পারেন নাই। রামবল্লভ দেওয়ান হইল। কিন্তু প্রজারা সুখী হইল না। দেওয়ান চক্রান্ত করিয়া রাজার মহল নিলামে তুলিয়া আপনি কিনিয়া লইতে উদ্যত হইলে রাজা প্রজাদের শরণাগত হইলেন। তখন প্রজারা সম্মিলিত হইয়া রামবল্লভকে পদচ্যুত করিবার দাবী জানাইলে, ঐক্যবদ্ধ প্রজাদের দাবী অপূর্ণ রাখিতে গুডল্যাড সাহসী হইলেন না। রামবল্লভ পদচ্যুত হইল। এইরূপে গণশক্তির দাবী প্রতিষ্ঠিত হইল। গাথান্তর্গত কাহিনীটির সামান্য বিবরণ দেওয়া হইল।

রামবল্লভের পদচ্যুতির দাবী জানাইবার জন্য প্রজাগণ সংঘবদ্ধ হইয়া গুডল্যাড-এর কাছারি বাড়িতে সমবেত হইল। কবি গাহিতেছেন—

একটি দুটি করিয়া রায়ত ধরল সারি।
কাচারি বেড়িয়া রায়ত হল হাজার চারি॥

অগণিত ঐক্যবদ্ধ প্রজা বেষ্টিত সাহেব ভীত হইয়া বলিতেছে—

শুন শুন রামবল্লভ রায়
রায়তে না ছাড়ে পিছু কি করি উপায়।

জনশক্তির জাগরণের পরিচয় পাইয়া দেওয়ানও হতভম্ভ হইয়া গিয়াছে।

দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে
কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছাড় মারে।

চতুর দেওয়ান সাহেবকে বলিতেছে—

রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী
যত দেখ সোনার বালা রায়তের কড়ি।

তখন অনন্যোপায় হইয়া—

সাহেব বলে আজ হতে দেওয়ান খারিজ হইল
শুনিয়া সকল প্রজা স্বর্গ হাতে পাইল।

আনন্দিত হইয়া তখন,

মহাশব্দ করি সবে ঝাকি দিয়া কয়
জীয়া থাক সাহেব তোমার বিবির হউক জয়।
নয় আনার কবি কহে পাচালী মধুর
কৃষ্ণহরিদাস ভণে বাস মহীপুর।
কৃষ্ণহরিদাস ভণে তাহের মামুদে লেখে
সবে মিলি জয় জয় দিয়া আল্লা বল মুখে।

শেষোক্ত পংক্তি হইতে জানিতে পারি গাথাটির রচয়িতা কৃষ্ণহরিদাস। কিন্তু লিপিকার তাহের মামুদ। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে গ্রামবাসীদের ভিতর গাথাটির বেশ প্রচলন ছিল। এই গাথাটি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের গণশক্তি কিরূপ প্রবল ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

।৯। **দেবী সিংহের উৎপীড়ন**—রচয়িতা রতিরাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা ও দেওয়ানগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনশক্তির জাগরণের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। তখনকার গ্রাম্যসমাজে এই ধরণের ঐতিহাসিক গাথার প্রচলন ছিল খুব বেশী। পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত দেওয়ানগণের অত্যাচারমূলক গাথাগুলিতে কেবল তাহাদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে,

অত্যাচারিত নরনারীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত গাথাগুলির মত জনশক্তির জাগরণের কোনও বর্ণনা তাহাতে নাই। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত গাথাগুলি কোম্পানীর আমলে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় বাংলাদেশে বিদেশীগণের আগমনের পর হইতেই জনশক্তির জাগরণ হইয়াছে।

আলোচ্য গাথাটি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (তৃতীয় ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩১৫) মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত 'রংপুরের জাগের গান'-এর অংশবিশেষ। ডঃ দীনেশ সেন তাঁহার 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় —২য় খণ্ডে' এই গাথাটির পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন।

গাথা রচয়িতা রতিরাম রঙ্গপুর জেলার প্রাচীন ইটাকুমারী গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজবংশীয় ছিলেন।

রঙ্গপুর, ধুবড়ী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে মদন চতুর্দশী উৎসব উপলক্ষ্যে 'জাগের গান' গাওয়া হইয়া থাকে। অশ্লীল ভাষায় রচিত এই সকল গানের মধ্যে সময় সময় ছোট ছোট ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ মিলিয়া যায়। এই বিবরণগুলি হইতে এক একটি ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 'জাগের গান'-এর অন্তর্গত দেবীসিংহের অত্যাচারমূলক এই কাহিনীটিতে একটি সুন্দর ঐতিহাসিক গাথাকাব্যের রূপ পাইতেছি। গাথাটি পয়ারছন্দে রচিত। এই ঘটনাটিও গুডল্যাড সাহেবের আমলে ঘটে।

কবি আপন পরিচয় প্রদানান্তে বলিতেছেন—

রঙ্গপুরে ফতেপুর প্রকাণ্ড চাকেলা।
রাজা রায় রাজা তায় আছিল একেলা॥
ধর্ম্মমতি রাজা রায় কত কৈল দান।
ব্রহ্মোত্তর ভূমি কত ব্রাহ্মণেতে পান॥

অপরদিকে,

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার টিং॥
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমতি হইল তার ভূষণ বাহন॥
রাজার পাপেতে হইল মুলুকে আকাল।
শিশুরে রাখিয়া একা গৃহী মারা গেল॥

রাজা দেবীসিংহের অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সব করে হাহাকার॥
সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা।
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা॥

এমন কি কুলনারীগণের মর্যাদা রক্ষাও দায় হইল।

পারে না ঘাটায় চলতে ঝিউরী বউরী।
দেবী সিংহের লোক নেয় তাকে জোড় করি॥
পূর্ণ—কলিঅবতার দেবীসিংহ রাজা।
দেবীসিংহের উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা॥

এই সময়ে,—

রাজা রায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায়।
শিবের সমান বলি সর্বলোকে গায়॥

এই শিবচন্দ্রের মাতা জয়দুর্গা চৌধুরাণী বড় বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী নারী।

জয়দুর্গার পরামর্শে শিবচন্দ্র দেবীসিংহের দরবারে গিয়া প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানাইলে, দেবীসিংহ তাহাকে বন্দী করিয়া কয়েদখানায় রাখিল। শিবচন্দ্রের দেওয়ান অনেক টাকা দিয়া রাজাকে মুক্ত করিয়া রাজবাটী ইটাকুমারীতে ফিরাইয়া অনিলেন।

তখন শিবচন্দ্র সকল জমিদার ও প্রজাগণকে ডাকিয়া এক বিরাট সভায় দেবীসিংহের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিলে, ভীত জমিদারগণের 'কারো মুখে কথা নেই হেটমুণ্ডে রয়'। জমিদারগণের এই কাপুরুষতা দর্শনে জয়দুর্গা তাহাদের ধিক্কৃত করিয়া বলিলেন, 'তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই'। অতঃপর জমিদারগণকে বাদ দিয়াই শিবচন্দ্র ও জয়দুর্গা প্রজাগণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে।
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষাপে॥

প্রজাগণ দেবীসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তছনছ করিল এবং 'দেবীসিংহের

বাড়ী হৈল ইটার পাহাড়'। জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে আসিতে দেবী-সিংহের সাহসে কুলাইল না। তখন—

খিড়িকির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবীসিং।
সাথে সাথে পালোয় গেল সেই বার টিং ॥
দেবীসিং পলাইল দিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা ॥

দেবীসিংহ পলাইয়া যাওয়ার পর কোম্পানীর সহিত কৃষকগণের রফা হয় এবং অল্পে তুষ্ট কৃষক সমাজ তাহাতেই শান্ত হয়। এই সম্বন্ধে 'রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে' বলা হইয়াছে—

"কালেক্টর গুডল্যাড তাহার প্রিয় ইজারাদার দেবীসিংহের অঙ্গস্পর্শ করিতে দেন নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে এই কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। গুডল্যাড দেবীসিংহের উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। বিদ্রোহের নায়ক নিহত হইলে প্রজাগণ গুডল্যাডের নিকট হইতে বর্ধিত হারে খাজনা সংগ্রহ বন্ধ ও অত্যাচারের প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি পাইয়া শান্ত হয়।"

আলোচ্য গাথাটি ঘটনার সমসাময়িক কালেই রচিত।

কীর্তিচন্দ্রের গাথার ন্যায় আরও দুইটি গাথা—'ফৌজদার-কীর্তিগাথা' ও 'সেরেস্তাদারের গাথা'র আংশিক উল্লেখ পাই বাং পুঁথি বিবরণের ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায়, ১০৮-১০৯ পৃষ্ঠায়। এই গাথা দুইটিও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কীর্তিকাহিনী লইয়া রচিত।

জমিদারের কীর্তিকাহিনীমূলক আরও একটি গাথার পরিচয় সম্প্রতি পাইয়াছি 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'-র ভাদ্র-চৈত্র, ১৩৬৫, সংখ্যায়।

অধ্যাপক আহমদ শরীফ একটি ক্ষুদ্র খণ্ডিত পুঁথি হইতে গ্রাম্য জমিদারের প্রশস্তিময় এই গাথার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন।

ইসাপুর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের বিধবা জমিদার-গৃহিণী আওরা-দে-বারোজ (Aora-de-Barros)-এর কাছে জমি চাহিয়া গ্রাম্যকবি এতিন কাসেম আপন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে জমিদার-গৃহিণী ও তাঁহার কর্মচারীদিগের মন-গলানো স্তুতিগান গাহিয়াছেন। কবি তাঁহার প্রার্থনার যৌক্তিকতা দেখাইতে গিয়া ইসাপুর গ্রামের পুরাকাহিনী শুনাইয়াছেন। এই

কাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াই আলোচ্য পুঁথির সংগ্রাহক ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এই পুঁথির নাম দিয়াছেন "ইসাপুরের ইতিহাস"। কিন্তু জমিদারের গুণকীর্তনই গানটির মূল বক্তব্য এইজন্য অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ পুঁথিটির নূতন নামকরণ করিয়াছেন 'আওরা-দে-বারোজ-প্রশস্তি।'

কবির স্তুতির ভাষায় নারী জমিদারও নৃপতি হইয়া উঠিয়াছেন—

একদিন হাটে আমি গেলুঁ ফেরিবার।
নৃপতি বাথান শুনি নানান প্রকার॥

এবে নৃপতির কথা কহি একে এক।
লোকের মুখেত আহ্মি শুনিছি যথেক॥
প্রথমে কহিমু তান নিবাস কথন।
পাছে কীরিতির কথা করিমু রচন॥

কবি-কীর্তিত আওরা-দে-বারোজ পর্তুগীজ জমিদার, ফিরিঙ্গী বলিয়া কবি ইহাকে ইংরাজ বলিয়াছেন। সেকালের ইউরোপীয়, বিশেষতঃ পর্তুগীজ বণিকদের কেহ কেহ, এদেশে জমি কিনিয়া ব্যবসার জন্য আড়তাদি স্থাপন করিতেন, চাষাবাদ করাইতেন, প্রজাও বসাইতেন এবং সেইসূত্রে হয়তো জমিদারও হইয়া উঠিতেন। আলোচ্য গাথাটিতে সেইরূপ একজন জমিদারকে স্তোকবাক্যে খুসী করিয়া কবি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের উপায় খুঁজিয়াছেন।

কবির আবেদনের মূলকথা এই, কবির পূর্ব-পুরুষগণ ইসাপুর গ্রামেই বাস করিতেন। কবির পিতা জমিদার আন্দর ফর্ণাদের সময়ে জঙ্গল কাটিয়া কিছু জমি আবাদ করেন।

আন্দর ফর্ণাদ সুত কালুচ ফর্ণাদ যুত
তান পুত্র তিতানাম্ন হত্র।

এই তিতানাম্নের পত্নীই কবিকীর্তিত জমিদার আওরা-দে-বারোজ। কবি বলিতেছেন :

বয়স না হৈতে নিধি হরিয়া নিলেক বিধি
তিতানাম্ন হইল নিধন।
আপনা পতির যথ মাল মিল্লিক যথ শত
তান দন্তে হৈল সমর্পণ॥

এইরূপে আওরা-দে-বারোজ পতির জমিদারীর মালিক হইলেন।

সম্ভবতঃ কবির পিতার নাম আনওয়ার। তাঁহার সহযোগী ও শরিক ছিল দুর্লভ, যোগীধন ও সাধু। আন্দর কর্ণাদের মৃত্যুর পর কবির পিতা গ্রামান্তরে চলিয়া যান। এই সুযোগে অপর শরিক সাধু ও কবির পিতার মুৎসুদ্দি (জমির তত্ত্বাবধায়ক) কবির পিতার সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করে। বহুকাল পরে, আলোচ্য প্রশস্তি রচনার মাত্র তিন বৎসর পূর্বে, কবি আবার পূর্বপুরুষের গ্রামে ফিরিয়া আসেন—'তিন অব্দ ইসাপুরে মোর স্থানস্থিতি'। জমিদারের গুণকীর্তন করিয়া কবি বলিতেছেন—

বলবুদ্ধিহীন হৈলুঁ নাহি মোর লক।
পৃথিবীতে নাহি মোর করিতে পালক॥

অতএব,

দান দিয়া শান্ত কর এতিমের মন।

ইহার পর 'ইসাপুর—আবাদ কাহিনী' বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর দুর্লভ, যোগীধন, সাধু ও আনোয়ার, এই চারিজন আবাদকারীর বর্ণনার আরম্ভেই পুঁথি খণ্ডিত। সম্ভবতঃ এই চারিজনের বিস্তৃত বর্ণনার পরেই পুঁথিটি সমাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং হারানো অংশ দুই চারি পাতার বেশী হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

কবি এতিম কাসেম তাঁহার জমিদার প্রশস্তি যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের (১৭৭২-৮৫ খৃঃ) আমলে রচনা করিয়াছিলেন তাহা "কুম্পানী সরকারের পরিচয়" শীর্ষক পর্বের বিবৃতি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ লর্ড নর্থের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' (১৭৭৩ খৃঃ) কার্যকরী হইবার (অক্টোবর ২৬, ১৭৭৪ খৃঃ) পরে যে রচিত হইয়াছিল, সে আভাসও পাওয়া যায়। কবির বিবৃতিতে কিছু কিছু ভুলও আছে, অবশ্য সেকালের একজন সাধারণ গ্রামবাসীর পক্ষে এরূপ ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। তবুও গাথাটি হইতে তখনকার শাসন-সংস্থা, সুপ্রীম কোর্টের বিচার ব্যবস্থা, ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন,

ভাটি আদি হিন্দুস্থান সর্বদেশ জিনি।
অষ্ট কৌসিল[১] নাম রাখিল কুম্পানী॥
কুম্পানী যাহারে বোলে তার মর্ম কহি।
অষ্ট জনে মিলি কুম[২] করিলেক সহি॥

১। কাউন্সিল, ২। মূলধন, এখানে মূলধন বিষয়ক দলিল।

কোন অষ্টজন হএ শুনহ বিচার।
ভাঙ্গিয়া কহিমু তাকে সবে বুঝিবার॥
বড় যে সাহেব এক জানিবেক সার।
তার পাছে ছোট সাহেব হইল আর॥
তার পাছে চারিজন হইল উজীর।
চারিজন সমসর জ্ঞানেত সুধীর॥
ইত্যাদি......

১৭৭৫-১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুঁথিটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই গাথাটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের চট্টগ্রামের বহু জমিদারের নামোল্লেখ রহিয়াছে। কবির বিবৃতির আলোকে খোঁজ করিলে যে বিবরণ পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে চট্টগ্রামের ইতিহাসের এক অজ্ঞাত ও লুপ্ত অধ্যায় লিখিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ-এর ভূমিস্বত্ব ও রাজস্ব আইনে (১৭৯৩ খৃঃ) কি ভাবে বহু মুসলমান ভুঁইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে বিত্তহীন হইয়া পড়িলেন, তাহার পূর্বাভাসও গাথাটি হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং, সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা যায় গাথাটির ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নয়।

আলোচ্য গাথাটি পাঠ্যগাথার অন্তর্ভুক্ত। ইহা গ্রাম্য ভাষায়, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।

।খ। দ্বিতীয় শ্রেণী—ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াবলম্বনে রচিত গাথা।

এই শ্রেণীর গাথাগুলি কোনও-না-কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও, এই রচনাগুলিতে কবি-কল্পনার মিশ্রণ এত বেশী যে, গাথাগুলি হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। অধিকন্তু, কবিকল্পনামিশ্রিত ভাবাতিশয্যে ও রূপকের মিশ্রণে এবং কোথাও কোথাও গ্রাম্যকবির অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে পড়িয়া ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃত হইয়া অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কবি রচিত একই ঘটনার বিবৃতিতে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গ্রাম্য-কবিগণ জনগণমনোরঞ্জনার্থে এই সকল গাথা কবিতা রচনা করিতেন। তখনকার

দিনে গাথা রচয়িতা বা গায়েনের উপার্জনও কখনও কখনও ইহার উপরই নির্ভর করিত। তাই চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্তই তাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত আপন আপন কল্পনা ও সৃষ্টি প্রতিভা যুক্ত করিয়া গাথাগুলি রচনা করিতেন এবং গায়েনদিগের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হইতে কালক্রমে মূল গাথার রূপ অনেক পরিবর্তন লাভ করিত। এইরূপ কল্পনার রঙে রঞ্জিত ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক গাথাগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

নিম্নের ইতিহাসাশ্রিত গাথাগুলি ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করাইয়া তাঁহার 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' সংকলনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইগুলির অন্তর্গত কাহিনীর আলোচনা হইতেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত কি পরিমাণ কবিকল্পনার রং মিশ্রিত হইয়া গাথাগুলি রচিত হইয়াছে।

।১। **কমলারাণীর গান ও রাজা রঘুর পালা**—প্রথমটির রচয়িতা **অধরচন্দ্র**, দ্বিতীয়টির রচয়িতা অজ্ঞাত।

গাথা দুইটি পৃথকভাবে প্রকাশিত হইলেও, ইহারা একই কাহিনীর অন্তর্গত। শেষোক্ত গাথাটি প্রথমোক্ত গাথাটির শেষাংশ। একটি বাস্তব কাহিনীকে কল্পনার ছাঁচে ফেলিয়া গাথা দুইটি রচিত হইয়াছে।

"আখ্যায়িকায় বর্ণিত সুষং দুর্গাপুরের জমিদার জানকীনাথ মল্লিক, তদীয় পত্নী কমলাদেবী এবং পুত্র রাজা রঘুনাথ সিং ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কমলাদেবী জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথ সিং উক্ত সম্রাটের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তিনি সুষং দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার জানকীনাথ মল্লিকের পুত্র। জানকীনাথ আকবরের সমসাময়িক।" (ডঃ দীনেশ সেন)।

গাথান্তর্গত কাহিনীটি এইরূপ—

সুষং দুর্গাপুরের রাজা জানকীনাথ রাণী কমলার ইচ্ছানুসারে একটি দীঘি খনন করান। কিন্তু রাজার দুর্ভাগ্যবশতঃ দীঘির 'শুকোদ্ধার' অর্থাৎ জলাগম হইল না। দীঘিতে জল না আসিলে দীঘিকারকের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত নরকগামী হইতে হয়,—এই প্রাচীন সংস্কারের বশবর্তী হইয়া রাজা এবং তাঁহার পাত্রমিত্র ও প্রজাবর্গ যখন চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া উঠিলেন, তখন রাজা স্বপ্ন দেখিলেন যে, রাণী পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেই তাহা জলে ভরিয়া উঠিবে। রাজার স্বপ্নের কথা

শুনিয়া রাণী সাধারণের হিতার্থে এবং স্বামীর পিতৃপুরুষগণকে নিরয়গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দীঘির ভিতর নামিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই দীঘি জলপূর্ণ হইয়া উঠিল কিন্তু রাণী আর উঠিলেন না। এইরূপে রাণীর জীবন বিসর্জনের শোকে রাজা যখন কাতর তখন একদিন তিনি রাণীকে স্বপ্নে দেখিলেন এবং রাণীর নির্দেশমত পুকুরের পাড়ে একটি সুদৃশ্য ঘর করিয়া দিলেন। দাসীর ক্রোড়ে রাজপুত্র রঘুনাথ রোজ রাত্রে সেই ঘরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে রাণী আসিয়া পুত্রকে স্তনপান করাইয়া যান। রাণী বলিয়াছিলেন যে, একবৎসর এইরূপ করিলে রঘুনাথ ইন্দ্রের সমান হইবে এবং রাজাও পুনরায় রাণীকে ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু এই এক বৎসরের ভিতর এক দাসী ছাড়া অন্য কেহ রাণীকে দেখিলেই রাণী জন্মের মত পৃথিবী ত্যাগ করিবেন। এদিকে যখন একবৎসর পূরিতে আর একদিন মাত্র বাকী তখন রাজা রাণীকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন ও রাণীর সাবধান বাণী ভুলিয়া প্রত্যূষে গিয়া রাণীর কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা রাণীকে দেখিলেন ঠিকই কিন্তু একবৎসর পূর্ণ না হওয়ায় জন্মের মত রাণীকে হারাইলেন। রাজপুত্র রঘুনাথও মাতৃহারা হইল। প্রথম গাথাটিতে এই পর্যন্তই কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে।

জানকীনাথের মৃত্যুর পর হইতে দ্বিতীয় কাহিনীটি আরম্ভ হইয়াছে। চিরশত্রু জানকীনাথের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভুঁইয়াদের নায়ক জঙ্গলবাড়ীর ঈশা খাঁ তখনই সসৈন্যে দুর্গাপুর অধিকার করিতে চলিলেন। রঘুনাথ তখন পাঁচ বৎসরের বালক। তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য-পরিচালনা করিতেছিলেন। এই সময় ঈশা খাঁর সৈন্যগণ পুরী অবরোধ করিয়া শিশু রাজাকে বন্দী করিল। এই সংবাদ প্রজাদের মধ্যে রাষ্ট্র হইলে সকলেই শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িল। রাজভক্ত প্রজাগণের বর্ণনার ভিতর দিয়া কবি আপন বর্ণনানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। শোকোন্মত্ত প্রজারা কিন্তু তাহাদের সাহস ও ধৈর্য হারাইল না। তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করিল। হিন্দুরাজ্যে প্রজারা কিরূপ রাজভক্ত ছিল এই গাথাটিতে তাহার কিছুটা আভাস মিলে।

জঙ্গলবাড়ীর নিকটে এক দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিল। ত্রিশ হাজার গারো (পাহাড়ী জাত) তথায় একত্র হইয়া রাতারাতি একটি খাল কাটিয়া ফেলিল। এই খাল দ্বারা তাহারা ধনেখালী নদীর সহিত জঙ্গলবাড়ীর পরিখার সংযোগ সাধন করিল। ঈশা খাঁ কর্তৃক নিয়োজিত প্রহরীগণের অজ্ঞাতসারে প্রজারা শিশু

রঘুনাথকে উদ্ধার করিয়া ঈশা খাঁরই বড় পিনিসে বহু লোকে দাঁড় টানিয়া রঘুনাথকে দুর্গাপুরে লইয়া আসিল। এইভাবে সকল বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া রাজভক্ত প্রজাগণ রাজাকে পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন, 'এই পালা বাংলার ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র পৃষ্ঠা কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র হইলেও মূল্যবান।' কিন্তু প্রথম পালার অন্তর্গত কাহিনীটি অবাস্তব ঘটনার আতিশয্যে একটি রূপকথার রূপ নিয়াছে, ইহাতে কবিকল্পনার মাধুর্য মিশ্রিত হইয়া ইতিহাস কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে অবাস্তব কল্পনার মিশ্রণ কিছু কম।

।২। **নিজাম ডাকাইতের পালা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই গাথাটি চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন, 'নিজাম ডাকাত চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় পালা তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইবার কথা। কিন্তু বর্তমান পালাটিতে পরবর্তী কালের গায়কদের অনেক যোজনা রহিয়াছে। এই পালা ময়নামতীর গানের সহিত সমশ্রেণীর। মন্ত্রবলে অসাধ্যসাধন ও অতি-মানুষিক ঘটনার সমাবেশ এই সমস্ত গানের বিশেষত্ব।'

'নিজাম ডাকাতের পালা'টিতে ঐতিহাসিক সত্য কতখানি আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে এই গল্পটির সহিত রত্নাকর দস্যুর (পরবর্তী বাল্মিকী) জীবনকাহিনীর আশ্চর্য মিল লক্ষিত হয়। কাহিনীটি এইরূপ:

দুর্ধর্ষ ডাকাত নেজাম—

"ঘুরিত ফিরিত সদাই মানুষ কাড়িবারে।"

মানুষ কাটা নেজাম ডাকাতের নেশা হইয়া গিয়াছিল।

এদিকে সেখ ফরিদ নামে একজন ফকির,

"গভীর কাননে থাকি করিত ধেয়ান।"

এই ফকির ধ্যানে জানিতে পারিলেন যে, একজন ডাকাত ৯৯টি মানুষ কাটিয়াছে। ফকির তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 'একজন বিদ্দবেশে চলিল সাজিয়া।' অনেক টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়া বৃদ্ধবেশী ফকির নেজামের সম্মুখে আসিলে নেজাম টাকা চাহিল, বলিল অন্যথায় সে বৃদ্ধকে হত্যা করিবে। বৃদ্ধ ফকির তখন

ঝোলায় হাত দিয়া তাহাকে দুইশত টাকা বাহির করিয়া দিতেই ডাকাত আরও টাকা চাহিল এবং ফকির আরও টাকা তাহাকে দিলেন। এইভাবে নেজাম টাকা চাহে ফকিরও 'ঝারিতে লাগিল ঝোলা করিয়া যত্তন'। আর 'দেখিতে দেখিতে হইল টাকার পাহাড়'।

ফকির তখন নেজামকে বলিলেন

ঘরে তোমার মা জননী স্তিরিপুত্র আছে।
এই টাকা লইয়া তুমি যাও তারার কাছে॥
রুজি করিয়াছ টাকা অনেক মানুষ কাড়ি।
মাডিদি বানাইয়ে শরীল শেষে হৈব মাডি॥
ডাকাতি না করিও যে বুলি তোমার স্তরে।
এবে হুস্তে ভালা হৈয়া থাক নিজের ঘরে॥

ফকিরের এই কথা শুনিয়া 'থর থর করি নেজাম কাঁপিয়া উঠিল'। ফকিরের প্রভাবে নেজামের মধ্যে একটি অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল। তখন,

কাঁদিতে কাঁদিতে নেজাম কি কাম করিল।
ফকিরের পায়ের উপর আসিয়া পড়িল।

ফকির নেজামকে তুলিয়া লইলে নেজাম কহিল,

টাকা ন লাগিব আর।
তোমার গোলাম হইতে একিন আমার॥

সেখ ফরিদ তখন নেজামকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে ফকির নেজামকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তখনও তাহার ধনের লোভ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ফকির তখন তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলে নেজাম খুব কাঁদিতে লাগিল। ফকির তখন একটি লোহার লাঠি সেই জঙ্গলের মধ্যে পুঁতিয়া নেজামকে বলিলেন যে, এই লাঠির মাথার দিকে তাকাইয়া বার বচ্ছর একভাবে অনাহারে অনিদ্রায় যদি নেজাম মন্ত্র জপে তো—

বার বছর গত হৈলে ফাড়ি লাডির মাথা।
দেখিবা যে অপরূপ বাহির হৈব লতা॥
যে তারিখে এই লতা বাহির হয় দেখিবা।
সে তারিখ তুমি আমার দেখা যে পাইবা॥

এইকথা বলিয়া ফকির নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। নেজাম মন্ত্র জপিতে লাগিল। এইভাবে ছয় বছর গত হইল।

পাহাড়ের সর্দার ছিল জঙ্গলী পাতসা। তাহার লালবাই নামক একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল। পাতসার উজীরের জব্বর নামে একটি পুত্র ছিল।

লম্পট আছিল জব্বর বড়ই দুষমণ।
মাইয়ারে করিতে চুরি ভাবে মনে মন॥

জব্বর একদিন অন্দরে গিয়া লালবাইর হস্ত ধরিলে লালবাই পিতাকে বলিয়া দিল। তখন সর্দারের হুকুমে জব্বর মিয়াঁর কান কাটা গেল। জব্বর দেশ হইতে পলাইল। এদিকে ঐ দুর্ঘটনার পর হইতেই লালবাইয়ের শরীর খারাপ হইতে লাগিল। অবশেষে, 'বীমারে পড়িয়া লালী করিল শয়ন'। লালীর মৃত্যু হইলে তাহাকে ময়দানে নিয়া কবর দেওয়া হইল। লম্পট জব্বর প্রকৃতই অমানুষ ছিল। সে একটি দোস্ত সঙ্গে করিয়া ময়দানে আসিল। পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে মাতিয়া জব্বর—

মনে মনে আশা করে আসকদার তুসিব।
মরা মানুষ লৈয়া মোরা আরজ মিটাইব॥

জব্বর যখন দোস্তের সহিত মিলিয়া কবর খুঁড়িতেছিল তখন 'নেজাম ডাকাইতের তাহা মালুম হইল'। নেজাম তাড়াতাড়ি লোহার লাঠি উঠাইয়া তাহাদের নিকট গিয়া দেখিল তাহারা কবর খুঁড়িয়া কফিন বাহির করিয়া তাহা খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন নেজাম লোহার লাঠি ঘুরাইয়া দুইজনের মাথায় মারিল এবং তাহারা মরিয়া গেল।

নেজাম ফিরিয়া আসিয়া আবার পূর্বের জায়গায় লাঠি গাড়িয়া উপরদিকে চাহিতেই দেখিল লাঠির আগায় লতা আর 'সেই সমে সেখ ফরিদ আসিয়া মিলিল'। নেজাম উঠিয়া সব কথা জানাইয়া ফকিরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল—

সেখ ফরিদ নেজামরে কোলেতে লইল।
লৈক্ষ লৈক্ষ চুম্প তার কোপালেতে দিল॥
ফরিদ বলিল, 'তুমি মারি দুষমনেরে।
বার বছরের কাম কৈল্লা ছ বছরে॥
এই রকম কাম যদি করিত পার সার।
আলক রথে যাইবা তুমি ভেয়স্তর মাঝার'॥

ইহার পর নেজাম ফকিরের সহিত বনে-জঙ্গলে ঘুরিতে ঘুরিতে এক হালুয়ানীর

নিকট উপস্থিত হইল। ফরিদ নেজামকে হালুয়ানীর গরুর রাখাল নিযুক্ত করিয়া দিয়া বিদায় লইলেন। নেজাম সেখানে রহিয়া গেল। হালুয়ানীর এক সুন্দর, ধার্মিক পুত্র ছিল। তাহাকে দেখিবার জন্য,

"হালুয়ানীর ঘরে পীর হামিসা আসিত।"

একদিন হালুয়ানী নেজামকে মাহিনা দিতে গেলে সে তাহা লইতে অস্বীকার করিয়া বলিল যে, পরিবর্তে সে পীর সাহেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। তখন হালুয়ানী নেজামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সকল অবগত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। নেজামের অনুরোধ এবং হালুয়ানীর প্রার্থনায় পীরসাহেব নেজামকে দীক্ষা দিলেন। আর,

জবানেতে পীর তখন আউলিয়া কৈল।
পারশে ছিল নেজামুদ্দিন হাবা হৈয়া গেল॥

উপরে বর্ণিত ঘটনার অবাস্তবতাই প্রমাণ করে যে, কাহিনীটিতে ঐতিহাসিক তথ্য খুব কমই আছে।

।৩। **দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

ঈশা খাঁ ও কালিদাস গজদানী ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঈশা খাঁর কন্যা মমিনা-খাতুনের কালিদাসের প্রতি আসক্তির কথা কাহিনীতে পাই। ইহা ছাড়াও মানসিংহ, কেদার রায়, কেদার ভগ্নী সুভদ্রা (সোনা), প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহাসিক চরিত্রেরও উল্লেখ এই গাথাটিতে আছে। রচয়িতার নাম অজ্ঞাত হইলেও কাহিনীটি পাঠ করিলে ইহা মুসলমান কর্তৃক রচিত বলিয়াই মনে হয়। হিন্দু কেদার রায়ের চরিত্র হীন করিয়া দেখান হইয়াছে। কবির সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুন কেদার রায়ের সত্য পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। এই একদেশদর্শিতার ফলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রাম্যকবি রচিত ঐতিহাসিক গাথাগুলি হইতে ঘটনার কথা কিছুটা জানা গেলেও, ঘটনা সম্বলিত ব্যক্তিগণের সঠিক পরিচয় পাওয়া কঠিন। ইতিহাস জাতিনিরপেক্ষ রচনা। কিন্তু এই প্রকারের গাথাগুলি ইতিহাস রচনার এই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত হইয়া সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক মর্যাদালাভে বঞ্চিত হইয়াছে। গাথায় বর্ণিত কাহিনীটি এইরূপ—

গৌড়ের নবাব জোলালউদ্দিনের দেওয়ান ছিলেন কালিদাস। কালিদাস জ্ঞানী, গুণী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং অপরূপ রূপবান পুরুষ ছিলেন।

তাঁহার দানের প্রবৃত্তি এত বেশী ছিল যে, হাতী পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। এইজন্য তিনি কালিদাস গজদানী নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

অপরূপ রূপলাবণ্যবতী নবাবকন্যা মমিনা খাতুন কালিদাসকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং বিবাহপ্রস্তাব করিয়া বাঁদীর হস্তে কালিদাসকে লিখন পাঠাইল। কালিদাস মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলেন। মমিনা তখন কৌশলে গোস্ত খাওয়াইয়া কালিদাসের জাতি নাশ করিল। তখন নিরুপায় হইয়া কালিদাস মমিনাখাতুনকে সাদি করিলেন। মমিনার দুই পুত্র হইল, দাউদ খাঁ আর ঈশা খাঁ। কালিদাসের মৃত্যু হইলে দাউদ খাঁ নবাব হইলেন কিন্তু বাদশার সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। ঈশা খাঁ নবাব হইয়া "জান দিয়া পালে পরজা পুত্রের সমান"।

ইহার পর ঈশা খাঁর সহিত বাদশাহের সেনাপতি সাহবাজের যুদ্ধ, ঈশা খাঁর জঙ্গলবাড়ী শহর গঠন, বাদশার সেনাপতি মানসিংহের সহিত যুদ্ধ ও মানসিংহ কর্তৃক কৌশলে ঈশা খাঁকে বন্দী করিবার ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল ঘটনায় ঈশা খাঁর বীরত্বের কথা কবি পঞ্চমুখে বলিয়াছেন। অবশেষে বাদশা কর্তৃক ঈশা খাঁর বন্ধনমোচন ও সন্ধিস্থাপন। বাদশার সহিত সন্ধির পরে ফিরিবার পথে ঈশা খাঁ যখন শ্রীপুরের উপর দিয়া যাইতেছিলেন তখন শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের ভগ্নী প্রাসাদ হইতে ঈশা খাঁকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, ঈশা খাঁও নৌকা হইতে কেদারের ভগ্নীকে (সুভদ্রা) দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। অতঃপর কৌশলে ঈশা খাঁ সুভদ্রাকে হরণ করিয়া সন্ধি করিলেন। সুভদ্রার নাম হইল নিয়ামতজান। মুসলমান কবি ঈশা খাঁর চরিত্র-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সুভদ্রাকে তাহার প্রতি অনুরক্ত দেখাইয়াছেন। প্রকৃত ইতিহাস তাহা বলে না।

যাহাই হউক, কিছুদিন পরে আদম ও বিরাম নামে ঈশা খাঁর দুই পুত্র জন্মিল। আদমের পনর বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঈশা খাঁ পরলোকগমন করিলেন। ঈশা খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই কেদার রায় বুঝিলেন যে, প্রতিশোধ লইবার এই প্রকৃষ্ট সময়। এই ইঙ্গিতে কেদার রায়ের চরিত্রকে ভীরু দেখান হইয়াছে। কেদার রায় কৌশলে ভাগিনাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আপনার কাছে বন্দী করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নিয়ামতজান বীর করিমুল্লাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলে,

সহিতে না পারি পরে বিবির কান্দন।
গর্জিয়া করিমুল্লা বীর কয় ততক্ষণ॥
না কান্দ না কান্দ বিবি দুঃখ কর দূর।
তোমারে আন্যা দিবাম কেদারের শির॥

এই বলিয়া করিমুল্লা শ্রীপুর শহরে যুদ্ধ করিতে চলিল। একা যুদ্ধে কেদারের কিছু ক্ষতি সাধন করিয়া অবশেষে সাধন মাঝির সহায়তায় প্রচুর সৈন্য লইয়া শ্রীপুরে চলিল। নিরুপায় হইয়া কেদার রায় বিরাম ও আদমকে কালীর সামনে বলি দিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে কেদারের দুই কন্যা আদম ও বিরামের প্রতি অনুরক্তা। তাহারা গিয়া বলিদান কার্যে বাধা দিল এবং দুই কুমারকে রক্ষা করিল। দেখিতে দেখিতে,

জঙ্গলবাড়ীর ফৌজগণ শ্রীপুর ঘিরিল।
সর ছাইয়া যত ফৌজ খাড়া যে হইল॥
তার পরে ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া।
সোনার শ্রীপুর সর দিল ছাড় খার করিয়া॥

কেদার রায় পলাইয়া গেলেন। দুই কন্যা তখন করিমের কাছে কেদারের লুক্কায়িত স্থানের সন্ধান বলিয়া দিল এবং করিম সেখানে গিয়া তাহাকে হত্যা করিল। মুসলমান কবি কেদার কন্যাদ্বয়কে হীনভাবে অঙ্কিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, কিন্তু বাংলার ইতিহাসে হিন্দু সতীনারীর এইরূপ জঘন্য আচরণের উল্লেখ কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পর করিমুল্লা কেদারের গলা কাটিয়া শ্রীপুর শহরে আসিয়া কেদারের প্রজাদের তাহা দেখাইয়া আনন্দ উপভোগ করিল। তারপর সকলে মিলিয়া জঙ্গলবাড়ী ফিরিয়া গেল এবং বলাই বাহুল্য আদম, বিরামের সহিত কেদার রায়ের দুই কন্যার বিবাহ হইল।

কিছু সত্য ঘটনার সহিত কল্পনার স্রোতে মিলিয়া এইখানে 'দেওয়ান ঈশা খাঁ' নামক বৃহৎ গাথাটির গতিবেগ সমাপ্ত হইয়াছে।

।৪। **ফিরোজ খাঁ দেওয়ান**—রচয়িতা অজ্ঞাত, তবে রচনাগুলি দেখিয়া রচয়িতা যে মুসলমান তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

পূর্বোক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে গাথাটি আরম্ভ।

ঈশা খাঁ নির্মিত জঙ্গলবাড়ী শহরের দেওয়ান ফিরোজ খাঁ এই কাহিনীর নায়ক। এই কাহিনীটিতে ঐতিহাসিক তথ্য খুব কমই আছে, কিন্তু কাহিনীর

অন্তর্গত সখিনাবিবির চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। কাহিনীটি বৃহৎ। নামগুলি ঐতিহাসিক, সেই কারণে মনে হয় যে, ইতিহাসের সামান্য কোন সূত্র ধরিয়া লইয়া কবি আপন কল্পনার রঙ্গে রাঙ্গাইয়া গাথাটি রচনা করিয়াছিলেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

ঈশা খাঁ গত হইবার বহুদিন বাদে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান হইয়াছেন ঈশা খাঁর বংশধর ফিরোজ খাঁ। ফিরোজ খাঁ অবিবাহিত, বিবাহে তাঁহার ইচ্ছা নাই। অবশেষে কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমর খাঁয়ের কন্যার তসবীর দেখিয়া ফিরোজ খাঁ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এমনকি তসবীরে কন্যার রূপ দেখিয়া দেওয়ানের আহার-নিদ্রা ঘুচিল। অবশেষে শিকারের ছলে বাহির হইয়া কন্যাকে দেখিয়া আসিলেন। কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান জঙ্গলবাড়ীর শত্রু, এইজন্য এই বিবাহে ফিরোজের মাতা রাজী হইলেন না অবশেষে পুত্রের দশা দেখিয়া তিনি কেল্লাতাজপুরের কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া উজীরকে সেখানে পাঠাইলেন। কিন্তু কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। ফিরোজ খাঁ তখন যুদ্ধ করিয়া সখিনাকে ছিনাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিলেন।

অপমানিত উমর খাঁ বাদশাহের দরবারে গিয়া নালিশ জানাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশা ফিরোজ খাঁকে ধরিয়া আনিবার জন্য ফৌজ পাঠাইলেন। যুদ্ধে বন্দী হইয়া ফিরোজ খাঁ কেল্লাতাজপুরে আনীত হইলেন।

এদিকে,—

ঘোড়ার পিঠেতে দেখি লৌএর নিশান
খালি ঘোড়া দেখ্যা বিবির উড়িল পরাণ।

স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সখিনা অনেক কাঁদিল। পরে স্বামী বন্দী হইয়াছেন জানিতে পারিয়া পুরুষবেশে যুদ্ধের সাজে সখিনা স্বামীর উদ্ধার সাধনে যাত্রা করিল। কেল্লাতাজপুরে গিয়া সখিনা একাই প্রচণ্ড রণ করিতে লাগিল। এমন সময়ে তাজপুর হইতে এক নফর আসিয়া বলিল—

দুষমণে করিল নাশ সোনার জঙ্গলবাড়ী
কে তুমি দরদী আইলা বুঝিতে না পারি॥

পুরুষবেশী সখিনাকে কেহই চিনিল না।

নফর পুনরায় বলিল—

আপোষনামা লইয়া আইলাম দেখা করিবারে
জঙ্গলবাড়ীর নফর আমি জানাই যে তোমারে।
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান মোরে দিলাইন পাঠাইয়া
খবর কহিতে তোমায় শুন মন দিয়া।
যার লাগ্যা জ্বলে আগুন জঙ্গলবাড়ী সরে
তালাক দিয়াছে দেওয়ান সেই সখিনারে।
বাকি যত বাদশার খেরাজ হপ্তার মধ্যে দিবে
লড়াই হইছে সাঙ্গ খবর জানিবে॥

সখিনার জন্য এত গোলমালের সৃষ্টি, তাই ফিরোজ খাঁ ভীত হইয়া সমস্ত বিপদের মূল সখিনাকে ত্যাগ করিয়া বাদশার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। অধিকাংশ পূর্ববঙ্গগাথাগুলিতেই দেখি পুরুষ চরিত্রকে হীন করিয়া নারী চরিত্রের মহত্ত্ব দেখান হইয়াছে।

নফর তখন,

এত বলি তালাক নামা তুল্যাদিল হাতে
পাঞ্জামরের চিহ্নকন্যা দেখিলেক তাতে।
তালাকনামা পড়ে বিবি ঘোড়ার উপরে।
সাপেতে দংশিল যেমন বিবির যে শিরে।
ঘোড়ার পিষ্ঠ হইতে বিবি ঢলিয়া পড়িল
সিপাই লস্করে যত চৌদিকে ঘিরিল।

অপ্রত্যাশিত এই নিষ্ঠুর সংবাদে সখিনা মাথা ঘুরিয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। মাথার মুকুট ভাঙ্গিয়া তাহার দীঘল কেশ বাহির হইয়া পড়িল। পুরুষের বেশ এলাইয়া পড়িল। তখন সকলে তাহাকে চিনিতে পারিয়া হায় হায় করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই খবর তাজপুরে পৌছিলে দেওয়ান উমর খাঁ,

আস্তা দেখে সোনার চাঁদ জমীনে লুটায়
তারে দেখ্যা উমর খাঁ করে হায় হায়।

দেওয়ান বুঝিতে পারিলেন যে, সখিনা মনে-প্রাণে ফিরোজকেই চাহিয়াছিল। দেওয়ানের আফশোষের অবধি রহিল না। উমর খাঁ কন্যার শোকে পাগলের মত হইয়া গেলেন।

ফিরোজ খাঁ আপন ভুলে অনুতপ্ত হইয়া কন্যার শোকে ফকির হইয়া গেলেন।

।৫। **হাতীখেদা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

ব্রহ্মদেশ হইতে আসামের উত্তরসীমা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে বৎসর বৎসর বহু সংখ্যক হাতী ধৃত হয়। এই হাতী ধরিবার এক একটি বিবরণকে গানের আকারে বাঁধিয়া পল্লীকবিগণ গাহিয়া বেড়াইতেন।

আলোচ্য গাথাটিতে অছি মিঞা নামে একজন বিখ্যাত শিকারী কিভাবে খেদা-নির্মাণপূর্বক অনেকগুলি হাতী ধরিয়াছিলেন তাহারই বিবরণ কাহিনীর আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

এই উত্তেজনামূলক শিকার কাহিনীটি খুব দ্রুত এবং কৌতুকাবহ ছন্দে রচিত হইয়াছে।

এই গাথাটি হইতে ব্রহ্মদেশ এবং আসাম অঞ্চলের হাতীশিকার সম্বন্ধে বেশ একটি স্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া যায়।

।৬। **চৌধুরীর লড়াই**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই গাথাটির পরিচয় দিতে গিয়া ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন—"ইহাকে ঐতিহাসিক গাথা বলা চলে। এই পালাটি প্রায় দেড়শত বর্ষ যাবৎ নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা গাহিয়া আসিতেছে। নোয়াখালীর গেজেটিয়ারে বাবুপুর পরগণার ইতিবৃত্ত উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে : 'এই পরগণার স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে রাজচন্দ্র নামক একব্যক্তি রঙ্গমালা নামক কোন নর্তকীর প্রেমে পড়িয়া ভয়ানক জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ঘটনা চৌধুরীর লড়াই নামক পালাগানে বিবৃত হইয়াছে'।"

কাব্যের নায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরী নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ জমিদার, রাজা বিশ্বম্ভর শূরের বংশোদ্ভব।

"অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ রাজনৈতিক দুর্দিনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই পালাটির মধ্যে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মোগল শাসন শিথিল হইয়া পড়িলে দেশে যে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অকথ্য। এই পালাগানের পত্রে পত্রে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাদের দুর্গতি যে কতটা হইতে পারে তাহা রাজচন্দ্র চৌধুরীর জীবন কাহিনী হইতে আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীন পালাগানগুলির মধ্যে যে পবিত্রতা, যে সতর্ক ভাষা এবং যে উন্নত চরিত্রের কাহিনী পড়িয়া আমরা বিস্মিত

ও আনন্দিত হইয়াছি এই পালাগান আদৌ সেগুলির মতো নহে। ইহা পাঠ করিলে দুর্নীতির চরম বৃত্তান্ত পড়িয়া পড়িয়া মনে একটা অবসাদের ভাব আসিয়া পড়ে। কিন্তু ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর রঙ্গ চিত্র—সত্যের প্রতিবিম্ব। এই পালাটিতে আমরা তৎকালীন সমাজের একখানি নিখুঁত চিত্র পাই।"

উপরোক্ত উক্তি হইতেই আমরা আলোচ্য গাথাটির যথাযথ পরিচয় পাই।

নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে ইহা বহুল প্রচলিত ছিল তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আব্দুল করিম সাহেব তাঁহার পুঁথি বিবরণীর ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় একটি 'চৌধুরীর লড়াই' নামক গীতের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ৩১৯ সংখ্যক পুঁথিশ্রেণীভুক্ত। করিম সাহেব তাঁহার পুঁথির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় নোয়াখালীতে ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন তত্রত্য আলাউদ্দীন নামক জনৈক গায়কের মুখ হইতে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। ইহার অত্যল্প পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে। মহম্মদ আব্দুল জব্বার নামক এক শিক্ষিত ব্যক্তি বড়ুয়া মহাশয়ের উক্ত হস্তলিপির অবলম্বনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের উপকার করিয়াছেন।

নোয়াখালী শহরের সাত মাইল উত্তরস্থিত বাবুপুরের জমিদারদের বৃত্তান্ত তদ্দেশে 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়। এই গ্রন্থখানি সেই গীতগুলিরই সংগ্রহ পুস্তক।

ইংরেজ শাসনের যখন তত কড়াকড়ি হয় নাই, তখন বাবুপুর, দত্তপাড়া প্রভৃতি স্থানের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণ সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। সেইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণ এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণিত ঘটনাটি সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল।"

এই দীর্ঘ উক্তি দুইটি এখানে তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্য এই যে, উপরোক্ত উক্তি দুইটির পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৩১২ সালে করিম সাহেব এই গীতকে ৮০।৯০ বৎসর পূর্বের রচিত বলিয়াছেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ডঃ দীনেশ সেন ইহাকে প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং গাথা রচনার সময় সম্বন্ধে উভয়েরই একমত। উভয়ের সংগ্রহই নোয়াখালী অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সুতরাং ঐ অঞ্চলে যে এই গাথাটি সুপ্রচলিত ছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ

নাই। গাথান্তর্গত কাহিনী সম্বন্ধেও উভয়েরই এক মতবাদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। করিম সাহেব তাঁহার সংগ্রহের সামান্য অংশবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন, সেইজন্য ইহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা সম্ভব নহে। ডঃ দীনেশ সেন তাঁহার সম্পূর্ণ সংগ্রহটি প্রকাশ করিয়াছেন। গাথাটি গানের পক্ষে বেশ উপযোগী। কাহিনী বৃহৎ। সত্য ঘটনার সহিত কল্পনা ও বর্ণনাপ্রাচুর্যের মিশ্রণে কাহিনীর দৈর্ঘ্য সাধারণ গাথা কবিতা অপেক্ষা একটু বেশি হইয়া গিয়াছে। খুব সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরূপ। মাঝে মাঝে 'ধুয়া'র প্রয়োগে পালাটিকে গীতের আকার প্রদান করা হইয়াছে।

বাবুপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র চৌধুরী অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এই পরগণার মালিক ছিলেন। নট্টজাতীয় (নর) আত্মানরের দুইটি সন্তান ছিল, একটি পুত্র গোপাল নর এবং একটি অসামান্যা সুন্দরী কন্যা রঙ্গমালা।

রামগতি নর ছিল কুব্জপৃষ্ঠ, ন্যুব্জদেহ এবং অতি কদাকার, কিন্তু তাহার পিতা বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। রঙ্গমালার রূপে মুগ্ধ হইয়া রামগতি আত্মানরকে অনেক টাকা দিয়া রঙ্গমালাকে বিবাহ করিল। কিন্তু কুৎসিত স্বামীকে রঙ্গমালা গ্রহণ করিতে পারিল না এবং বাসরঘরে গিয়া—

লাথি মারি রামগতিকে ফালাইয়া দিল।
কেবাড় ভাঙ্গি রামগতি উডগা লড় দিল॥

রঙ্গমালা পিতৃগৃহেই রহিয়া গেল। তখন রাজচন্দ্র চৌধুরীর উদ্দাম যৌবনকাল এবং সে ব্যভিচার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কেবল সুন্দরী নারী খুঁজিয়া বেড়ায়। গৃহে পরমাসুন্দরী স্ত্রী কিন্তু রাজচন্দ্র তাহার দিকে দৃকপাতও করিত না। শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর মুখে রঙ্গমালার রূপের বর্ণনা শুনিয়া রাজচন্দ্র উন্মত্তবৎ হইয়া গেল। গ্রাম্যকবির ভাষায় রসবতী শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর বর্ণনা উপভোগ করিবার মত। এই বর্ণনা তখনকার বৈষ্ণবীদের চরিত্রের একটি সম্পূর্ণ পৃথক দিক তুলিয়া ধরিয়াছে। রঙ্গমালা রাজচন্দ্রের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিল না, কিন্তু পরিবর্তে পিতা আত্মানরের নামে সুবিশাল এক দীর্ঘিকা খনন করিবার এবং নরদের বাড়ীর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নহবৎখানা প্রস্তুত করাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি করাইয়া নিল।

রাজচন্দ্র আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল এবং রঙ্গমালাকে খুসী করিবার জন্য দীঘি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তদ্দেশীয় সমস্ত ভদ্র-ইতর ব্যক্তিদের নরদের বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। রাজচন্দ্রের অত্যাচারের ভয়ে ভদ্রলোকেরা এই অপমান

সহিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইল না। সে ভাবিল যে, এই উপলক্ষ্যে যদি তাহার খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করিয়া রঙ্গমালার বাড়ীতে খাওয়ান যায় তবে রঙ্গমালার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রস্তাব শুনিয়া রঙ্গমালা রাজী হইল না, কিন্তু রাজচন্দ্র বলিল যে, তাহার খুল্লতাত তাহাকে খুব ভালবাসেন, তিনি কিছুতেই তাহার উপর রাগ করিবেন না। সুতরাং নিমন্ত্রণ করা হইল। পত্র পাইয়া রাজেন্দ্রনারায়ণ অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নরের বাড়ী খাইয়া জাত দিয়াছে এবং তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সেনাপতি চাঁদ ভাণ্ডারী এই কথা শুনিয়া বলিল:

একবার যদি ওরে খুড়া তোমার হুকুম পাই।
নরের বংশ কাড়ি আমি সায়রে ভাসাই॥

রাজেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তাই তাহার এবম্বিধ দুষ্কার্যের পরেও ভাণ্ডারীর কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন:

যাও যাও চান্দ ভাণ্ডারী কই তোমার ঠাঁই।
তিরগুল্লি না লাগে ভাতিজার গায় কহিয়া বুঝাই।

হুকুম পাইয়া চাঁদ ভাণ্ডারী চলিল। অবশেষে রঙ্গমালার আশঙ্কাই সত্য হইল:

এই পত্র পত্র নয়রে পত্র বিষম কাল।
এই পত্র হইতে আমার ঘটিবে জঞ্জাল॥

চান্দ ভাণ্ডারী কৌশলে রাজচন্দ্রকে নরের বাড়ী হইতে সরাইয়া আনিয়া ভাঙের সরবৎ পান করাইয়া তাহাকে গাঢ় নিদ্রাভিভূত করিয়া নরের বাড়ী গিয়া প্রথমেই রঙ্গমালার গৃহে প্রবেশ করিল। রঙ্গমালার রূপদর্শনে কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং পরমুহূর্তেই সে তাহাকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। তখন রঙ্গমালা কাঁদিতে লাগিল:

এই সময়ে যদি দেইখতাম রাজচন্দ্রের মুখ।
তুই চান্দা কাইটতি কল্লা না পাইতাম দুখ॥
এই সময় শুইনতাম যদি রাজচন্দ্রের কথা।
তুই চান্দ কাইটতে কল্লা না পাইতাম ব্যথা॥

কিন্তু রঙ্গমালার মতি স্থির নহে, ইহার পরই সে বলিতেছে:

মাইর না মাইর না চান্দা তোমায় ভালবাসি।
খুসী থাক মোরে লই হই তোমার দাসী॥

প্রাণের ভয়ে রঙ্গমালা আপন ভালবাসার পাত্রকেও ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু রঙ্গমালার ভ্রাতৃস্নেহ প্রশংসার্হ। চান্দ যখন তাহার ভাই গোপাল নরকে হত্যা করিতে উদ্যত তখন রঙ্গমালা বলিতেছে :

আমি কইরাছি দোষ মারিবা আমারে।
আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া কোন দোষ না করে॥

এইস্থানে রঙ্গমালার উক্তি করুণ ও হৃদয়গ্রাহী।

কিন্তু, কান্দাকাটি চান্দ ভাঁড়ালী কিছু না শুনিল।
ভাই বৈন দোনপারে যন্তরেতে দিল॥

অতঃপর নরদের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া রঙ্গমালার কর্তিত মুণ্ড সঙ্গে লইয়া সে বাবুপুর অভিমুখে ছুটিল। রাজেন্দ্রনারায়ণ রঙ্গের কর্তিত মুণ্ড দেখিয়া বলিলেন :

কি করিছ চান্দ ভাঁড়ালী না জানাইয়া মোরে।
এহেন সুন্দর রঙ্গ কাইটলা কি প্রকারে॥
রঙ্গের মুণ্ড কাটিয়াছ তাতে ক্ষতি নাই।
ভাতিজা হইব পাগল রঙ্গমালার লাই॥

অপূর্ব ভ্রাতুষ্পুত্র স্নেহ! রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজচন্দ্রের জন্যই ব্যস্ত।

এদিকে নেশাভঙ্গে প্রধূমিত নরগৃহ দেখিয়া রাজচন্দ্র চমকিয়া উঠিল। অশ্বারোহণে নরদের বাড়ী ছুটিয়া গিয়া যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও রঙ্গের মস্তক দেখিতে পাইল না। তখন রাজচন্দ্র নিকটবর্তী বড় জমিদার ইন্সা চৌধুরীর শরণাপন্ন হইল। এইখানেই চৌধুরীবংশের গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত। রাজচন্দ্র আপন খুল্লতাত-এর স্নেহ বুঝিতে পারিল না। সুন্দরী নারীর মোহে সে গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া তুলিল। মুসলমান জমিদার ইন্সা চৌধুরী রাজচন্দ্রের নিকট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই ব্যাপারের মীমাংসার জন্য রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং ইন্সা চৌধুরীর মধ্যে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন গভীর রাত্রে অতর্কিতে প্রভুভক্ত চাঁদ ভাণ্ডারী ইন্সা চৌধুরীর বাড়ীর গড়খাই কৌশলক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া বৃদ্ধ চৌধুরী ও বাটীস্থ বহু ব্যক্তিকে হত্যা করিল। ইন্সা চৌধুরীর তিন পুত্রবধূ কৃপাণ হস্তে চাঁদ ভাণ্ডারীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইন্সা চৌধুরীর একটি মাত্র পুত্র কেবল এই হত্যাকাণ্ড হইতে

রক্ষা পাইল। সে তাহার মাতুলালয়ে গিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল। মাতুল-ভাগিনেয়ের মিলন কবি করুণ রসাত্মক ভাব ও ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। মাতুল মনোহর গাজী অতঃপর বহু সৈন্যসহ রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ী আক্রমণ করেন। খুল্লতাত পলাইয়া গেলেন এবং রাজচন্দ্র বাবুপুরের গদিতে অধিষ্ঠিত হইল। শেষদৃশ্যে রাজচন্দ্র তাহার খুল্লতাতের পদতলে পড়িয়া সাশ্রুনেত্রে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল। সে আপন ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজেন্দ্রনারায়ণ কাশীবাসী হইলেন।

"চৌধুরীর লড়াই" ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও উপরোক্ত কাহিনীতে ঐতিহাসিক তথ্য ছাড়াও কবিকল্পনার বিচিত্র সমাবেশ অনস্বীকার্য নহে।

।৭।' **সুজা-তনয়ার বিলাপ**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই গীতটি দিল্লীর সম্রাট সাহ সুজার জীবনেতিহাসের তিমিরাচ্ছন্ন শেষ অধ্যায় অবলম্বন করিয়া রচিত। সুজার শেষজীবন সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ প্রচলিত। তাহারই একটির উপর ভিত্তি করিয়া এই কাহিনী রচিত।

'রাজমালা'র গ্রন্থকার কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন : "সুজার পত্নী পরিভানুর রূপ ও গুণগাথা এক সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। সেইসকল গ্রাম্যগীতি এখন বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইয়াছে।" সুজা-তনয়ার এই বিলাপোক্তির ক্ষুদ্র গাথাটিও এই জাতীয়।

সুলতান সুজার কাহিনী লইয়া রচিত এইরূপ ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত রচনা আরও মিলিয়াছে, কিন্তু কোনটির সহিত কোনওটির মতের মিল নাই। ইহাতে মনে হয় যে, পল্লীকবিগণ প্রচলিত মতবাদের উপরেই আপন আপন কাহিনী রচনা করিতেন। যে অঞ্চলে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল সেই অঞ্চলের কবি সেই মতবাদকেই আপনার কাহিনীর অন্তর্গত করিতেন। সুতরাং এই সমস্ত গাথার অন্তর্গত ঐতিহাসিক তথ্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে এই সমস্ত প্রচলিত গাথা হইতে সাহ সুজার শেষ জীবনের দুঃখ-দুর্দশার সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তাহার মূল্য কম নহে।

আলোচ্য গানটি ক্ষুদ্র। হয়তো ইহার সহিত আরও সংযোজনা ছিল যাহা কালক্রমে গায়েনগণ-এর বিস্মৃতির মধ্য দিয়া একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আরাকানরাজ সুলতান সুজার বিপদকালে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু আরাকানরাজ আশ্রয়দাতা হইয়াও শেষ পর্যন্ত

সুজার সহিত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ প্রচলিত।

আলোচ্য গাথাটিতে কেবল সুজা-তনয়ার বিলাপোক্তি বিবৃত। কিন্তু সুলতান কন্যার এই বিলাপোক্তি হইতেই অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, আরকানরাজ সাহ সুজাকে তাঁহার পত্নী পরিভানু ও একটি কন্যাসহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করেন। সুজা-তনয়া বিলাপ করিতেছেন—

ধুয়া—নছিব একি ছিলরে।
কি নাইয়র করালি মা বাপ ঠেইক্‌লাম মঘ্যার হাতে।
এত দুখখ খোদা মোর লেখিলা বরাতে ॥
মা ভৈনরে হারাইলাম—হারাইলাম বাপ তোরে।
মঘ্যা রাজা ছল করিয়া লুইট্যা নৈল মোরে ॥
হায় লুইট্যা নৈল মোরে—

আরকানের সর্বত্রও এই প্রবাদই প্রচলিত। রচনাটিতে বাক্যের পুনরুক্তি ও 'ধুয়া'র সমাবেশ ইহাকে গীতের আকার দিয়াছে।

বন্দিনী সুজাতনয়া 'নাপপী' খাইতে, 'কালোখামী' পরিতে এবং কর্ণে সোনার 'নাধং' ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মোগলরাজার সন্তানের পক্ষে ইহাপেক্ষা বড় শাস্তির বিষয় আর কি হইতে পারে। তাই চোখের জলে ভাসিয়া মৃত পিতার প্রতি পুত্রীর অনুযোগ—

বারে বারে কৈলামরে বাপ নাইয়র ন দিছ মোরে।
জীঁয়তা রাখিয়া কেন মাড়ি দিলি গোরে ॥
হায় মাড়ি দিলি গোরে—

এই কষ্ট অপেক্ষা মৃত্যুই সুজা-তনয়ার অধিক কাম্য। এই জীবন্মৃত অবস্থায়—

ক্ষুধা তিষ্টা মালুম নাইরে কাঁদিব রাইত দিন।
মঘ্যা রাজার খানা খাইতে মনত আইয়ে ঘিন ॥
এক সোনাই রাধেরে ভাত বাড়ীছুদ্দা খায়।
বাছন ভরা নাপ্‌ফি-পোঁচা* গিলা যে না যায় ॥
আমার গিলা যে না যায়রে—

---

* 'নাপ্‌ফি-পোঁচা'—পচা মৎস্য দ্বারা তৈয়ারী একপ্রকার খাদ্য, আরাকানিজদের পরম প্রিয় খাদ্য।

সুজা-তনয়া পূর্বজীবনের সহিত আপন বর্তমান জীবনের তুলনা করিয়া কাঁদিতেছেন—

আচমানেরি ফুলরে ছিলাম আচমানেরি ফুল।
মঘ্যা রাজার হাতত পড়ি দিলাম জাতি কুল॥
সায়গরের তলে মা-বাপ করিলি কয়বর।
হার্মাত্যার মুল্লুকে আমার কে লৈবে খবর॥
মা-বাপ কে লৈব খবর রে—
নছিব একি ছিলরে।

এইখানেই গীতটি সমাপ্ত। কান্নার প্রতি ছত্রে, ছত্রে সুজা-তনয়ার অন্তরের করুণ আক্ষেপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পালাটি হইতে মগজাতির আচার-আচরণ সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা যায়। এই কয়েকটি মাত্র ছত্র হইতেই আমরা মগেদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার, বিহার ও অলঙ্কারাদির পরিচয় পাই। অথচ, এই সকল বিবরণের বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক রূপে আনা হয় নাই। সুজা-তনয়ার বিলাপের সহিত এই সব বিবরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে। গ্রাম্যকবির রচনাকৌশল এই কৃতিত্বের পরিচায়ক। মাত্র ২৮টি ছত্রের মধ্য দিয়া এক রাজকুমারীর বিলাপের মাধ্যমে কবি আমাদের চোখের সামনে একটি জাতির আচার-ব্যবহারের সম্পূর্ণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন।

গাথাটি চট্টগ্রামে প্রচলিত ভাষায় প্রচলিত ছিল। মুদ্রিত গাথাটিতে ভাষা অনেক সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হইলেও ইহা যে চট্টগ্রামে প্রচলিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ গাথাটির অন্তর্গত চট্টগ্রাম-প্রচলিত শব্দবাহুল্য। গাথাটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্য দিয়া একটি পূর্ণ কাহিনীর আভাস মিলিতেছে। গাথাটির রচনাও গীতোপযোগী। ইহা একটি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক গাথা না হইলেও, ইহা একটি বিশুদ্ধ গাথার ভগ্নাংশ। এই ধরনের রচনাগুলি গাথাকাব্য হিসাবে সার্থক সৃষ্টি। কিন্তু "এই পালাগানগুলি উদ্ধার করিতে পারিলে হতভাগ্য সাহ সুজা ও তাঁহার স্বজনবর্গের শেষ-জীবন সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া মনে করি" দীনেশচন্দ্র সেনের এই উক্তি সর্বথা গ্রাহ্য নহে। এই গাথাগুলি হইতে তদঞ্চলে প্রচলিত বিবিধ ভ্রান্ত মতবাদ জানা গেলেও তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুব কমই মিলিবে। নিরক্ষর গ্রাম্যকবিগণ সামান্য সূত্র ধরিয়া লইয়াই তাঁহাদের কাহিনী রচনা করিতেন।

ঐতিহাসিক সত্যাসত্যের জন্য তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। জনগণের মন হরণ করিবার জন্য তাঁহারা আপন আপন প্রতিভা ও কল্পনাশক্তিবলে কাহিনীকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য তাঁহাদের কাহিনীর ভিতর আত্মগোপন করিত।

।৮। **বারতীর্থের গান**—রচয়িতা সজুবয়াতি।

এই গানটি ১২৮০ সালে রচিত হয়। সুতরাং ইহা খুব পুরাতন নহে। এই পালাটিতে প্রতি পংক্তির শেষে 'হে-হে-হে' শব্দ জুড়িয়া গানের রেশ আনা হইয়াছে। গাথাটি মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন যে, মধুপুরের জঙ্গলে এই বারতীর্থ এখনো বিদ্যমান। ইহা মৈমনসিংহ পরগণার জোয়ানসাহীর অন্তর্গত।

এই পালাটি হইতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। মধুপুর জঙ্গলের কঠিন রক্তবর্ণ ভূমি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। যে সব প্রাচীন কীর্তি মধুপুরের এই জঙ্গলে দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় বড় দীর্ঘিকাগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অনেকগুলি ভগদত্ত রাজার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট।

এই গানে পরগণা জোয়ানসাহীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পরগণাটি কস্তাহলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের জনৈক মুসলমান ধর্মাবলম্বী বংশধর কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

এই গীতের নায়ক ভগবন্তের সঙ্গে মহাভারতের প্রসিদ্ধ ভগদত্তের কোন সম্বন্ধ নাই। এই গীতির ভগদত্ত সম্ভবতঃ ৯ম খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই গীতিকার কিছু অংশ বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। ভগদত্ত নামক কোন রাজা তাঁহার মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া অতি বৃহৎ একটি দীর্ঘিকা খনন করেন এবং সেই দীর্ঘিকায় ভারতীয় দ্বাদশতীর্থের জল ঢালিয়া উহা পবিত্র করেন। এ কথার মধ্যেও কতকটা ঐতিহাসিক তথ্য থাকিতে পারে যে তদ্দেশীয় প্রজারা ভগদত্তের ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি কতকটা দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। আর সমস্ত কথাই লোককল্পনাসৃষ্ট অবাস্তব কাহিনী। গীতোক্ত কাহিনীটি এইরূপ—

জোয়ানসাহীর রাজা ভগদত্ত। তাঁহার ছোট ভাই রামচন্দ্র। ভগদত্ত রাজা অসাধারণ মাতৃভক্ত। তাঁহার মাতা বারতীর্থে স্নান করিতে চাহিলে রাজা চমকিত হইলেন এবং বলিলেন—

তোমার শরীল ভাইঙ্গা গেছে রক্ত হইচে য্যান পানি
থরথরাইয়া মাথা কাঁপে (আর) পা-ও যে দুইখানি ॥
হে-হে-হে
চোক্কে দেহ না মাগো কথা শোন না দুই কানে।
তোমাকে নিয়া তীর্থ্যে যাওয়া হয়বা ক্যাম্‌নে ॥
হে-হে-হে

স্নেহশীল পুত্র মাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত। তাই রাজা বলিতেছেন—

চরণ ধরি মা জননী আমার কথায় দেও মা কান।
(এই) বারতীর্থ্যের পানি আইনা করামু তোমাক চান ॥
হে-হে-হে
বেবাক তীর্থ্য ঘুইরা আনমু বারতীর্থ্যের পাক পানি।
সেই পানি মা ঢাইলা দিমু বানাইয়া পুষ্কুনী ॥
হে-হে-হে
বারতীর্থের সেই জলে মা নিত্যি তুমি কইরবা চান।
অন্তিমকালে ভেস্তে যাবা ঠাণ্ডা হবো জান ॥
হে-হে-হে ॥

পুত্রের কথায় মাতা আনন্দিতা হইয়া একতাড়া সূতা ভগদত্তকে দিয়া বলিলেন যে পুষ্করিণী এই সূতার পরিমাণানুযায়ী হইবে। এই নলি সূতা খুলিতে চারদণ্ড বেলা হইয়াছিল। সুতরাং সূত্রটি বেশ দীর্ঘ ছিল বোঝা যায়। রাজার মন্ত্রিগণ বলিলেন যে, এরূপ বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা রাজকোষে নাই। কিন্তু উত্তরে—

রাজা কইল মায়ের হুকুম পিরতিজ্ঞা কইরাছি যা।
রাজিত্যি আর পরাণ গেলেও করব আমি তা ॥

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের উপর রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং তীর্থসলিল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ভগদত্ত প্রবাসী হইলেন। রামচন্দ্র প্রকৃত অযোধ্যার রামচন্দ্রের ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। ধানের বদলে তুষ লইয়া রাজকর গ্রহণ করিতেন। কোন প্রজাকে রাজসভায় ডাকিতে হইলে পাছে পথশ্রমে ক্লান্ত হয় এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদিগের জন্য হাতী পাঠাইয়া দিতেন। গরীব-দুঃখীদের তিনি মা-বাপ স্বরূপ হইলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যখন রাজা ভগদত্ত

ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রজারা তাঁহার নিকট রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বলিল। মর্মাহত হইয়া রামচন্দ্র নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে প্রজাদিগকে এই অভিশাপ দিলেন যে, তাহারা কখনই সুখী হইবে না এবং এই বৃহৎ সাম্রাজ্যটি জঙ্গলে পরিণত হইবে।

তারপর বহুদিন কাটিয়া গেল। প্রজাদের লালন-পালন করিয়া—

কীর্তি থুইয়া মইরা গেছে ভগদত্ত রাজার মাও।
(ওরে) দিনে দিনে জোঙ্গলা হৈল পায়না বাতাস বাও॥
হে-হে-হে

এবং কালের গতিতে রামচন্দ্রের অভিশাপই যেন ফলিল, কবি তাঁহার রচনার শেষ পংক্তিতে এই আভাস দিয়াই শেষ করিয়াছেন—

রাজা গেছে প্রেজা গেছে গেছেরে ভাই ঠাট ঠমক।
উজাড়-ভিটা পইরা রইছে এ্যাহন শিয়ালের বৈঠক॥
হে-হে-হে

রচনাটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে গাথার একটি পূর্ণ রূপ পাই।

। ৯। **শীলাদেবী**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন "পালাটির ঘটনা সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক। মৈমনসিংহের বহুস্থানে শীলাদেবী সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। উক্ত জেলায় নব-বৃন্দাবনের আরণ্য প্রদেশে শীলাদেবী সংশ্লিষ্ট অনেক কাহিনী এখনও পাওয়া যায়।"

গাথান্তর্গত কাহিনীটির বিবরণ নিম্নে দিতেছি—

বামুন রাজার দশ বৎসরের কন্যা শীলা রূপে গুণে অনুপম। রাজকন্যা শীলার রূপবর্ণনায় পল্লীকবির মার্জিত রুচি ও বর্ণননৈপুণ্য প্রশংসনীয়। রাজকুমারী শীলার যৌবনোদ্গমের চিত্রটি কবি অপরূপ প্রাঞ্জলতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পাঁচ বছর পর মুণ্ডা রাজদরবারে আসিয়া পাওনা মজুরী হিসাবে রাজার কাছে শীলাদেবীকে প্রার্থনা করিল। পাঁচ বছর পূর্বে এই জঙ্গলী মুণ্ডা ঘুরিতে ঘুরিতে বামুন রাজার দেশে আসিলে রাজা তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া এবং তাহার স্বাস্থ্যসমন্বিত চেহারা দেখিয়া তাহাকে কোটালের কাজে বহাল করিয়া-

ছিলেন। এখন সেই মুণ্ডার স্পর্ধা দেখিয়া বামুন রাজা রাগে জ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার আদেশে মুণ্ডাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল, কিন্তু—

রাত্রি নিশাকালে মুণ্ডা ছিকল ভাঙ্গিয়া।
গেল ত জঙ্গল্যা মুণ্ডা জঙ্গলে পলাইয়া॥

তিন বৎসর ধরিয়া জঙ্গলীদিগকে একত্র করিয়া মুণ্ডা অতর্কিতে বামুনরাজার দেশ আক্রমণ করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইল। রাজা রাজকন্যা, শীলাদেবীকে লইয়া বিদেশী এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আশ্রয়দাতা রাজার একটি সুন্দর পুত্র ছিল। রাজপুত্র ও রাজকন্যা পরস্পরকে ভালবাসিত। কিন্তু মুণ্ডাকে পরাজিত করিতে না পারিলে বামুনরাজা কন্যা দান করিবেন না জানিয়া পিতার অনুমতি লইয়া রাজপুত্র মুণ্ডাদমনে চলিল ও

তীর খাইয়া জঙ্গল্যা মুণ্ডা গেল তো পলাইয়া।
রণ জয় কইরা কুমার গেল দেশে তো ফিরিয়া॥

তখন পরগণার রাজা ও বামুন রাজা একমত হইয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিলেন। বামুনরাজা কন্যা লইয়া আপন দেশে ফিরিলেন। কিন্তু বিবাহের দিন মুণ্ডা আবার দলবল লইয়া বামুনরাজার পুরী আক্রমণ করিল। রাজপুত্র বিবাহ বাসর হইতে উঠিয়া যুদ্ধে চলিল। যুদ্ধে রাজপুত্র নিহত হইলে শীলাদেবী পতিশোকে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিল।

বামুনরাজা শোকে, ক্রোধে অস্থির হইয়া ত্রিপুরার রাজার শরণ লইলেন এবং সৈন্য সাজাইয়া যুদ্ধে চলিলেন। মুণ্ডারা জঙ্গলী জাতি, লুঠতরাজ করিতেই জানে কিন্তু শাস্ত্রসম্মত উপায়ে যুদ্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ। কাজেই সুশিক্ষিত সৈন্যদলের হস্তে তাহারা পরাজিত হইল। তখন,

দড়িবেড় দিয়া সবে মুণ্ডারে ধরিয়া।
তিরপুরার সরে দেখ দাখিল করলো নিয়া॥
রাজার হুকুমে মুণ্ডারে সবে ময়দানে খাড়াইল।
তিন তোপ মারিয়া তারে শুইনে উড়াইল॥

পালাটি গীতছন্দে রচিত।

।১০। **ভারইয়া রাজার কাহিনী**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

মৈমনসিংহ অঞ্চলে এই কাহিনীটি প্রচলিত ছিল। এই গানটিতে ভারইয়া রাজার সহিত ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহের যুদ্ধের বিবরণ আছে। ভারইয়া রাজা

কোচজাতির রাজা ছিলেন। গাথাটিতে মন্ত্রতন্ত্রের প্রভাব দেখিয়া মনে হয় কাহিনীটির উৎপত্তিস্থল কোচবিহারের গ্রামাঞ্চল। কামাখ্যার নিকটবর্তী বলিয়া কোচবিহারের অধিবাসী কোচগণও নানা মন্ত্রতন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিত। কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে এখনও এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধ যোগী, গুণীর দেখা পাওয়া যায়। কোচবিহারের রাজবংশ ক্ষত্রিয় জাতি। ভারইয়া রাজা সম্ভবতঃ এই রাজবংশেরই কোনও রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই কাহিনী মৈমনসিংহ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

এই গাথার অন্তর্গত কাহিনীটি সুন্দর। ঐতিহাসিক তথ্য থাকুক বা না থাকুক গাথাকাব্য হিসাবে এই কাহিনীটি মর্যাদা লাভের যোগ্য। কাহিনীটি এইরূপ—

কুচ রাজা ভারইয়া লোক লাগাইয়া জঙ্গল কাটাইয়া হাল চাষ করাইতে আরম্ভ করিলে এই কথা ক্ষত্রিয় রাজা বীরসিংহের কাণে গেল। এই জমিটি ক্ষত্রিয় রাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বীরসিংহ তখন ভারইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ভারইয়া রাজার যাদুমন্ত্রের প্রভাবে বীরসিংহ হারিয়া গেলেন এবং বন্দী হইলেন। অবশেষে কুমারের সহিত ভারইয়া রাজার রূপবতী কন্যা চম্পাবতীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়া বীরসিংহ মুক্তি লাভ করিলেন। কিন্তু জঙ্গলী ভারইয়া রাজার সহিত আত্মীয়তা স্থাপনে অনিচ্ছুক বীরসিংহ আপন প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিয়া গিয়া দ্বিতীয়বার পুত্রকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। এবারও যাদুমন্ত্রপূতঃ ধূলিমুষ্টির প্রভাবে রাজপুত্র বন্দী হইলেন এবং তাঁহার মৃত্যুদণ্ড আসন্ন হইল।

ভারইয়া রাজকন্যা কুমারকে চাক্ষুষ না দেখিলেও পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতি শিরোধার্য করিয়া লইয়া রাজপুত্রকে স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলেন। রাজপুত্রের বন্দীদশায় রাজকন্যা চম্পাবতী অধীর হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় অঙ্গভূষণ উৎকোচস্বরূপ দিয়া কারারক্ষকের নিকট হইতে কারাগারে প্রবেশের অনুমতি লাভ করিলেন।

রাজকুমারী কুমারকে শৃংখলমুক্ত করিয়া বিদায় দিলেন। যুবরাজ কৃতজ্ঞচিত্তে অশ্বারোহণে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় প্রকৃতি ও চন্দ্রসূর্য সাক্ষী মানিয়া রাজকন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে স্বীকার করিয়া গেলেন।

বীরসিংহ এই অপমান ভুলিলেন না। প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তিনি কামাখ্যায় গিয়া মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়া আসিলেন এবং মন্ত্রপূতঃ ধূলিমুষ্টি ভারইয়া রাজার উপর নিক্ষেপ করিয়া জন্মের মত তাহাকে পাষাণ করিয়া দিলেন।

ভারইয়া রাজার ঐশ্বর্য ও সিংহাসন বীরসিংহের করতলগত হইল। এই অবস্থায় ভারইয়া রাজার বিধবা পত্নী বীরসিংহকে পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা বলিয়া কন্যাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইলে বীরসিংহ কদর্য ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দিলেন। রাণী এই অপমানে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন।

শোকে দুঃখে চম্পাবতী পাগল হইয়া গেলেন।

পাগেলা রাজার কন্যা কাইন্দা কাইন্দা ফিরে।
পাষাণ ভারইয়া রাজার দুই আঁখি ঝরে॥

কন্যার দুঃখে পাষাণেরও চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল কিন্তু নিষ্ঠুর বীরসিংহ ও তাঁহার পুত্রের হৃদয় টলিল না।

গাথাটিতে নায়কের চরিত্র অতি হীন দেখান হইয়াছে। কিন্তু নায়িকার চরিত্র ধোপার পাটের 'কাঞ্চনমালা' এবং 'মহুয়া' ও 'মলুয়া'র সহিত এক আসনে বসাইবার যোগ্য।

। ১১। **পরীবানুর হাঁহলা**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

'হাঁহলা' অর্থে 'সহেলা'। পূর্ববঙ্গের বিবাহ বাসরে এইরূপ সহেলা গাহিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

পালাটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। গাথাটিতে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার খুব বেশী। মাঝে মাঝেই 'সাইগরে ডুপালি পরীরে' ধুয়া দ্বারা রচনাটিকে গীতোপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছে। 'সুজা-তনয়ার বিলাপ' ও আলোচ্য গাথাটির ঐতিহাসিক পটভূমিকা এক। এই পালাটিতে অতি সংক্ষেপে করুণরসের ধারা অব্যাহত রাখিয়া সুজা বাদশাহের শেষ কয়েকটা দিনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কিনা বলা যায় না। তবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কবি এই গানের ভিতর দিয়া যে কাহিনীটি ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা মর্মস্পর্শী। কাহিনীটি এইরূপ—

সাহ-সুজা দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া কিছুদিন চট্টগ্রামে ছিলেন। তারপর চাটগাঁ ছাড়িতে তাঁহার মন হইল। তখন পত্নী ও দুই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া সুজা চাটগাঁ ছাড়িয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরাকানের উদ্দেশে চলিলেন। দেশের সকলেই সুজাকে আরাকান যাইতে মানা করিতে লাগিল। কিন্তু 'ন শুনিল কথা বাদসা ন শুনিল মানা'। এক রোসাঙ্গ্যার নৌকায় চড়িয়া বাদসা রোসাং সহরে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোসাঙ্গের রাজা প্রথমে সুজা যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন জানিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিন্তু

পরেতে জানিলা রাজা সুজা বাদসার হাল।

তখন,

রাজার সঙ্গেতে তান চুক্তি হৈল শেষে।
ঘর বাড়ী ছাড়ি সুজা রৈল রোসাং দেশে॥

কিন্তু এ বন্ধুত্ব বেশীদিন রক্ষা পাইল না। হঠাৎ রোসাঙ্গ্যার রাজা একদিন সুজাপত্নী পরীবানুর রূপ দেখিয়া লালসামত্ত হইয়া উঠিলেন। সুজা এই কথা জানিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন।

আদিগুড়ি কথা সুজা যখনে শুনিল।
কাঁদিয়া পরীর কাছে কহিতে লাগিল॥
দোন চোখে পানি তান পড়ে ঝরি ঝরি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে।

সুজার পত্নীপ্রেম কবি অপূর্বভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশেষে তাঁহারা দুই কন্যাকে রাখিয়া রাত্রি প্রভাত না হইতেই সমুদ্রতীরে গেলেন। 'সুজা-তনয়ার বিলাপে' দেখিতে পাই এক কন্যা আরাকান রাজপুরীতে জীবিতা ছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

মা ভৈনরে হারাইলাম—হারাইলাম বাপ তোরে।

বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ ও কাহিনীগুলির প্রচলন বহুলতাই এই বৈষম্যের কারণ।

সমুদ্রতীরে গিয়া বাদশা একজন জেলের নিকট হইতে একটি নৌকা চাহিয়া নিয়া বেগমকে লইয়া সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। পরীবানু আপন গলার হার জেলের হাতে দিলেন। দুই কন্যার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা নৌকা ছাড়িলেন। সুজা বাদশার অনভ্যস্ত হস্তে নৌকা মাঝ সমুদ্রে গিয়া পড়িল। সকাল হইয়া গেল। চারিদিকে অকূল সমুদ্র। সুজার হাত অবশ হইয়া আসিতেছে। ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে নৌকা আর ঠিক থাকে না। তখন সুজা ও পরীবানু আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। মরণও তাঁহাদের পৃথক করিতে পারিল না।

ডুপিল ডুপিল সুকা—সুজা পরীজান।
দরিয়ার মাঝে হায় দিলরে পরাণ॥
মরণেও রইল তারা বুক জড়াজড়ি রে।
সাইগরে ডুপালি পরীরে—
হায় হায় দুখে মরি রে

।১২। **সোনারায়ের জন্ম**—রচয়িতা অজ্ঞাত।

এই পালাটি চাঁদরায় ও তাঁহার পুত্র সোনারায় সম্বন্ধে একটি সত্যঘটনাকে অবলম্বন করিয়া রচিত। কিন্তু পালাটিতে বৃত্তান্তটি স্পষ্ট ধরা পড়ে নাই, মাঝে মাঝে সত্য ঘটনার ছায়া পড়িয়াছে মাত্র। যে প্রবাদের উপর ভিত্তি করিয়া এই কাহিনীটি রচিত তাহার বিষয় অনেক প্রবন্ধ পত্রিকা হইতে জানা গেলেও প্রবাদ-ঘটনাটির ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ও সোনারায় যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহা বলাই বাহুল্য।

এই গাথাটিতে গাথাকাব্যের বৈশিষ্ট্য "কোন কোন ছত্রের বারবার পুনরুক্তি" বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ইতিহাসের উপকরণগুলি যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিয়া পল্লীকবির কল্পনাসৃষ্ট এই কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধরণের পালাগানগুলি সম্বন্ধে ক্ষেত্রকুমার বাবু লিখিয়াছিলেন—"এগুলি অন্যান্য পালাগানের মত সুরে গান হয় না। যাহা শুনিলাম তাহা একরকম সুর ধরিয়া আবৃত্তি করা মাত্র। সে রকম সুরকে গানের সুর বলা চলে না, ছড়ায় আবৃত্তি মাত্র।"

রচনাটিতে কাহিনী অংশ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত, কাহিনীর মূল সুরটি ঠিক ধরা যায় না। ইহা কোনও প্রচলিত গাথাকাব্যের অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। গায়েনদিগের মধ্যে অত্যধিক প্রচারের ফলেই ইহার এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে পল্লীগাথাগুলি প্রতিভাসম্পন্ন গায়েনগণের হাতে পড়িয়া সময় সময় যেমন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিত, তেমনি অনেক সময় আলোচ্য গাথাটির ন্যায় তাহারা অযোগ্য গায়েনের হাতে পড়িয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। আলোচ্য গাথাটিতে পল্লীগ্রামের চলতি কথা অনেক পাওয়া যায়।

যেমন—

এই না সোনারায়কে কে করিবেক হেলা।
গলায় গবপুল লামব, চক্ষে নামব ঢেলা॥

চাঁদরায়ের পুত্র হইয়াছে। মায়ে নাম রাখিল সোনারায়। আঁতুরঘরে ধাই সোনারায়কে মায়ের কোলে তুলিয়া দিল। ইহার পরই সোনারায়ের শিকার-যাত্রার বর্ণনা। অতঃপর বন কাটিয়া সোনারায় নগর বসাইল এবং তাহার নাম রাখিল সোনাপুরী। এই পুরী তৈয়ারী হইবার পরই সোনারায়ের বিবাহের কথা চলিতে লাগিল। কিন্তু বেগমকন্যাকে বিবাহ করিয়া জাতি দিতে অস্বীকার করায় সোনারায় বন্দী হইল। ইহার পরই পড়শীদের মুখের কথায় জানা

গেল যে সোনারায় বিবাহ করিয়াছে। সে বিবাহ কেমন করিয়া কোথায় হইল তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

বিয়া কইর‍্যা সোনারায় বাড়ীতে চল্যা যায়।
মাঝি মাল্লা গুণ ধরিয়া সোনার ডিঙ্গা বায়॥

কিন্তু বিবাহ করিয়া ফিরিবার পথে ব্রহ্মপুত্রের কূলে সোনারায় পীরকে ছিন্নি না দিয়াই চলিয়া গেল। তখন পীরের হুকুমে বার মেঘা রণের পরী লইয়া রণ করিতে আসিল।

পীরের হুকুমে সোনারায় বন্দী হইল। ফুল বেগম দ্বাররক্ষককে উৎকোচ দিয়া সোনারায়কে মুক্ত করিয়া দিল।

এদিকে সোনারায়ের মাতা পীরের ছিন্নি দেওয়াতে পীর সন্তুষ্ট হইলেন এবং ডিঙ্গা ভাসিয়া উঠিল। এইখানে পীরের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। পীরের মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশ্যেই গাথাটি রচিত বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই মনে হয় গাথাটির রচয়িতা মুসলমান কবি।

ইহার পর আর সোনারায়ের কোনও কথা নাই হঠাৎ অসংলগ্নভাবে ইহার পর পাই,

উত্তর থাকি আল এক বামন পণ্ডিত।
বামনের নাম তল্লাপাত্র বামনীর নাম খাজা॥
সেই না ঘরে জন্মাইল সোনারায় নামে রাজা।

মনে হয় পালা সংগ্রাহকের সংগ্রহ দোষেই পালাটি এইরূপ অসংলগ্ন রূপ নিয়াছে। যেখানেই সোনারায়ের নামোল্লেখ আছে সেই অংশই সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা একই পালার অন্তর্ভুক্ত কিনা তাহা লক্ষিত হয় নাই।

গাথাকাব্যের প্রচলন কমিয়া গিয়াছে। গায়েনগণ-এর ভিতরও এখন ইহার তত চর্চা না থাকায় গাথাকাব্য উদ্ধার করা ক্রমশঃই কঠিন কাজ হইয়া পড়িবে। তখন মুদ্রিত এই গাথাগুলিই বাংলার পল্লীসাহিত্যের একটি লুপ্ত অংশের আংশিক পরিচয় বহন করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত ইতিহাসাশ্রিত গাথাগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত এইরূপ গাথার সংখ্যা বেশী নহে। এইরূপ যে কয়টি গাথা আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 'মদন মোহনের দলমাদলের কাহিনী, লইয়া রচিত একাধিক গাথা ও বর্ধমানের রাজা 'জাল প্রতাপচাঁদ'কে লইয়া রচিত গাথাটি উল্লেখযোগ্য।

। ১। **জাল প্রতাপচাঁদ**—রচয়িতা কার্তিকচন্দ্র সিদ্ধান্ত।

বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ। বাল্যকালেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। বিমাতা এবং তাঁহার সহোদর ভ্রাতার ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি লাভের আশায় প্রতাপচাঁদ একবার আঠাশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বৃদ্ধ রাজা তেজচন্দ্র তাঁহাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। কিছুকাল পরে একদিন কালনার গঙ্গাতীরে অসুস্থ প্রতাপচাঁদের অন্তর্জলী অবস্থায় মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হয়। রাজা তেজচন্দ্র কিছুকাল পরে পরাণবাবুর পুত্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এই ঘটনা ঘটে ১৮২০ খৃঃ। প্রায় পনের বৎসর পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এক নবীন সন্ন্যাসী বর্ধমানে আসিলে কেহ কেহ তাহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া চিনিতে পারিলে সেইকথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। পরাণবাবু এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে বিতাড়নের জন্য লাঠিয়াল পাঠাইলে তিনি কাঞ্চননগরে আশ্রয় লন কিন্তু সেস্থান হইতেও পরাণবাবুর লাঠিয়াল তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। আদালতে এই ব্যাপারের বিচার হয় এবং প্রতাপচাঁদ বিচারে জাল সাব্যস্ত হন। এই ঘটনা ঐতিহাসিক।

তখনকার দিনে বর্ধমানে এই 'জাল প্রতাপচাঁদ'-কে লইয়া অনেক কাহিনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল। এই ঘটনা লইয়া লিখিত অনুপচন্দ্র দত্তের 'প্রতাপচন্দ্র লীলারস সঙ্গীত' একটি কাহিনী-কাব্য। ইহার পূর্ণ বিবরণ বীরভূমি পত্রিকায় (১৩০৮, ১৩০৯) প্রকাশিত হইয়াছিল। 'জাল প্রতাপচাঁদ'-কে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও গৌরাঙ্গের অভিন্নাত্মা মনে করিত। তাই তাঁহার লীলা প্রকটনার্থে শীর্ষোক্ত গ্রন্থখানি প্রণীত হয়। জাল রাজা ১৮৫২ খৃঃ কি ১৮৫৩ খৃঃ-এর প্রথমে প্রাণত্যাগ করেন; গ্রন্থরচনা হয় ১২৫০ সালে অর্থাৎ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে; সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশাতেই এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। গ্রন্থকার বোধ হয় প্রতাপের একজন চেলা ছিলেন। তিনি প্রতাপের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকের নিবাস কাটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে।" (প্রাঃ পুঃ বিবরণ—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আবদুল করিম)॥ এই কাহিনী বর্ধমান রাজার গল্পাকারে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন। পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহার অংশ বিশেষ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামে প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত দুইটি রচনাই গাথা কাব্যের পর্যায়ে পড়ে না বলিয়া উহাদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। শুধু কাহিনীটির

ঐতিহাসিকতা ও জনপ্রিয়তা কিরূপ ছিল তাহা দেখাইবার জন্যই উপরোক্ত কাহিনী দুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই কাহিনী লইয়া রচিত একটি মাত্র গাথা আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ভণিতা হইতে জানা যায়, রচয়িতার নাম কার্তিকচন্দ্র সিদ্ধান্ত। এই পুঁথিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৫৫৩ সংখ্যক পুঁথি। পুঁথিটি খণ্ডিত, দুইপাতার পুঁথি। সুতরাং পুঁথিটি হইতে সম্পূর্ণ কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায় না। পারিবারিক চক্রান্তজাল হইতে প্রতাপচাঁদের বিচিত্র পলায়ন কাহিনী লইয়া গাথাটি রচিত। এই গাথাটির রচয়িতাও প্রতাপচাঁদকে অবতারকল্প পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়া পলায়নের পরে যে ভাবে তিনি আত্মগোপন করিয়াছিলেন পৌরাণিক উপমার সাহায্যে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং গাথাটিতে ঐতিহাসিক সত্যের সহিত কবিকল্পনার মিশ্রণ হইয়াছে। জাল রাজা প্রতাপচাঁদকে পাণ্ডবগণের সহিত তুলনা করিয়া রচয়িতা বলিতেছেন—

'কার্তিক চন্দ্র সিদ্ধান্তের বাণী শুন ঈশ্বর চক্রপাণি
ছোট রাজা পাপক্ষয় করিল আপন।
দ্বাপরে পাণ্ডবগণ করিয়াছিল যেমন
সেই মত প্রতাপচন্দ্র করিল এখন।'

।২। **মদনমোহন-বন্দনা**।

সত্য ও কল্পনা মিশ্রিত হইয়া কিরূপ বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে 'মদনমোহন-বন্দনা'-র অন্তর্গত বিভিন্ন গাথাকাব্যগুলি তাহার উদাহরণ।

ডঃ দীনেশ সেন তাঁহার 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—২য় খণ্ডে' একটি 'মদনমোহন বন্দনা' প্রকাশ করিয়াছেন। এই গাথাটি ছোট। কেবল মদনমোহন কর্তৃক বিষ্ণুপুর গড় রক্ষার বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গাথাটি জয়কৃষ্ণদাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুঁথিটি ১২৬৭ সালে লিখিত।

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ পালিত তাঁহার 'বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নূতন কথা' নামক প্রবন্ধে (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ—১৩৪১) রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা'-র বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। রতন কবিরাজের 'মদনমোহন বন্দনা'-য় মদনমোহনের বিবিধ মহিমার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে মদনমোহন কর্তৃক বিষ্ণুপুরের গড় রক্ষার বিবরণ একটি।

"বিষ্ণুপুরের মদনমোহন-এর আদি মাহাত্ম্য" নামে ৺নিবারণ চন্দ্র দে প্রণীত একটি পুঁথিতেও মদনমোহনের বিষ্ণুপুরের গড় রক্ষার বিবরণ গাথার আকারে পাওয়া যায় (পুঁথিটি শ্রীঅমলেন্দু মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত)। ১৩০৬ সালে এই কাহিনীটি প্রথম ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। পুঁথিটির আরম্ভেই রচয়িতা বলিয়াছেন "আসল মদনমোহনের বনবিষ্ণুপুরের বাগবাজারের আদি মাহাত্ম্য"। পুঁথির অন্তর্গত গাথাটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনরূপে বিষ্ণুপুরের মল্লবংশে অবতরণ, গড়রক্ষা ও পরে তথা হইতে বাগবাজারে অধিষ্ঠিত হইবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত রচনাগুলির প্রত্যেকটিতেই কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। গাথাটির বহুল প্রচলনই এই পার্থক্যের কারণ ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

নিবারণচন্দ্র দে প্রণীত গাথার অন্তর্গত কাহিনীটি অসংলগ্ন। সম্ভবতঃ প্রণেতা ইহা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই স্থানে স্থানে অসংলগ্নতা প্রকাশ পাইয়াছে। জনশ্রুতিমূলক কাহিনীগুলি এইরূপে সত্য ঘটনা হইতে বিকৃত হইয়া পড়িত। আলোচ্য গাথার অন্তর্ভুক্ত কাহিনীটি এইরূপ—

বিষ্ণুপুরে এক ক্ষত্রিয় রমণী ছিল। গয়াযুদ্ধে যখন তাহার স্বামীর মৃত্যু হয় তখন পাড়াপ্রতিবেশীদিগের সহিত গর্ভবতী অবস্থায় শ্রীক্ষেত্রে গমনকালে বনের মধ্যে তাহার প্রসব হইয়া পড়িল। সদ্যোজাত শিশুকে বনের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া গেল। শিশুটি সেই বনের মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তর্যামী নারায়ণ জানিতে পারিয়া মদনমোহনরূপে সেই বনমধ্যে আসিয়া গাছের ডালে একটি মধুচক্র সৃষ্টি করিলেন। তখন সেই মধু শিশুর মুখে পড়িতে লাগিল এবং শিশুর প্রাণ রক্ষা পাইল।

সকালে এক বাগ্দীর মেয়ে কাঠ কুড়াইতে আসিয়া বনমধ্যে শিশুকে দেখিতে পাইল। শিশুটিকে দেখিয়া সে তাহাকে নিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ী দিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ শিশুটিকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন গোপাল সিংহ।

ক্রমে শিশু বাড়িতে লাগিল। গোপাল সিং যখন দশ বছরের তখন একদিন গরু চরাইতে গিয়া আর ফিরে না দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিন্তিত হইয়া তাহার সন্ধানে বনমধ্যে গিয়া দেখেন—

বৃক্ষতলে পড়ে বালক কত নিদ্রা গেছে।
সূর্যের কিরণ তার মস্তকে লেগেছে ॥
নাগ-নাগিনী দুটি সর্প বাহির হইয়া।
ফণা ধরি তার মস্তক রেখেছে ঘিরিয়া ॥

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সাপ পলাইল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন এই বালক একদিন রাজা হইবে।

একদিন আষাঢ় মাসের ঝড়বৃষ্টির দিনে গোপাল সিং বাঁকা নদীতে মাছ ধরিতে গেল। যতবার জাল পাতে মাছ না উঠিয়া খালি সোনার ইট ওঠে। বালক সোনা চিনিত না। ইটগুলি বাড়ীতে লইয়া সে উহা দ্বারা তুলসী-মঞ্চ নির্মাণ করিবে স্থির করিল। ব্রাহ্মণ সোনার ইট দেখিয়া বালককে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—

রাজা হবে রাজ্য পাবে বসবে সিংহাসনে।
রাজা হলে এ ব্রাহ্মণে রাখবে তুমি মনে ॥

ব্রাহ্মণ বালককে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন।

বালক পুনরায় একদিন মাছ ধরিতে গেল। এইবার জাল পাতিলে প্রথমবার চন্দনমাখা তুলসীপত্র, তারপরে ঝাঁজ-ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ এবং অবশেষে 'জালের মধ্যে মদনমোহন উপনীত হল'। এইরূপে মদনমোহন ধরাতলে ব্রাহ্মণের ঘরে অবতীর্ণ হইলেন।

কাহিনীর এই অংশটুকু অপর দুইটি রচনায় পাই না। ইহা সম্পূর্ণ কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হয় না। নদীগর্ভ হইতে বিগ্রহ-প্রাপ্তির কথা কিছু নূতন নহে। ব্রাহ্মণ মদনমোহনকে এইভাবেই হয়তো পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন যে এক ব্রাহ্মণের ঘর হইতে প্রাপ্ত একথা সত্য।

কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘর হইতে কি করিয়া মদনমোহন রাজপুরীতে আসিলেন তাহার কোনও বিবরণ না দিয়াই রচয়িতা বলিতেছেন,—

পূর্বে ছিলেন মদনমোহন ব্রাহ্মণের ঘরে।
মল্লবংশে কৃপা করে এলেন বিষ্ণুপুরে ॥

কিন্তু কবে কোন্ রাজা কর্তৃক ইনি বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারে আনীত হন আলোচ্য গাথাটিতে সে সম্বন্ধে সঠিক কোনও ইঙ্গিত নাই। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত বলিয়াছেন, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর দস্যু-সর্দার ছিলেন, ইতিহাসে

এইরূপ বলে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহনও নাকি চোরাই মাল। বীর হাম্বীরেরই কীর্তি (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ—১৩৪১, পৃঃ ২৪২)। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও বলিয়াছেন যে, বীর হাম্বীর কর্তৃক মদনমোহন স্থাপিত হন। বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল ১৫৮৬ খৃঃ হইতে ১৬১৮ খৃঃ পর্যন্ত। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতেই মদনমোহন বিষ্ণুপুরের রাজপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হন। আলোচ্য পালা রচয়িতা মল্লবংশের গৌরব অম্লান রাখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই বীর হাম্বীর কর্তৃক ব্রাহ্মণের ঘর হইতে মদনমোহন অপহরণ অথবা বলপ্রয়োগে আনয়নের বিবরণটি সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর পালাটিতে পাই—

সেই বংশে ভীম বীর জন্মিল যখন।
তখনও বিরাজ করেন মদনমোহন ॥

ইহার পর মদনমোহন কর্তৃক গড় রক্ষার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বাহান্ন হাজার বর্গী রাজার গড় লুটিতে আসিয়াছে এই খবর পাইয়া রাজা বলিলেন, "আমার সহায় কেবল মদনমোহন"। অন্তর্যামী ভগবান রাজার এই কথা শুনিলেন। ভক্তের ভগবান তখন আপনিই চলিলেন বর্গী তাড়াইতে। রণসজ্জায় সাজিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মদনমোহন ছদ্মবেশে যুদ্ধে চলিলেন।

দল মাদল কামান ছিল লাল বাঁধের ধারে।
আশী মন বারুদ দিল তাহার ভিতরে ॥
সেই কামান মদনমোহন দুই বগলে নিল।
দুই হস্তে দুই কামানে পলতে জেলে দিল ॥
এক তোপেতে কত শত বর্গী মরে গেল।
কামানের মহাশব্দে লোকের মূর্চ্ছা হল ॥
দশমাসের গর্ভবতীর গর্ভপাত হল।
পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত শব্দে মাটি ফেটে গেল ॥

রণে ক্লান্ত হইয়া অতঃপর মদনমোহন বিষ্ণুপুরের রাজপুত্র পরিচয়ে গোয়ালার নিকট গিয়া দৈ চাহিয়া খাইলেন—

ছল করি পাতিলেন হাত মদনমোহন।
দুই হস্তে দৈ খাইলেন সাড়ে ষোল মণ ॥

এদিকে রাজা মদনমোহনকে খুঁজিতে খুঁজিতে গোয়ালার নিকট আসিলেন।

গোয়ালা রাজাকে যখন বলিল যে, রাজপুত্র দৈ খাইয়া গিয়াছেন তখন রাজা সকলই বুঝিলেন—

রাজা বলে গোয়ালা তোর সার্থক জীবন।
ছেলে নয় দৈ খেয়েছেন মদনমোহন॥

রাজা গোয়ালাকে মদনমোহন যে স্থানে দৈ খাইয়াছেন তাহা দেখাইয়া দিতে বলিলে গোয়ালা বকুলতলা দেখাইয়া দিল। গোয়ালা দেখিল যে, তাহার দৈএর ভাঁড় সোনা হইয়া গিয়াছে। গোয়ালা স্বচক্ষে মদনমোহনকে দেখিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে, তুচ্ছ ধনের প্রতি তাহার কোন লোভ নাই। তাই,

গোয়ালা বলে "ভুলাও কি মদনমোহন।
মরণকালে দিও তোমার অভয়চরণ॥"

এই গোয়ালাই বাগবাজারে গোকুল মিত্র নামে জন্ম লইল এবং তাহার পূর্বজন্মের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মদনমোহন কিরূপে বিষ্ণুপুর হইতে গোকুল মিত্রের নিকট আসিলেন তাহাই পরবর্তী অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরের রাজা একদিন মহাবিপদে পড়িলেন এবং তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজনে রাজা হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া মদনমোহনের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে গোকুল মিত্রের ঘরে বাঁধা দিয়া আসিলেন। এইরূপে মদনমোহন বাগবাজারের গোকুল মিত্রের ঘরে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইতিহাস বলে চৈতন্যসিংহ মদনমোহনকে গোকুল মিত্রের কাছে বাঁধা দিয়াছিলেন।[১] আলোচ্য গাথাটিতে রাজার নামোল্লেখ নাই। গাথাটি হইতে বিষ্ণুপুর রাজবংশের কোনও ঐতিহাসিক সত্য মিলে না। গাথা রচয়িতা ইতিহাসের কোন ধার ধারেন নাই। ঐতিহাসিক তথ্য কিছু না মিলিলেও গাথাটির কাহিনী অংশ বড় সুন্দর।

১ "Chaitanya Singha managed to escape with the family God Madan Mohan by a private gate and first went to the Nawab at Murshidabad. But knowing that the East India Company had received the grant of the Burdwan Chakla in 1760, he proceeded to the English at Calcutta. Here at Calcutta, having spent all his money in conducting the case in the court of the English (with the help of the Dewan Ganga Gobinda Singha) he had to pawn the idol Madan Mohan to Gokul Mitra of Baghbazar, Calcutta, originally an inhabitant of Konnagar, who had made his fortune through trading in salt."

—(History of Bishnupur Raj—A.P. Mallik, Page 56).

চৈতন্যসিংহ মদনমোহনকে গোকুল মিত্রের নিকট বন্ধক রাখেন, গোপাল সিংহের সময় মদনমোহন বিষ্ণুপুরেই ছিলেন। কিন্তু গাথাটিতে মদনমোহনের অভাবে বিষ্ণুপুরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

বাগবাজারে এসে ঠাকুর রৈলেন বসে।
বিষ্ণুপুরে শ্রীমন্দিরে পাথর পড়ে বসে ॥
রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে, কাঁদে প্রজাগণ।
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদে হয়ে অচেতন ॥
হাতীশালে হাতী কাঁদে ঘোড়া না খায় পানি।
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে গোপাল সিংহের রাণী ॥

গাথাটির বিভিন্ন স্থানে এইরূপ অসংলগ্ন বর্ণনা স্থান পাইয়াছে।

বাগবাজারে গোকুল মিত্রের ঘরে মদনমোহন নানারূপ লীলাখেলার মধ্য দিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন গোকুল মিত্র নিদ্রাভঙ্গের পর 'মদনা' নামক চাকরকে ডাকিয়া তামাক চাহিলে, ঠাকুর মদনমোহন 'মদনা' চাকরের রূপ ধরিয়া মিত্রের হাতে তামাক দিলেন। তামাকের সুমিষ্ট গন্ধে তৃপ্ত হইয়া গোকুল মিত্র ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে বিষ্ণুপুরের তামাক কোথায় পাইল। কিন্তু তখন ঠাকুর অন্তর্ধান করিয়াছেন, উত্তর কে দিবে? এদিকে পূজারী ব্রাহ্মণ পূজা করিতে গিয়া দেখেন ঠাকুরের হাতে তামাক ও টীকার দাগ। তখন তিনি মিত্রকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। মিত্র বুঝিলেন এ ঠাকুরেরই লীলাখেলা। তখন অনুতপ্ত হৃদয়ে গোকুল মিত্র বলিলেন—

আমার গৃহে আজ থেকে তামাক যে খাইবে।
স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা দুই পাতক সে লবে ॥
মদনা নামে আমার বংশে চাকর যে রাখিবে।
তাহাকেও ঐ পাতকের ভাগী হতে হবে ॥

গোকুল মিত্রের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুভক্ত। মদনমোহন ব্রাহ্মণ সাজিয়া তাহার নিকট গিয়া চূড়া বাঁশী বন্ধক রাখিলেন। পূজার সময় ব্রাহ্মণ ঠাকুরের চূড়া বাঁশী না দেখিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা সকলকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—তখন,

দৈববাণী করে কন মদনমোহনে।
ব্রাহ্মণকে তিরস্কার কর মিত্র মিছে।
তোমার কন্যা চূড়া বাঁশী বন্ধক রেখেছে ॥

মিত্র বলে লক্ষ্মী তুমি চূড়া বাঁশী দাও।
কতগুলি অর্থ পাবে আমার কাছে লও॥
এই কথা শুনে লক্ষ্মী চূড়া বাঁশী দিল।
এতদিনে লক্ষ্মীপ্রিয়া শাপে মুক্ত হল॥

এইরূপে মদনমোহন লক্ষ্মীপ্রিয়াকে শাপমুক্ত করিলেন। পুনরায় বাগবাজারের মোহিনী নাম্নী বেশ্যার নিকট অঙ্গুরী বন্ধক রাখিয়া তাহাকেও শাপমুক্ত করিলেন।

মদনমোহন বিভিন্ন লীলাখেলার মধ্য দিয়া গোকুল মিত্রের ঘরে দিন কাটাইতেছেন, এদিকে বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে মদনমোহনের অভাবে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। বিষ্ণুপুরের রাজা তখন বাল্যরাজ. একদিন রাণী তাঁহাকে বলিলেন,—

আমার গজমতি হারে পাচ লক্ষ টাকা হবে।
সুদ সমেত দিয়ে মদনমোহনে আনিবে॥

রাণীর অনুরোধে রাজা গজমতি হার নিয়া গোকুল মিত্রের কাছে গেলেন। কিন্তু গোকুল মিত্র বন্ধকী কোয়ালা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি মদনমোহনকে বন্ধক নেন নাই, কিনিয়া নিয়াছেন। এইকথা শুনিয়া বাল্যরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতেছেন, তখন মদনমোহন পথের মাঝে তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং আলিপুর কোর্টে দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দিলেন। মদনমোহন নিজেই এই মামলায় বাল্যরাজের পক্ষ লইয়া উকিলের ছদ্মবেশে কোর্টে গিয়া হাজির হইলেন এবং জজকে পরিচয়দানকালে বলিলেন—

বিষ্ণুপুরে বাড়ী আমার রাজার চাকুরী করি।

বলা বাহুল্য, মামলায় বাল্যরাজ জিতিলেন। গোকুল মিত্র তখন কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন। মদনমোহনকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা না থাকায় গোকুল মিত্র কুমারটুলি হইতে একটি নকল ঠাকুর গড়াইয়া আনিয়া তাহাই বাল্যরাজের হাতে দিলেন। এদিকে রাজা যখন নকল ঠাকুর নিয়া গঙ্গাপারে গিয়াছেন, তখন মদননোহন তাঁহাকে দেখা দিয়া গোকুল মিত্রের চাতুরীর বিষয় জানাইলেন। অবশেষে মদনমোহনএর পরামর্শে বাল্যরাজ পুনরায় বাগবাজারে ফিরিলেন এবং ঠাকুরের নির্দেশক্রমে আসল ঠাকুরকে চিনিয়া লইলেন। আসল মদনমোহনকে হারাইয়া গোকুল মিত্র আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন ঠাকুর তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন,—

বৎসরান্তে তোমার বাড়ীতে 'অন্নকূট' হবে।
দ্বাদশ দণ্ড আমায় তখন দেখিতে পাইবে॥

এই বলিয়া মদনমোহন অন্তর্ধান হইলেন। বাল্যরাজ ঠাকুর নিয়া বিষ্ণুপুরে ফিরিলেন। বিষ্ণুপুরে আবার রাসদোল চলিতে লাগিল।

সহজ, সরল ভাষার মাধ্যমে জনশ্রুতিমূলক ছোট ছোট মদনমোহন-মাহাত্ম্য কাহিনী সংযুক্ত করিয়া রচয়িতা কাহিনীটিকে একটি বিশিষ্ট গাথাকাব্যের আকৃতি দিয়াছেন।

মদনমোহন কর্তৃক বিষ্ণুপুরের গড় রক্ষার বিবরণীটিকে এখনও অনেকে সত্য ঘটনা বলিয়াই মনে করেন। 'রতন কবিরাজের' বর্গীদলের নেতা হিসাবে ভাস্কর পণ্ডিতের নাম পাই। কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশিত গাথাটিতে ভাস্করের নামোল্লেখ নাই। আলোচ্য গাথাটিতেও ভাস্করের নাম নাই। গোপাল সিং-এর রাজত্বকালেই (আনুমানিক ১৭১১ খৃঃ হইতে ১৭৪৬ খৃঃ) ভাস্কর সর্বপ্রথম বাংলাদেশে আগমন করেন (১৭৪১ খৃঃ) এবং ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। সুতরাং ভাস্করের সময়েই যদি 'দলমাদল' কামানের ঘটনাটি ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গোপাল সিংহই তখন বিষ্ণুপুরের রাজা। বর্গীনেতা হিসাবে ভাস্করের উল্লেখ সর্বত্র না থাকিলেও দলমাদল-এর জনশ্রুতিমূলক ঘটনাটি যে গোপাল সিংহের সময়েই ঘটিয়াছিল তাহা মনে করিবার আরও একটি সঙ্গত কারণ আছে। মল্লরাজারা সকলেই হরিভক্ত ছিলেন, কিন্তু গোপাল সিংহের ন্যায় কেহই ছিলেন না। কথিত আছে যে, গোপাল সিংহের রাজত্বকালে অন্ততঃ দিনে একবারও হরিনাম না লইলে শাস্তি হইত। এইজন্য ভগবানের নাম লওয়াকে 'গোপাল সিংহের বেগার' বলিয়াই অনেক প্রজা মনে করিত। এইরূপ হরিভক্ত রাজার সম্বন্ধেই 'মদনমোহনের দলমাদল' কাহিনীর ন্যায় একটি আলৌকিক জনশ্রুতি প্রচারিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং গাথা কাহিনীটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধে প্রচলিত গাথাগুলিতে তাঁহাদের বংশানুক্রমিক পরিচয় না থাকিলেও, তাঁহাদের হরিভক্তি-পরায়ণতার কথা ইহারা সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মাশ্রিত গাথা

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ছোট-বড় নানা আকারের কাহিনীমূলক গীত গাহিবার প্রচলন ছিল। এই সকল গীত লোকমুখেই প্রচলিত ছিল। ধর্ম হইতেই এই সকল গীতের উৎপত্তি হয় আবার ধর্মের সহিতই ইহারা সংশ্লিষ্ট ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাংলা সাহিত্যে এই সকল গীতের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু যখন আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে এই সকল গীতের সহিত পরিচিত হই তখন ধর্মের কোনও রীতি অনুষ্ঠানের সহিত এই সকল গীতের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকে না। এই সকল গীতেরই একটি ধারা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের আকারে স্থান পাইয়াছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষিত কবিগণের প্রতিভাস্পর্শে এই ধারাটি মঙ্গলকাব্যের আকারে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই অবস্থায় এইসকল গীত লোকসাহিত্যের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়াছে, কেন না তখন তাহারা ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি। কিন্তু ঐ সকল গীতের আর একটি ধারা নিরক্ষর কবিগণের মুখে মুখে প্রচলিত হইতে হইতে কালক্রমে গাথাকাব্যের রূপ লইয়াছিল। ধর্মানুষ্ঠান-এর অঙ্গীভূত গীতগুলি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া গায়েনগণ ছোট বড় কাহিনীমূলক গীত রচনা করিত এবং গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইত। এইরূপে গ্রাম্য নিরক্ষর কবি রচিত গাথাগুলি গ্রামবাসিগণের মনোরঞ্জন করিত এবং গাথা রচয়িতা অথবা গায়েনগণের জীবিকার্জনের পথ সুগম করিয়া দিত। ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গীত কাহিনীগুলি হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইলেও ধর্মানুষ্ঠানের সহিত এই সকল গাথাগুলির প্রত্যক্ষ কোনও সম্পর্ক থাকিত না এবং কবি-কল্পনার মিশ্রণে কাহিনীগুলিও বিভিন্নাঞ্চলে বিভিন্নরূপে প্রচার লাভ করিত। এইরূপে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন এই গীতগুলি গাথাকাব্যের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ধর্মাশ্রিত গাথাগুলির বহুল প্রচারের ফলে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত ধর্মাশ্রিত গাথার বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে অল্প শিক্ষিত গাথারচয়িতা অথবা গায়েনগণ অনেক গাথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। হয় আপন স্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাসের অভাবে, আর নতুবা পরবর্তীদের সুবিধার জন্যই তাঁহারা এইরূপ

করিয়াছিলেন। লিপিবদ্ধ যে কারণেই হইয়া থাকুক, তাহা হইয়াছিল বলিয়াই আজ আমরা অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত এই সকল গাথার নিদর্শন পাই। এক একটি কাহিনীর উপর লিখিত পুঁথির একাধিক সংখ্যা হইতে অনুমান করা যায় যে, ধর্মাশ্রিত গাথাগুলির প্রচলন খুব বেশী ছিল। শিব, কৃষ্ণ, ভগবতী, পীর ইত্যাদিকে লইয়া রচিত একই কাহিনীর একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি পুঁথিই যে বিভিন্ন লিপিকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পুঁথিগুলির কোন কোনটিতে লিপিকার অথবা রচয়িতার ভণিতা আছে, আবার কোন কোনটিতে নাই। একই বিষয় লইয়া রচিত কাহিনীর মূল বক্তব্য এক হইলেও রচনার পার্থক্যেই ধরা পড়ে যে, তাহাদের রচয়িতা পৃথক। এইরূপ ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গান, যোগাদ্যার বন্দনা, শিবের গান, ইত্যাদি বিষয় লইয়া রচিত পুঁথির তালিকা দর্শনে নিঃসন্দেহে এই মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, ধর্মাশ্রিত গাথাগুলির জনপ্রিয়তা খুব বেশী ছিল।

ধর্মাশ্রিত গাথাগুলির মূল উৎপত্তিস্থল ধর্মসংশ্লিষ্ট কাহিনী হইলেও, গাথাগুলিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ না থাকায় হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রোতাই সমভাবে ইহাদের রসগ্রহণ করিত। সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত গাথাগুলি লৌকিক রচনার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। আপন আপন কাহিনীর রসসৃষ্টিই এই সকল গাথারচয়িতাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মপ্রচার নহে। কাহিনীর অন্তর্গত দেবদেবীর মহাত্ম্য বর্ণনায় কবির ধর্মনিরপেক্ষতা ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রোতার রসগ্রহণে বাধা জন্মাইত না। কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম থাকিলেও তাহার সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তাহা বিচার্য নয়। এই সকল ক্ষেত্রে মূল রচনা হয়তো ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছিল, কালক্রমে গায়েনদের মুখে মুখে পরিবর্তিত হইয়া ধর্মাশ্রিত গাথাশ্রেণীর ভিতর ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন বিভিন্ন ধর্মাশ্রিত গাথার আলোচনা করা যাক।

নাথগীতিকা।

ধর্মাশ্রিত গাথাগুলির মধ্যে নাথ-গীতিকার কথাই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

একটিমাত্র ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সমগ্র নাথ-গীতিকা রচিত হইয়াছে, রচনার দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও বিষয়গত পার্থক্য ইহাদের মধ্যে কিছুমাত্র নাই। নাথ-গীতিকার অন্তর্ভুক্ত গাথাগুলি বিষয়ের দিক দিয়া বৈচিত্র্যহীন হইলেও, বিষয়ের সর্বজনীনত্বের গুণে ইহারা বাংলার

সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তর-ভারতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশে বাংলাভাষায় রচিত অন্য কোনও গাথার এই সৌভাগ্য হয় নাই।

এই সকল গাথায় নাথগুরুদিগের আলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা কীর্তিত হইলেও অন্যধর্মের প্রতি কোনওরূপ কটাক্ষ প্রদর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। সর্বোপরি, রাজপুত্রের আলৌকিক আত্মত্যাগ এবং গোরক্ষনাথের একনিষ্ঠ সংযম ও গুরুভক্তি এই গাথাগুলিকে সর্বজনীনত্বের অধিকারী করিয়াছে। সেইজন্য নাথ-গীতিকার অন্তর্গত কাহিনীগুলি নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও ইহারা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইয়া সর্বভারতীয় গাথাকাব্যের রূপ লইয়াছে। ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে ইহাদের প্রচারই ইহাদের জনপ্রিয়তার প্রমাণ। উত্তরবঙ্গে ইহাদের প্রচার সমধিক ছিল। রংপুর হইতে সর্বপ্রথম গ্রীয়ারসন সাহেব কর্তৃক নাথ-গীতিকার অন্তর্গত একটি গাথা সংগৃহীত হয়। ইহা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, নাথসম্প্রদায় উদ্ভূত গাথার সর্বপ্রথম সংগ্রাহক একজন ইংরাজ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে (প্রথম ভাগ, ৩নং, ১৮১ সংখ্যা) গ্রীয়ারসন সাহেব 'মানিকচন্দ্রের গীতি' শীর্ষক নাথসম্প্রদায় উদ্ভূত পল্লীগাথাটি প্রকাশিত করেন। এই গাথাটি বাংলা গাথাসাহিত্যের সর্বপ্রথম সংগ্রহ। ইহার পূর্বে আর কোনও বাংলা গাথা মুদ্রিত হয় নাই। সুতরাং শুধু 'মাণিকচন্দ্রের গীতি' নহে, সমগ্র বাংলা গাথাসাহিত্যের প্রথম সংগ্রাহক ও প্রকাশক গ্রীয়ারসন সাহেব। ইহার পর হইতেই সুধী সমাজে বাংলা গাথা সংগ্রহের সাড়া পড়িয়া যায়, গাথাকাব্যের বহুপুঁথি সংগৃহীত হয়। গ্রাম্য কবিগণের মুখে মুখে প্রচারিত অনেক গাথা সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হয় এবং এই সমস্ত পুঁথির কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়া শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নাথ-গীতিকার অন্তর্গত কাহিনীগুলি নানাদিক হইতে আলোচিত হইয়াছে। কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি, উৎপত্তিস্থল, কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহারা যে প্রকৃতই গাথাকাব্য এ বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। এই সমস্ত গাথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পরবর্তী কালে রচিত।

নাথ-গীতিকার অন্তর্ভুক্ত গাথাগুলির মধ্যে দুইটি প্রধান কাহিনী আছে—একটি গোরক্ষনাথ কর্তৃক আপন গুরু মীননাথের উদ্ধার-সাধন, অপরটি একটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের বা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণের কাহিনী। এই

দুইটি কাহিনী লইয়া রচিত একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত কাহিনী লইয়া রচিত যে সমস্ত পুঁথির পরিচয় আজ পর্যন্ত আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহা 'গোরক্ষ-বিজয়' এবং 'মীন-চেতন' নামে পরিচিত। এই দুই নামের একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন পুঁথির অন্তর্গত কাহিনীর মূল উপাদান এক। দ্বিতীয় কাহিনীটি লইয়া রচিত যে সকল পুঁথি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 'মানিকচন্দ্র রাজার গান', 'গোবিন্দচন্দ্রের গীতি', 'ময়নামতীর গান', 'গোবিন্দ-চন্দ্রের গান, 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', 'গোপীচাঁদের পাঁচালী' ইত্যাদি নামে পরিচিত। এখানেও দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন পুঁথির অন্তর্গত কাহিনীর মূল উপাদান অভিন্ন।

বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গলাভাষায় রচিত, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল প্রচলিত আছে। মৎস্যেন্দ্র বা মীননাথের নাম চলিত বঙ্গভাষায় 'মোচন্দরে' দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নাই। বঙ্গভাষার পুঁথিগুলি অধিকাংশই অষ্টদশ শতাব্দীতে রচিত।

।১। **গোরক্ষ-বিজয়**—প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল, ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত, আব্দুল করিম সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত। (১৩২০ সালের 'বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ—১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা' আব্দুল করিম কর্তৃক সর্বপ্রথম আংশিকভাবে প্রকাশিত)।

।২। **মীন-চেতন**—প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১২২৪ সাল, শ্যামদাস সেন প্রণীত। নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ঢাকা সাহিত্য পরিষদ, ১৩২২।

।৩। **গোর্খ-বিজয়**—প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১২৬৩ সাল, ভীমসেন রায় প্রণীত। উত্তরবঙ্গে লেখা। ১৩৫৬ সালে শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

।৪। **গোপীচন্দ্রের পাঁচালী**—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'গোপীচন্দ্রের গান'নামে ১৯২৪ খৃঃ প্রকাশিত।

।৫। **গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস**—স্কুর মহম্মদ বিরচিত। ঐ ঐ

।৬। **গোপীচন্দ্রের গীত**—নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত। ঢাকা সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২১ সালে প্রকাশিত।

।৭। **ময়নামতীর গান**— ঐ ঐ

।৮। **গোবিন্দচন্দ্রের গীত**—দুর্লভ মল্লিক সঙ্কলিত। শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ১৩০৮ সালে। প্রথম পরিচয় বাহির হইয়াছিল সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (৬, পৃঃ ২৬৭-৭২)। পুঁথি পূর্বরাঢ়ের। লিপিকাল ১২০৬ সাল।

।৯। **মাণিকচন্দ্রের গান**—রংপুর হইতে গ্রীয়ারসন কর্তৃক সংগৃহীত ও সঙ্কলিত। ১৮৭৮ খৃঃ বঙ্গীয় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত।

।১০। **গোপীচন্দ্র-নাটক**—গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক নেপালে রচিত একটি নাটপালা। পুঁথিটি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। নাটকের মূল কবিতাংশ বাংলায় লেখা।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীর অস্তিত্বের প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেকার লেখা কিছু পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালায় পাওয়া সবচেয়ে পুরানো ময়নাবতী-গোবিন্দচন্দ্র আখ্যান হইতেছে দুর্লভ মল্লিকের গীত। এই কাহিনী ভারতবর্ষের যে যে অঞ্চলে প্রচলিত আছে সর্বত্রই গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের রাজা বলিয়া উল্লিখিত, সুতরাং বাঙ্গালাদেশেই যে এই কাহিনীর উদ্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলাদেশের এবং পূর্বভারতের অন্য প্রান্তের নাথ-পন্থী যোগীরা পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তরুণ বাঙ্গালী রাজপুত্রের এই সকরুণ গাথা গাহিয়া বেড়াইত। এখনও বাঙ্গলায়, বিহারে, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে, পাঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে, মহারাষ্ট্রে, মধ্যভারতে ও উড়িষ্যায় গোরখ-পন্থী ভিখারীরা একতারা-গোপীযন্ত্র-সারেঙ সহযোগে গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

ময়নামতীর গাথায় ঐতিহাসিক সত্য অলৌকিকতার গাঢ় কুহেলিকায় আবৃত, কিন্তু এই অলৌকিকতাও বিশেষত্বপূর্ণ। গ্রীয়ারসন সংগৃহীত 'মানিকচন্দ্র-রাজার গান' শীর্ষক সঙ্গীতটি ময়নামতীর গানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—জুগী বা যোগীজাতীয় কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সংগৃহীত। দুর্লভ মল্লিককৃত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' ও এই গানের আর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র ও যোগীদিগের গোপীচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি। দুর্লভ মল্লিকের গান পুরাতন উপকরণের সাহায্যে নূতন ভাষায় রচিত, ইহাতে উপাখ্যান ভাগও কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীয়ারসন সাহেব সংগৃহীত গান পূর্ণাঙ্গ না হইলেও, প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে ইহা বাস্তবিকই প্রাচীন।

"ময়নামতীর প্রাচীন গান কোথাও পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। রংপুরের কান-ফাড়া যোগীরা মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময়ে গোপীযন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উহা দ্বারা শ্রোতার মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করে। লৌহ, বংশ ও অলাবু দ্বারা এই গোপীযন্ত্র প্রস্তুত হয়।

দুর্লভ মল্লিক পশ্চিমবাংলার লোক হইয়াও রঙ্গপুরের সন্ন্যাসী রাজা ও তাঁহার গুরুর যশোকীর্তনে ব্যগ্র। ত্রিপুরা জেলায় ও পূর্ববঙ্গে রাজা গোপীচাঁদের গাথা প্রচলিত ছিল। এখন তাহা শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য গোপীচন্দ্রের বৈরাগ্য গাথাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার রাজ্যের পরিমাপ যাহাই থাকুক, খ্যাতি করতোয়ার তীরে আবদ্ধ ছিল না।" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৫, ২য় সংখ্যা)।

একখানি গোবিন্দচন্দ্রের গীতি ময়ূরভঞ্জ হইতেও পাওয়া গিয়াছে। উহা উড়িয়া ভাষায় লিখিত। ভাগলপুর, কাশী, এমন কি পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দী ভাষায় বিরচিত 'গোপীচাঁদকা পুঁথির' প্রচলন আছে। সুতরাং দেখিতেছি বঙ্গীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া রচিত গাথা সমগ্র ভারতব্যাপী প্রচলিত। কে এই বঙ্গীয় গাথার আদি রচয়িতা তাহা স্থির করা অসম্ভব।

অষ্টাদশ শতকের পূর্বে লেখা মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে কাহিনী যে পূর্ববর্তী দুই তিন শতাব্দীতেও অজ্ঞাত ছিল তাহাও বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র গোরক্ষবিজয়ের কোন পুঁথি কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষপাদের পূর্বে লেখা নয়। গোরক্ষবিজয়ের অধিকাংশ পুঁথি উত্তরবঙ্গের, কয়েকটি ত্রিপুরা চাটিগাঁ অঞ্চলের। পশ্চিমবঙ্গে কোন পুঁথি পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গে নাথ-সিদ্ধদের গান এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

গোরক্ষনাথ মাণিকচন্দ্রের সমসাময়িক, কারণ মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। যে কয়েকখানি গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিই ৩০০ বৎসরের প্রাচীন। এই রচনাগুলিতে ভণিতা

হিসাবে চারিজনের নাম পাওয়া যায়—কবীন্দ্র দাস, ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন। ভীমদাস ও ভীমসেন রায় একই ব্যক্তি। ইহার মধ্যে ফয়জুল্লার ভণিতাই বেশী, স্থতরাং অনুমানের উপর ইহাকেই 'গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন' কাহিনীর আদি পুঁথিকার বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া গোরক্ষনাথের শিষ্য সম্প্রদায় বিগুমান। এই নাথ-সম্প্রদায়ের চেষ্টাতেই গোরক্ষনাথের কীর্তিবিজ্ঞাপক সাহিত্য ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়াছে। 'ময়নামতীর গান' এই সাহিত্যের অন্তর্গত। গোরক্ষনাথের দলভুক্ত গুরুপদে আসীন কানফা, গাভুর সিদ্ধা প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে এইরূপ কোনও প্রচলিত গাথা আজ পর্যন্তও সংগৃহীত হয় নাই।

ধর্মমঙ্গলের কোনও কোনও পুঁথিতে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানফা, প্রভৃতি নাথ-গুরুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্থতরাং ইহাদের মধ্যে ধর্মগত কোনও প্রকার ঐক্য বিগুমান থাকা অসম্ভব নহে। এই সকল গ্রাম্যগাথার উৎসস্থল ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়াই এই ঐক্য বর্তমান।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, 'ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্র' ও 'গোরক্ষনাথ' সম্বন্ধীয় গাথাগুলি হইতে হিন্দু রাজত্বের সময়কার অনেক সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নামতী স্বয়ং হাটবাজারে যাইতেন। গোবিন্দচন্দ্রের মহিষীরা কোন সামগ্রী কিনিতে হইলে নিজেরাই দোকানে যাইতেন। ইহার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তখনকার দিনে অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। 'ময়নামতীর গান'-এ দেখা যায় যে, রাজা সদাশয় ছিলেন বলিয়া প্রজাগণ এরূপ সম্পন্নশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, সামান্য লোকের ছেলেরা সোনার ভাটা লইয়া খেলা করিত। ব্যবসায়িগণ একটু অবস্থাপন্ন হইলে হাতী কিনিয়া ফেলিত এবং ধনাঢ্যগণ গৃহ-প্রাঙ্গণে হীরা মণি, মাণিক্য রৌদ্রে শুকাইতে দিত। এই সকল গাথায় আরও দেখা যায় যে তখনকার দিনে কথায় কথায় লোকে অগ্নিপরীক্ষা, তপ্ততৈল পরীক্ষা কিংবা বিষ প্রয়োগ পরীক্ষার সহায়তায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের বিচার করিত। রাজারা পাশা খেলিতে ভালবাসিতেন। রাজসভার বর্ণনাও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত মতবাদ সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ এই সকল বর্ণনায় আংশিক সত্য থাকিলেও একেবারে যথাযথ বর্ণনা হিসাবে ইহাদিগকে পাওয়া

যায় না। গাথা সাহিত্য-সুলভ পরিবর্তনের ফলে মূল রচনা পরিবর্তিত হইয়া যাওয়াই সম্ভব। সেই হিসাবে, এই সকল বর্ণনার মাধ্যমে আমরা সমাজ ও জনগণের যে পরিচয় পাই তাহাতে পুঁথি লিপিবদ্ধ হইবার সমসাময়িক কালের অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক রীতিনীতির প্রতিফলন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে এবং এইরূপ হইবার সম্ভাবনাই বেশী বলিয়া মনে হয়। সুতরাং, গাথা সাহিত্য হিসাবে নাথ-গীতিকাগুলি অমূল্য হইলেও, ঐতিহাসিক তথ্য-বিচারে নাথ-গীতিকার অন্তর্গত প্রমাণ অভ্রান্ত বলিয়া ধরা যায় না।

নাথ-গীতিকার অন্তর্গত কাহিনী দুইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত গানে উপাখ্যানের সামান্য কিছু রূপভেদ থাকিলেও, গল্পের কাঠামো মোটামুটি একই।

গোরক্ষ-বিজয়

চারি সিদ্ধার উৎপত্তি-বর্ণনায় কাহিনীর আরম্ভ। গোরক্ষনাথ, মীননাথ, কানপা, এবং হাড়িপা চারি সিদ্ধা। গোরক্ষনাথ মীননাথের ও কানপা বা কানফা হাড়িপার ভৃত্যরূপে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। মীননাথ এবং হাড়িপা এই দুই গুরু শিবের অনুচর হইয়া রহিলেন। একদিন গৌরী যখন শিবের কাছে মহাজ্ঞান শুনিতেছিলেন তখন ছল করিয়া মীননাথ তাহা শুনিয়াছিলেন। শিব তাহা জানিতে পারিয়া মীননাথকে অভিশাপ দিয়া বলিলেন যে মীননাথ একদা মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইবেন।

ইহার পর সিদ্ধাদের পৃথিবীতেই রাখিয়া শিব গৌরীসহ কৈলাসে চলিয়া গেলেন। চারি সিদ্ধা যোগপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হাড়িপা পূর্বে, কান্‌পা দক্ষিণে, গোরক্ষনাথ পশ্চিমে এবং মীননাথ উত্তরদিকে গেলেন। শিবের মুখে সিদ্ধাদিগের সংযমের কথা অবগত হইয়া গৌরীর ইচ্ছা হইল তাহাদের পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। তখন দেবীর কথায় মহাদেব ধ্যানযোগে সিদ্ধাদিগের ডাকিলেন। তাঁহারা আসিলে গৌরী মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে অন্ন পরিবেশন করিলেন। দেবীর রূপে চারি সিদ্ধাই মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁহার রূপ দেখিলেন পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টি দিয়া। মীননাথ কামাসক্ত মন লইয়া ভাবিলেন যে এমন সুন্দরী পাইলে তাঁহার সঙ্গে রাসলীলা করি।

মীননাথের মনোভাব অবগত হইয়া দেবী তাঁহাকে কদলীর দেশে নারী রাজ্যের রাজা হইবার অভিশাপ দিলেন। শিবের অভিশাপও ফলিল। মীননাথ কদলীরাজ্যে গিয়া মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া নারীগণের মধ্যে কামরসে নিমজ্জিত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। হাড়িপা ভৃত্যের মনোভাব লইয়া ভাবিলেন যে এমন সুন্দরী নারী পাইলে তাঁহার কাছে থাকিয়া হাড়ির কাজ করি। দেবীর শাপে তিনি ময়নামতী সহরে গিয়া হাড়ির কাজ করিতে লাগিলেন। কানুপার বাসনা হইল যে, এমন সুন্দরী পাইলে তিনি মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন। দেবীর শাপে কানুপা 'ডাহুকা' হইয়া আকাশে উড়িয়া গেলেন। এইরূপে দেবীর রূপে সকলেই মোহগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ অটল, তাঁহার মনে কামভাব জাগিল না। তিনি দেবীকে মাতৃরূপে দেখিলেন। গোরক্ষনাথের কাছে এইভাবে পরাজিত হইয়া দেবী তাঁহাকে কঠিন পরীক্ষা করিতে মন করিলেন। কিন্তু দেবী কিছুতেই সফল হইলেন না। উপরন্তু গোরক্ষনাথকে বর দিয়া তাঁহার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। দেবীর বর সফল করিবার জন্য শিব এক তপস্বিনী রাজকন্যাকে গোরক্ষকের পত্নী হইবার বর দিলেন। কিন্তু কামজয়ী গোরক্ষনাথ পত্নীর সহিত ছয়মাসের শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিলে রাজকন্যা খুব দুঃখিতা হইয়া যখন কাঁদিতে লাগিলেন তখন গোরক্ষনাথ তাঁহাকে হরগৌরীর কপটতার কথা বলিয়া আপন কৌপীন ধোওয়া জল খাইতে দিলেন। এই জল খাইয়া রাজকন্যা যে পুত্র প্রসব করিলেন তাহার নাম কর্পটিনাথ। ইহার পর গোরক্ষনাথ বিজয়ানগরে বকুলতলায় গিয়া ধ্যানে বসিলেন। ডাহুকরূপী কানুপার মুখে গুরুর দুরবস্থার কথা শুনিয়া গোরক্ষনাথ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন। কদলীরাজ্যে গিয়া নর্তকীবেশে গোরক্ষনাথ মীননাথের সভায় গিয়া নাচের তাল ও মাদলের বোলে গুরুর আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিছুতেই মীননাথের মোহভঙ্গ হয় না তখন গোরক্ষনাথ মীননাথের কদলীরাণীর গর্ভজাত পুত্র বিন্দুনাথকে মারিয়া পুনরায় তাহাকে বাঁচাইলে মীননাথের পূর্ণ চৈতন্য হইল। কদলীরা রাগে গোরক্ষনাথকে মারিয়া ফেলিতে চাহিলে, গোরক্ষনাথ শাপ দিয়া তাহাদিগকে বাদুড় করিয়া দিলেন। গোরক্ষনাথ গুরু এবং তাঁহার পুত্রকে লইয়া বিজয়ানগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইরূপে কামজয়ী গোরক্ষনাথ আপন গুরুর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্র :—

মেহেরকুলের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার মাতা ময়নামতীকে লইয়া এই কাহিনী রচিত। হাড়িপা গৌরীর শাপে হাড়ি হইয়া ময়নামতীর শহরে হাড়ির কাজ করিতেছিল। একদিন হাড়িপার অলৌকিক শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ময়নামতী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকেও হাড়িপার শিষ্য হইবার জন্য প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সদ্যযুবা গোবিন্দচন্দ্র অদুনা, পদুনা প্রমুখ ছয় কুড়ি রাণী লইয়া বিলাসে মত্ত। মাতার এই আদেশে রাজা অধীর হইয়া বিধবা মাতার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেও ইতস্ততঃ করিল না। তখন জতুগৃহে প্রবেশ করিয়া ময়নামতী নিজের সিদ্ধাই দেখাইলেন। ইহার পর গোবিন্দচন্দ্র যোগী হইতে রাজী হইলেন। এই কথা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্রের রাণীগণ কাতরভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। ময়নামতীকে কটূক্তি করিতেও ছাড়িল না। তখন ময়নামতীর আদেশে যমরাজা গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণ হরণ করিলেন। তাঁহার সৎকারের সময় ময়নামতীর মন্ত্রের জোরে রাজা প্রাণ পাইলেন এবং ইহাতে মাতার গুরুর প্রতিও রাজার শ্রদ্ধা জাগিল। তখন গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপার মনস্তুষ্টি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র বুঝিলেন যে, সংসার মিথ্যা, অসার। গুরুর অনেক কঠিন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া, বারাঙ্গনা হীরার গৃহে অশেষ নির্যাতন সহিয়া অবশেষে গুরুর কৃপায় বার বৎসর পরে গোবিন্দচন্দ্র স্বদেশে ফিরিলেন। কিন্তু মোহমুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সংসারে থাকিতে পারিলেন না, অদুনা পদুনাকে কাঁদাইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা লইয়া চলিয়া গেলেন। প্রব্রজ্যা শেষ হইলে রাজা দক্ষিণদেশে সমুদ্রের ধারে রহিয়া গেলেন, কেবল বৎসরে একবার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেন। পুত্রকে যোগী হইতে দেখিয়া রাণী ময়নামতী পরমসুখী হইলেন।

এই হইল গল্প দুইটির কাঠামো। বিভিন্ন কবি ও গায়েনের রচনার গুণে নানা কল্পনামিশ্রিত ও করুণরসে অভিষিক্ত এই গাথা দুইটি একদা সমগ্র ভারতবাসীর মনোরঞ্জন করিত।

শিবের গান :—

শিবের গীত বঙ্গ সাহিত্যে অতি প্রাচীন বিষয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন, "মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ শিবপূজা করিতেন। এই শিবের স্থান বুদ্ধ

অপেক্ষা নিম্নে। শূন্যপুরাণে দেখা যায় শিব বুদ্ধ বা ধর্মকে পূজা করিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। বৌদ্ধযুগের শিব কৃষকদিগের দেবতা। পরবর্তী হিন্দুধর্মের নেতৃগণ শিবের যে প্রশান্ত রজতগিরিনিভ মূর্তি ও সমাধির অবস্থা কল্পনা করিয়াছেন, বৌদ্ধযুগের শিবে তাহার কিছুই নাই।" (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১)।

কিন্তু পরবর্তী মতানুসারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শূন্যপুরাণ রচিত হয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "শূন্যপুরাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের ৩১ পৃষ্ঠায়) তাহা নগেন্দ্রনাথ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনে। কিন্তু এই গ্রন্থের বহু নূতন পুঁথির আবিষ্কার হইয়াছে এবং এখন বুঝা যাইতেছে যে, শূন্যপুরাণ নামক কোন গ্রন্থ ছিল না, কারণ কোন পুঁথিতেই এ নামের সমর্থন পাওয়া যায় নাই। এ গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে ধর্মপূজাপদ্ধতি, রামাই পণ্ডিত নামক কোন ব্যক্তির রচনা নহে, ধর্মঠাকুরের পুরোহিতদিগের রচনা।—পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর রচনা" (ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৪০, পৃঃ ৬৫১—৬৫৮)।

উপরোক্ত মতানুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, শূন্যপুরাণ ধর্মঠাকুরের পুরোহিতদিগের রচনা। সুতরাং শূন্যপুরাণে শিবের স্থান বুদ্ধ বা ধর্ম অপেক্ষা নিম্নে হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু তাই বলিয়াই প্রচলিত গাথাগুলির অন্তর্গত শিবের মূর্তি বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল এই ধারণা সঙ্গত নহে। প্রাচীন শিবসঙ্গীতের অন্তর্গত কতকগুলি ছোট ছোট কাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারলাভ করে এবং কালক্রমে গ্রাম্যকবি এবং গায়েনগণের মুখে মুখে বহু প্রচলিত হইয়া কাহিনীগুলি পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়া সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে রূপ প্রাপ্ত হয় আমরা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছি। এইরূপে প্রাচীন শিবসঙ্গীতের অন্তর্গত শিব, দুর্গা প্রভৃতির মূর্তি গাথাসাহিত্যের মাধ্যমে নব-কলেবর ধারণ করিয়াছে। শূন্যপুরাণ, রামেশ্বর ও কবিচন্দ্র প্রণীত শিবায়ন গ্রন্থ এবং দীনেশচন্দ্র সেন সংগৃহীত গোরক্ষবিজয়ের একটি প্রাচীন পালায় (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—১ম খণ্ড) আমরা শিব সম্বন্ধে যে অধ্যায়গুলি পাই সেগুলি ষোড়শ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীকালের মধ্যে রচিত। প্রাচীন শিবগানের অঙ্গচ্যুত হইয়া যে সকল কাহিনী গাথার আকারে নিরক্ষর

জনসমাজের মধ্যে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল, উপরোক্ত কাব্যের কবিগণ পরবর্তী কালে সেই সমস্ত কাহিনীকেই সংস্কৃত ও পরিবর্তিত করিয়া মার্জিতরূপ দিয়া আপন আপন গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থানকালে বোধহয় শৈবধর্মই সর্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করে। শৈবধর্ম-কীর্তনোপলক্ষ্যে ভাষায় কোন বৃহৎকাব্য সেইযুগে রচিত না হইলেও, 'ধান ভানিতে শিবের গীত' প্রভৃতি প্রবাদ বাক্যের দ্বারা অনুমান করা যায় যে, শৈবমতের অনুগামিগণ সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত এই সকল গীত কালক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একটি ভাগ 'শিবায়ন' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের রূপ নেয় এবং অপর ভাগ শিবের বিষয় লইয়া রচিত বিভিন্ন ছোটবড় গাথারূপে গীত হইয়া নিরক্ষর জনসমাজের মনোরঞ্জন করিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় শৈবধর্মের অন্তর্গত প্রাচীন শিবসঙ্গীতের শেষোক্ত নবরূপান্তরটির সহিত ধর্মের কোনও প্রত্যক্ষ আঙ্গিক যোগাযোগ রক্ষিত হয় নাই। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত 'শিবের চাষ পালা', 'মৎস্যধরা পালা', 'ভগবতীর শঙ্খ পরিধান পালা', 'বাগ্দিনীর পালা', ইত্যাদির মূল উৎস প্রাচীন শিবসঙ্গীতও হইতে পারে আবার প্রচলিত গাথাগুলি হওয়াও অসম্ভব নহে। অনেকে মনে করেন যে এই সমস্ত কাব্য হইতেই প্রচলিত গাথাগুলি রচিত হইয়াছে। অনাথকৃষ্ণ দেব তাঁহার 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"আজ পর্যন্ত পল্লীগ্রামে অনেক ভিক্ষুককে ডম্বরু বাজাইয়া ভগবতীর শঙ্খ পরিধান-বৃত্তান্ত গান করিয়া ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, এই শিবায়নই সে গানের মূল (পৃঃ ১৪১)।" কিন্তু কোনও কাহিনী রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাম্য নিরক্ষর সমাজে তাহা বহুল প্রচারলাভ করিতে পারে না। ষোড়শ হইতে উনবিংশ শতাব্দী এই একই সময়কালের মধ্যে শিবকাহিনী লইয়া রচিত মঙ্গলকাব্য এবং গাথাগুলি যথাক্রমে রচিত ও প্রচলিত হয়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কে যে কাহার নিকট ঋণী তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। এই সব কারণে মনে হয় ইহারা একই উৎসের দুইটি বিভিন্নমুখী ধারা।

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত যে সকল শিবসঙ্গীত পাওয়া যায়, সেগুলি গাজনের ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গীত হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রাপ্ত শিবের পালাগুলির সহিত ধর্মানুষ্ঠানের কোনও আঙ্গিক সম্পর্ক নাই। হিন্দু, মুসলমান সকলেই

ধর্মনিরপেক্ষভাবে এই সকল পালার রসগ্রহণ করিতে পারে। 'হরগৌরী এবং কৃষ্ণরাধাকে লইয়া আমাদের গ্রাম্যসাহিত্য রচিত, তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা'—বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ (লোকসাহিত্য)। এই সকল গীতে পুরাণোক্ত বিষয়গুলির কোন কথা দৃষ্ট হয় না। রামেশ্বরের কাব্যের 'শিবঠাকুরের কৃষিকার্য্য' প্রাচীন শিবের গানের পুনরাবৃত্তি মাত্র। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের পর শিব যে শান্ত সমাহিত সুন্দর মূর্তিতে এতদ্দেশে পূজিত হইয়াছেন, প্রচলিত গাথাগুলিতে আমরা শিবের সেই মূর্তি দেখি না। এখানে শিবকে আমরা পাই কৃষকরূপে, ভিক্ষুকরূপে এবং কখনও কখনও গৃহস্বামীরূপে। তিনি কৃষিকার্য করেন এবং গৃহে শিবানীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের ন্যায় কলহ করেন। শ্লীলতা এবং অশ্লীলতার সংমিশ্রণে পল্লীকবিগণ যে শিবমূর্তি আঁকিয়াছেন তাহার সহিত শাস্ত্রীয় শিবমূর্তির কোনও মিল নাই। শ্রীগুরুসদয় দত্ত তাঁহার 'পটুয়া সঙ্গীত' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"শিব পার্বতীর লীলাকে বাংলার চিত্রকরগণ বাংলার পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনের অনুরূপ করিয়া রচনা করিয়াছে। শিব ও দুর্গাকে তাহারা শাস্ত্রীয় রূপ দিয়া জাতির সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন অতিদূরের জিনিস করিয়া দেখে নাই, অথবা অভিজাত-সমাজের গৃহস্থ ও গৃহিণীর বিলাসীরূপ দেয় নাই। দুর্গাকে বাগ্দিনীর রূপে চিত্রিত করিতে তাহারা সাহস করিয়াছে।······পটুয়াশিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণরাধা, গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙ্গালী, শিব ও পার্বতীও পুরা বাঙ্গালী। বড়াই বুড়ির ছবি বাঙ্গালী ঠাকুরমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশী।" যথার্থ এই উক্তি। পল্লীকবিগণ পুরাণ বা ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত শিবঠাকুরকে চেনে না। শিবকে তাহারা একান্ত আপনার ঘরের জন হিসাবে দেখিয়াছে। তাই পল্লীকবি রচিত এই সকল গাথা জনসাধারণের একান্ত আপনার সামগ্রী। রঙ্গপুর অঞ্চলে যেমন গোপীচন্দ্র বা মাণিকচন্দ্রের গীত গাহিয়া একপ্রকার জাতি চিরকাল ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তদ্রূপ বীরভূম অঞ্চলে যুগী বা পটুয়া (চিত্রকর) জাতীয় একদল লোক পট বা চিত্র লইয়া কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতিকে লইয়া রচিত ছোট-বড় গাথাকাহিনী মন্দিরা সহযোগে গান করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

একই বিষয় লইয়া রচিত একই অথবা বিভিন্ন কবিরচিত এইরূপ একাধিক গাথা পাওয়া গিয়াছে। ভণিতাহীন পুঁথিও অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। গাথারচয়িতা অথবা গায়েনগণের নিকট হইতে মৌখিকরূপে শুনিয়াও এইরূপ বহু গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে সংগৃহীত এই সকল পুঁথি সংখ্যা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই সকল গাথাকাহিনী গ্রাম্য-সমাজে কি পরিমাণে আদৃত ও সুপ্রচলিত ছিল। বিভিন্ন কবি ও গায়েনের রচনাবৈচিত্র্যের স্পর্শে একই বিষয় লইয়া রচিত একাধিক গাথার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইলেও তাহাদের অন্তর্গত মূল কাহিনীরূপে কোনও বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। সর্বাধিক প্রচলিত এইরূপ কয়েকটি শিবকাহিনী লইয়া রচিত গাথার অন্তর্গত মূল কাহিনীর মোটামুটি রূপ নিম্নে দিতেছি—

মৎস্যধরা পালা :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি সংখ্যা ৩২৭৬, ২৪৫৩, ৩৮৪৭—রামেশ্বরের ভণিতা, গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত পালা, বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ পুঁথি ৪১২, ইত্যাদি।

দুর্গা সাধারণ নারীর ন্যায় আপন স্বামীনিন্দা করিয়া নারদের নিকট অনুযোগ করিতেছেন যে, অন্য লোক চাষ করিতেও যায় আবার ঘরেও ফিরিয়া আসে, কিন্তু ভোলা মহেশ্বর চাষ করিতে গিয়া আর ঘরে ফিরিলেন না। দুর্গা নারদের নিকট পরামর্শ চাহিতেছেন—

উপায় বল নারদ বাছা বুদ্ধি বল মোরে।
তোমার মামা ঘরকে আসে কেমন প্রকারে॥

নারদ তখন দুর্গাকে বাগ্দিনীরূপ ধরিয়া শিব সন্দর্শনে যাইতে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শের অন্তরালে নারদের দুষ্টবুদ্ধি অনুমান করিয়া গ্রাম্য শ্রোতাগণ প্রচুর আমোদ উপভোগ করিত। দেবর্ষি নারদ গ্রাম্য শ্রোতাদের নিকট 'কুঁদুলে' অর্থাৎ ঝগড়াটে ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। গ্রাম্যকবিগণ জনসাধারণের নিকট পরিচিত নারদের এই রূপটিকে লইয়া হাস্যপরিহাস করিবার সুযোগ হারাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই রচয়িতাগণ নারদকে শিব-দুর্গার কোন্দলের চাবিকাঠিস্বরূপ ব্যবহার করিতেন।

নারদের পরামর্শ দুর্গার বেশ মনঃপূত হইল এবং তাঁহার আদেশে স্বর্গের 'কামিলা' জাল, দড়ি নির্মাণ করিয়া দিল। জাল, দড়ি লইয়া বাগ্দিনীবেশে দুর্গা শিবসন্দর্শনে চলিলেন। মাঠে গিয়া ধান দেখিয়া পার্বতী খুশী হইলেন। কিন্তু

ধান্যক্ষেত্রের জল ছেঁচিতে গিয়া দুর্গা এমন গণ্ডগোল বাধাইয়া দিলেন যে, 'বসিবার আসন শিবের করে টলমল'। শিব তখন সংবাদ আনিতে ভীমকে ধান্যক্ষেত্রে পাঠাইলেন। শিবের আজ্ঞা পাইয়া ভীম—

স্বরূপ পুরের মাঠে গিয়া ব্রহ্মডাক ছাড়ে
ভীমের শব্দতে আকাশ পাতাল নড়ে।

এমন সময় বাগ্দিনীরূপিণী দুর্গাকে দেখিয়া ভীম বলিতে লাগিল—

পালাবি তো পালা গো রূপের বাগ্দিনী।
কেড়ে নিব জাল দড়ি নেথিয়ে ভাঙ্গব হাঁড়ি।
ধরে লয়ে যাব তোরে মামার বরাবরি
যতগুলি ধান ভেঙ্গেছে গুনে নিব কড়ি।

দুর্গা ভীমের সহিত বচসা শুরু করিলেন। অবশেষে ভয় পাইয়া ভীম পলাইয়া শিবের নিকট গিয়া বলিতেছে—

ভাগ্যে-পূর্ণে বেঁচে এলাম বাগ্দির কন্যার হাতে।

শিব বলেন—

কেমন রূপের বাগ্দিনী কেমন চরিত।
মেয়ে হয়ে পুরুষ বধ শুনি বিপরীত।

ভীম দুর্গা রূপের বর্ণনা করিয়া বলিতেছে—

কাল নয় গোর নয় মামা মধুর বরণ খানি।
দূর হতে দৃষ্টি করলাম ঘরে যেমন মামী।

শিব তখন ভীমকে সঙ্গে করিয়া বাগ্দিনীকে দেখিতে চলিলেন। শিব কিন্তু বাগ্দিনীবেশী দুর্গাকে চিনিতে পারিলেন না। শিব বাগ্দিনীবেশী দুর্গাকে বলিলেন, "ধান্য ভেঙ্গে মৎস্য মার বুকে নাইকো ডর।" শিব ও ছদ্মবেশিনী পার্বতীর কোন্দল শুরু হইল। অবশেষে ভীমের পলায়নের কথা শুনিয়া শিব লজ্জিত হইয়া পার্বতীর পরিচয় জানিতে চাহিলে, দ্ব্যর্থবোধকরূপে পার্বতী আপন পরিচয় দিলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যেও পার্বতীর এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক পরিচয় দানের বিবরণ পাই। তখন পার্বতীর রূপে মোহপ্রাপ্ত গ্রাম্যকবির 'শিব বলে যে জাত হও বাগ্‌দিনী ওই জাতি হব, তোমার রূপে গুণে এ জাতি মজাব।' মনসামঙ্গল কাব্যেও শিবের এই রূপ পাই। শিব দুর্গার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন, দুর্গা এই সুযোগে ছলনা করিয়া শিবের অঙ্গুরীটি চাহিয়া লইলেন।

ইহার পর দুর্গা কোপায়, দামোদর, চিলে খাড়মোরা, অমলা, কমলা, পদ্মাবতী প্রভৃতি নদীকে স্মরণ করিয়া সেখানে জলবন্যা বহাইয়া দিলেন। দুর্গা স্নান করিবার অছিলায় শিবের নিকট বিদায় লইয়া কৈলাসে ফিরিলেন। শিব বাড়ি ফিরিলে দুর্গা নারদকে ডাকিয়া শিবকে শুনাইয়া শ্লেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

তোর বাগ্‌দীমামা ঘর এল তোর বাগ্‌দীমামী কই
অঙ্গুরীটি দেখি না হে অঙ্গুলের উপর।

শিব বলিলেন,

ভুঁই নিড়াইতে বসেছিলাম বড় ধানের ভুঁয়ে
অঙ্গুরীটি গিয়েছে পড়ে তাও নাইকো মনে।

দুর্গা তখন অঙ্গুরীটি শিবের বরাবর ফেলিয়া দিলে শিবঠাকুর মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধির জোরে শিব দুর্গাকে উল্টাচাপ দিয়া বলিলেন—

বাগ্‌দিনী নয় ওগো দুর্গা অভয়ামঙ্গল
ওই প্রকারে বোঝ তুমি পরপুরুষের মন।

এতবড় অপমানে দুর্গার মাথা হেঁট হইল, অথচ প্রতিবাদ করিবার কোনও উপায় নাই। আপন ফাঁদে দুর্গা আপনি আটকা পড়িলেন।

এইরূপে পল্লীকবিগণ হিন্দু দেবতাদিগের দেবত্ব মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহাদিগকে দোষগুণসমন্বিত সাধারণ গ্রাম্য নরনারীরূপে জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন।

চাষ-পালা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসংখ্যা ২৪৫৫ (ভণিতা রামেশ্বর), গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত পালা, গৌরীহর মিত্র সংগৃহীত পালা। বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ পুঁথি ৫২৭।

এই গাথাটির কতকগুলি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি রামেশ্বরের ভণিতায় রচিত। গুরুসদয় দত্ত পটুয়াগণের নিকট হইতে একটি পালা সংগ্রহ করেন। গৌরীহর মিত্র বীরভূমের গ্রামাঞ্চল হইতে একটি পালা সংগ্রহ করেন। ইহা ছাড়াও বহু অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পালাগুলির অন্তর্গত কাহিনীর মূল রূপ এইপ্রকার—

গ্রাম্যকবিগণ এই পালাটিতে শিব ও দুর্গার ঘর-গৃহস্থালীর বর্ণনা দিয়াছেন। বাঙ্গালী গায়েন আপন ঘর-গৃহস্থালীর অভিজ্ঞতা শিব, দুর্গার গৃহস্থালীতে আরোপ করিয়াছেন।

শিবের শরীর খারাপ তাই ভিক্ষায় যাওয়ার ইচ্ছা নাই।

এদিকে,

শিবের ঘরে অন্ন নাই বাতাসে নড়ে হাঁড়ী।
সকলে যে ধন দিয়ে, আপনি ভিখারী ॥

শিব দুর্গাকে বলিলেন—

তোমা হতে অন্ন আজ আর ঘরে বসে খাব।

গৌরী জানাইলেন যে, ঘরে একমুঠাও চাল নাই। শিব দুর্গার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া বলিলেন—

কাল ভিক্ষা করিলাম দুর্গা কুচনি নগরে
কি বুঝে বল গৌরী অন্ন নাইকো ঘরে ॥

দুর্গাও গ্রাম্যবধূটির ন্যায় মুখ ঝামটা দিয়া বলিতেছেন—

কতগুলি ঘরের ব্যয় না জান বুড়াটি।
তোমার একলা ভীমকে চায় বাহান্ন পৌটি ॥
হাতে খড়ি করি গোসাঞী নাও কেন্নে লেখা।
উচিত কথা বল্‌তে হলেই মুখ কর্ছো বাঁকা ॥
ভিক্ষার অন্নে কুলায় না হে ঠাকুর চাষে দাও মন।
ফল তুলসী পাবে সকল দেবতাগণ ॥
অন্যলোকের বালকগুলি দুধে ভাতে খায়।
সোনার চাঁদ গণপতি অন্নকে লালায়। (বঙ্গনারীর চিরন্তন অভিযোগ)
চাষ কর্ম কর ঠাকুর সুখে অন্ন খাব।
বড় বড় মুনির নাগাল দুয়ারে বসে পাব ॥

শিব কিছুতেই চাষ করিতে রাজী হন না, বয়সের দোহাই দিয়া আপন অকর্মণ্যতার কথা বলিলে দুর্গা বলিলেন, 'কার্তিক-গণেশ সঙ্গে দেব ঝাড়বে ক্ষেতের ছরো' ॥ শিব তখন রকমারী বাহানা ধরিলেন।

কোথা পাব লাঙ্গল জোঙাল, কোথা পাব বীজের ধান।
কোথা গেলে পাব দুর্গা ক্ষেতের কৃষাণ ॥

যেন যত দায় দুর্গারই। দুর্গাও হাল ছাড়িবার পাত্রী নন। দুর্গার পরামর্শে অবশেষে ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া কোদাল-ফাল হইল আর দুর্গার বাঘ ও শিবের বলদ জুড়িয়া হাল জোড়া হইল। দুর্গার আদেশে ভীম লক্ষ্মীর ঘর হইতে বীজ আনিতে চলিল।

লক্ষ্মী চাঁদ-সুরুয দুই ভাইকে সাক্ষী মানিয়া শামুকখানেক বীচন ভীমকে দিলেন এবং চুক্তি হইল—

ক্ষেতে হলে দুশামুক ভীম দিয়ে যাবেন আমারে।

অতঃপর লক্ষ্মী ভীমকে আহার করিতে বলিলেন—

লক্ষ্মী, বলে যত খাও তত ভীম পেটে খেতে দিব ।
পেটে খাবার দিতে জামিন নাইক লোব।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের দান অঢেল, কিন্তু ঋণ সীমাবদ্ধ।

ভীমের আহারের বর্ণনাটি বেশ চিত্তাকর্ষক—

ওই কথা শুনে ভীম কুদিয়ে বসিল।
নখের টঙ্কারে ভাঙ্গে লোহার পঞ্চবেল
সইসে নিচুড়ে সেদিন গায়ে মাখে তেল।
বা'হান্ন পৌটী চাল খেতে বাহান্ন পৌটী ডাল
শত হাঁড়া ঘৃত দিলে নব মণ চাল।

এই সমস্ত সামগ্রী লইয়া ভীম যমুনার ধারে গেল রসুই করিতে। ভীমের রান্নার বর্ণনাটিও বেশ মজার—

ভীমের গদাতে সেদিন তিউড়ী খেঁচিল
আড়াই মুড়োতে সেদিন পাক নির্মাণ হইল।
হাঁড়ার কানা ধরে সেদিন মাড় গড়াইল
খাড় জোলা বলে একটা নদী নির্মাণ হল।
যোল ক্রোশ জুড়ে কলার আঙ্গোট ফেলিল
পর্বত সমান অন্ন সাজাইতে লাগাইল।
গরম অন্নতে ভীম ঘৃত ছিটাইয়া দিল
মুণের ছড়া দিয়ে সেদিন ভোজনে বসিল।

ইহার পর আহার পর্ব—

সেই সকল সাননে ভীমের আড়াই গেরস হল
চৌষট্টী পণ আমের আঁটী চুষে চুষে খেল।
নোট ধরে জল খেতে যমুনা শুকাইল
মা দুর্গার বর ছিল যমুনা উথলে উঠিল।
লক্ষ্মী এসে শুধায় বাবার অন্নেতে কুলাইল।

এত আহার করিয়াও ভীম উত্তর করিল—

জলে থলে মাগো আমার পণ পেটা হল।

চাষকার্যের অপেক্ষা কার্যের উদ্যোগই বেশী।

ইহার পর ভীম 'বীচন বাঁধিয়ে তবে কৈলাসেতে গেল

বাঘ-বসোয়াতে হাল মর্তে জুড়ে দিল।

এক চাষ দু-চাষ ভীম তিন চাষ করিল।

তিন চাষ করে সেদিন বীচন ছড়াইল।

এইরূপে শিবের চাষপর্ব সমাধা হইল।

ভগবতীর শঙ্খ পরিধান পালা :—

ভগবতীর শঙ্খ পরিধানবিষয়ক সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ বহু গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত অজ্ঞাত কবি-রচিত একটি অসম্পূর্ণ পুঁথি (৪২৫৩ সংখ্যক), গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন কবি রচিত ৪টি পালা এবং গৌরীহর মিত্র কর্তৃক বীরভূমের গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত একটি পালার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন গাথান্তর্গত কাহিনীটি মোটামুটি এইরূপ—

ব্যাঘ্রছাল বিছাইয়া শিব ও পার্বতী বসিয়া আছেন। দেবী দুর্গা শিবের কাছে একজোড়া শঙ্খ পরিধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শিব বলিলেন, 'সোনা, রূপার গহনা পর, অকালে বিক্রয় করিলে কাজে লাগিবে। রাঙা শঙ্খ পরিলে কি হইবে?' গৌরী উত্তর করিলেন, "সোনা রূপা পরিলে গায়ে ব্যথা হয়, রাঙা শঙ্খ পরিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়।" তখন শিব গৌরীকে বলিলেন যে, তাঁহার পিতা দক্ষরাজা ধনী, শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা হইয়া থাকিলে দুর্গা তাঁহার কাছে যান। কিন্তু গৌরী স্বামীর এই অক্ষমতায় চটিয়া গিয়া সাধারণ গ্রাম্যনারীর ন্যায় শিবকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিয়া কার্তিক, গণেশের হাত ধরিয়া বাপের বাড়ী চলিলেন। নারদকে উপস্থিত করিবার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার গ্রাম্যকবিগণ যথারীতি করিয়াছেন। 'কুঁদুলে' নারদ আসিয়া গৌরীর মুখে সমস্ত শুনিয়া চলিলেন শিবের কাছে। দুর্গাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য শিব নারদকে অনুরোধ করিলে নারদ পুনরায় দুর্গার নিকট উপস্থিত হইয়া শিব-দুর্গার মধ্যে ঝগড়া লাগাইবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলিলেন, "মামী, এইবেলা পালাও, মামা

দেখিতে পাইলেই তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। শঙ্খ পরিবার সাধ যদি সত্যই থাকে তো পিতা দক্ষরাজের কাছে যাও।" এই কথা দুর্গাকে বলিয়া নারদ শিবের কাছে ফিরিলেন এবং বলিলেন যে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তিনি স্বামীকে ফিরাইতে পারিলেন না। গ্রাম্যসমাজে একশ্রেণীর ব্যক্তি আছে যাহাদের স্বভাব এই কলহপ্রিয় নারদের মত। গ্রাম্যজীবনধারার সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত কবিগণ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কটাক্ষ করিয়াই নারদ-চরিত্র অঙ্কিত করিতেন এবং জনসাধারণও তাহার রসোপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করিত। যাহাই হউক, নারদের কথা শুনিয়া শিব তাহার নিকট পরামর্শ চাহিলেন কি করিয়া পার্বতীকে ফেরানো যায়। নারদ শিবকে বুদ্ধি দিলেন যে, বাঘ হইয়া পথের মাঝে পার্বতীকে বাধা দিলেই তিনি ফিরিবেন। শিব 'বড়বনের বাঘ' সাজিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। কার্তিক, গণেশ ভয় পাইয়া পালাইতে চাহিলে গৌরী বলিলেন, "ভয় কি, এই বাঘে চড়িয়াই বাপের বাড়ী যাইব।" এই বলিয়া দুর্গা কাপড় গুছাইয়া যেই বাঘের পিঠে চড়িতে যাইবেন অমনি বাঘরূপী-শিব বনের মধ্যে পালাইয়া বাঁচিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শিব নারদকে দোষারোপ করিতে লাগিলেন, তাহার বুদ্ধিতেই পার্বতী শিবের ঘাড়ে চাপিতে গিয়াছিলেন। তখন নারদ শিবকে শাঁখারী সাজিবার বুদ্ধি দিলেন। শিব গরুড় পক্ষীকে ডাকিয়া শঙ্খ আনিবার জন্য আদেশ দিলে, গরুড় পক্ষীরা মিলিয়া সমুদ্রতীর হইতে কতকগুলি শঙ্খ আনিয়া দিল। শঙ্খ লইয়া মহাদেব বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া শঙ্খ নির্মাণ করিতে বলিলেন। বিশ্বকর্মা শঙ্খ নির্মাণ করিয়া দিলে—

> শাখার গুঁড়িগুলি মহাদেব গায়েতে মাখিল।
> শাখাঘষা কড়িখানি ডান বগলে নিল।
> সিদ্ধির ঝোলা গাঁজার কলকে বাঁ বগলে নিল।
> শঙ্খের পসরা মহাদেব মাথায় তুলে নিল।
> এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
> শিবের খুড় শ্বাশুড়ী ঘরের বাহির হইল।
> শঙ্খ পরাবার লেগে শিবের খুড় শ্বাশুড়ীকরে তাড়াতাড়ি।
> মাথায় বসন দেয় না তারা করচে হুড়াহুড়ি।

মহাদেবের এই অপরূপ রূপবর্ণনা পল্লীকবির ভাষায়ই সম্ভব। শাঁখারীবেশী শিবকে দুর্গা চিনিতে পারিলেন না। শাঁখা দেখিয়া তাঁহারও পরিবার সাধ হইল।

তখন—

সোনার খাটে বসে গৌরী রূপার খাটে পা
শঙ্খ পরতে বসল কার্তিক গণেশের মা।

শিব গৌরীকে শঙ্খ পরাইয়া মন্ত্র পড়িলেন—

যাবার সময় যাবি শঙ্খ নড়িয়ে চড়িয়ে
আসবার সময় আসবিনা শঙ্খ বজ্রাঘাত পড়িলে।

শঙ্খ পরা হইলে গৌরী শাঁখারীর পরিচয় চাহিলে শিব বলিলেন,

স্বর্ণপুরে থাকি আমি ইন্দ্রপুরী ঘর
আমার নাম দেব শাঁখারী পিতা সদাগর।

শিবের এইরূপ উদ্ধত উত্তর শুনিয়া গৌরী ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্খ ফিরাইয়া দিবেন স্থির করিলেন। মন্ত্রের গুণে শঙ্খ তো বাহির হইবে না, তাই দুর্গা কাটারি দিয়া হাত কাটিয়া শঙ্খ বাহির করিয়া দিতে চাহিলে শিব বলিলেন, রক্তমাখা শংখ নগরে বিক্রয় করিতে গেলে লোকে তাঁহাকে ডাকাত বলিবে। শিবের এই কথায়,

গৌরী ক্রোধভরে চায়
তবু যে দেব শাঁখারী ভস্ম নাহি হয়।

গৌরী তখন শিবকে চিনিতে পারিলেন এবং আপন ভুল বুঝিয়া

ওই খানে গৌরীর ক্রোধ ক্ষান্ত হল
শিব দুর্গার যুগলমিলন কৈলাসেতে হল।

এইরূপে ভগবতীর শাঁখা পরার শখ মিটিল।

দুর্গার কোন্দল :—

গৌরী ও শিবের কোন্দল লইয়া রচিত কতকগুলি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু শিব ও দুর্গার কলহ। গ্রাম্য দম্পতীর কলহের ন্যায় শিব-দুর্গার এই দাম্পত্যকলহ গ্রাম্য জনসাধারণের যে খুব উপভোগের বস্তু ছিল তাহা এই বিষয় লইয়া রচিত একাধিক পুঁথিসংখ্যা হইতে অনুমান করা যায়। গৌরীর কলহপ্রিয়তা লইয়া রচিত একটি সুন্দর ছোট গাথাকাহিনীর পরিচয় পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৩০ সংখ্যক পুঁথিতে। এই পুঁথিতে গৌরী ও রাধার কলহ একটি ছোট কাহিনীর আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

একটি ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের দুই পৃষ্ঠায় রচনাটি লিপিবদ্ধ। লিপিকার ও রচয়িতার নাম যথাক্রমে শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চট্টোরাজ ও 'নিরঞ্জন'। ইহাদের আর কোনও পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। লিপিকাল ১২৬৫ সাল। গাথাটির রচনাকালও উনবিংশ শতাব্দী বলিয়াই মনে হয়। কাহিনীটি এইরূপ—

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ বশী একাসনে।
কি শোভা হএছে মঙ্গলবিন্দ্রাবোনে॥

শিব পার্বতীকে লইয়া কৈলাস হইতে শ্রীক্ষেত্র দর্শনে চলিলেন এবং যেখানে রাধাকৃষ্ণ বসিয়া আছেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ উঠিয়া পরম সমাদরের সহিত শিবকে আসন দিলেন, কিন্তু,

তখন শ্রীমতী রাধে হাস্য জে করিল।
হাস্য দেখি দশভুজা জলন্ত হইল॥

দুর্গা রাগিয়া গিয়া রাধিকার এই হাস্যের কারণ শিবের নিকট জানিতে চাহিলেন, তখন—

মহেশ বলেন স্যুন মহিসমর্দ্দিনি।
বিকভানুসুত রাধে রাজার নন্দিনি।

শিবের এই কথায় পার্বতী আরও রাগিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,

রাজার নন্দিনি রাধে কমি কিসে আমি।

কেন না—

দেবের ভাণ্ডারি তোমার তুমি মোর পতি।
কিশের অভাব মোর হাশীলা শ্রীমতি।

পার্বতীকে খুসী করিবার জন্য শ্রীমতী তখন পার্বতীর গুণকীর্তন করিলে, শ্লেষ মনে করিয়া দুর্গা আরও রাগিয়া গেলেন এবং শিষ্টাচার ভুলিয়া শ্রীমতিকে কটূক্তি করিয়া বলিলেন,

নারী হএ রাজা হৈলি কোটাল হৈল হরি।
ধিক থাকুক তোকে রাধে যুনে লাজে মরি॥

শ্রীরাধিকাও কম যান না। দুর্গার এই দুর্ব্যবহারে তিনিও আর ধৈর্য ধরিতে পারিলেন না।

রাধে বলে দিগম্বরি স্যুন মন দিঞা।
দেবের মাঝে ফির তুমি উলঙ্গ হইঞা॥

পরম বৈষ্ণবি তুমি জগত জননী
তবে কেনে রুধির পান করিলে ভবানি ॥
লজ্জা সরম নাহি তোমার ভেবে দেখ মনে।
ব্রহ্মময়ই হঞে কালি মূর্ত্তি ধর কেনে।

দুর্গাও পাল্টা জবাব দিলেন—

কালি মূত্তি নিন্দা কৈলে রসিক নাগরি।
কালিরূপ ধরে ছিল তোমার মুরারি ॥

ইহার পর দুর্গা বস্ত্রহরণের কথা উল্লেখ করিয়া রাধাকে লজ্জা দিতে চাহিলে রাধা বলিলেন, 'যাহাকে জীবন যৌবন ধন মান সব সঁপিয়াছি, তাহার নিকট লজ্জা কিসের।' রাধা এইবার শিবের ভিক্ষা মাগিয়া খাইবার কথা বলিয়া পার্বতীকে লজ্জা দিতে লাগিলেন। তখন—

দুর্গা কহে মোর স্বামী ভিক্ষা মাগিলে পায়।
ছেনা মাখন তোর কৃষ্ট চুরি করে খায় ॥
তোর কৃষ্ট গিঞাছিল ভিক্ষা মাগিবারে।
ভিক্ষা লএ বান্ধা আছেন বলি রাজার দ্বারে ॥

কবি এইখানে দুর্গার চরিত্রের মাধ্যমে চিরন্তন বাঙ্গালী নারীচরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বাঙ্গলার নারীজাতি আপনমুখে স্বামী নিন্দা করে, কিন্তু অপরের মুখে আপন স্বামীর নিন্দা কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। শিবের ভিক্ষা মাগিয়া খাইবার কথা রাধার মুখে শুনিয়া দুর্গা অসহ্য ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়াছেন, অথচ দুর্গা স্বয়ং শিবকে ভিক্ষার কথা বলিয়া অহোরাত্র গঞ্জনা দিয়া থাকেন। অল্প কথার ভিতর দিয়া বাংলাদেশের গ্রাম্যনারীচরিত্র বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই সমস্ত গ্রাম্যকবিগণের।

অতঃপর দুর্গা ও রাধার ঝগ়ড়া যখন তুমুল হইয়া উঠিল তখন—

হরি কহিছেন হরে হইল উৎপাত।
দুইজনার দন্দ ঘুচাও বিশ্বনাথ ॥

অনন্যোপায় হইয়া তখন—

হর বলে হৈমবতি বইসহ মোর বামে।
হরি বলে এস রাধে বসি একাসনে ॥
মিছামিছে দন্দ দুইজনে কেন কর।
আমাদিগে পাইএ সকল ক্ষেমা কর ॥

তখন কলহ ভুলিয়া পার্বতী ও রাধা—

দুই জনার বামেতে বসিলা দুই জনে
সাক্ষাত মঙ্গলধাম হইলা বিন্দাবোনে ॥
শ্রীহরির অর্দ্ধ অঙ্গ হইলেন হর।
হরের অর্দ্ধ অঙ্গ হইলেন নবজলধর ॥

এইরূপে শিব ও কৃষ্ণ আপনাদের অভিন্নত্ব দেখাইয়া পার্বতী ও রাধার ভুল ভাঙ্গাইলেন। হরিহরের মিলন দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী আনন্দিত হইল।

হরিহর এক বস্তু ভিন্ন ভেদ নাই।
হরিহর ভজিলে সমনে ভয় নাই ॥

হরিহরের মিলনে রাধা-পার্বতীর দ্বন্দ্ব মিটিল।

গাথাটিতে রাধা ও পার্বতীর কলহের মধ্য দিয়া দুইটি গ্রাম্যনারীর কলহের একটি পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

সূর্যের গান—

ভারতবর্ষে সূর্যপূজা বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। বেদে সূর্য অনেক স্থলে বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত। এমন কি রামায়ণের সময়ও সূর্যের বিষ্ণু আখ্যা যায় নাই। সূর্যপূজা উপলক্ষ্যে রচিত সূর্যমঙ্গলের গীতগুলি হইতে কিছু কিছু কাহিনী গাথার আকারে গ্রাম্য জনসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন সূর্যবন্দনায় যে সকল উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, কালে সেই সকল উপাখ্যান পরবর্তী শিব ও কৃষ্ণের উপাসনায় আরোপ করা হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যসমূহে কোথাও কোথাও 'গৌরী' শিবের স্ত্রীরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সূর্যের কাহিনী লইয়া রচিত কোনও কোনও গানে দেখা যায় যে, সূর্যের স্ত্রীর নাম 'গৌরী'। শ্রীকৃষ্ণের নৌকা-বিহার সম্বন্ধীয় ব্রজলীলার যে সকল পদ আছে, তাহার আদি-কথা সূর্যের নৌকা-যাত্রায় সূচিত।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ১ম খণ্ডে একটি সূর্যের গানের পরিচয় দিয়াছেন। সূর্যব্রত কথা লইয়া রচিত বহু উপাখ্যান আবিষ্কৃত হইলেও, সূর্য উপাখ্যান লইয়া রচিত লৌকিক গাথার উল্লেখ একমাত্র ডঃ দীনেশ সেনের উক্তিতেই পাওয়া যায়। সূর্যের গানের উপাদান কালক্রমে শিব ও শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে মিশিয়া যায় এবং এই কারণেই সূর্য কাহিনী লইয়া রচিত বিশুদ্ধ গাথা পরবর্তী কালে খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।

ডঃ দীনেশ সেন যে গাথাটির বিবরণ দিয়াছেন তাহা অতি প্রাচীন। সংগ্রহকালে লোকগাথার বৈশিষ্ট্য অনুসারে মূল রচনাটির ভাষা অনেকটা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, সন্দেহ নাই, তবুও এই গানটি হইতে দেখিতে পাই গ্রাম্যকবিগণ সূর্যদেবকেও গৃহস্থঘরের আদরের দুলাল কল্পনা করিয়া বাংলার মাটিতে নামাইয়া বাংলার জনসাধারণের একজন করিয়া দেখিয়াছেন। দেবদেবী-গণের দেবত্ব লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে ঘরের মানুষ করিয়া তুলিবার অসীম ক্ষমতা দেখি এই পল্লীগাথা রচয়িতাগণের মধ্যে। আলোচ্য গানটি বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

এই আদিম গ্রাম্যরচনায় কিছু কিছু কবিত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানে বালক-সূর্যের সোহাগের বর্ণনা বঙ্গজননীর সন্তানস্নেহের কথা স্মরণ করায়। যেমন—

> সোনার বাটী আগর চন্নন রুপার বাটী তৈলরে।
> স্নান কর ছাওয়াল সূর্য্যাইরে॥
> দুগ্ধের পুষ্কর্নী সূর্য্যাই নুইএগ্রা দাও ডুবরে।
> স্নান কর ছাওয়াল সূর্যাইরে॥

আবার স্নান সারা হইলে—

> স্নান কল্লা ছাওয়াল সূর্য্যাই ধুতি-গামছা কোথা পাইলারে।
> স্বর্গে আছে আঁতীর ছাওয়াল সূর্য্যাইর ধুতি-গামছা জোগায় সেওরে॥

ইত্যাদি

সূর্যের বিবাহেচ্ছার অভিব্যক্তি গ্রাম্য কবির রসিকতায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়াছে, যেমন—

> ওপার দুইটি বাওনের কন্যামেল্যা দিছে সাড়ি।
> তাহা দেখ্যা সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী॥
> ওগো সূর্য্যাইর মা।
> তোমার সূর্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না॥

এইরূপ সূর্য কোনদিন কন্যার কেশ, কোনওদিন বেশ দেখিলেন এবং

> তাহা দেখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়।

তখন ঘটকের আগমন হইল। ইহার পর বিবাহ-সজ্জা ক্রয়, সূর্যের বিবাহ প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়া সাধারণ গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিচয় পাওয়া

যায়। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা শ্বশুরবাড়ীতে যাইবার সময় আতঙ্কবিহ্বল হইয়া পড়ে। সূর্যের নববিবাহিতা বধূ 'গৌরী'-র ভিতর আমরা বাঙ্গলাদেশের মেয়ের এই আতঙ্কবিহ্বল রূপ দেখিতে পাই। গৌরীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে তবুও তাহাকেই বিদায় দিতে সকলে কাঁদিতেছে এই চিন্তা তাহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গোপন কোণে এক প্রকারের তৃপ্তি ও আনন্দের আস্বাদন আনিতেছে। মা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার গভীর দুঃখের মধ্যেও এই অনুভূতি তাহার হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতেছে, তাই গৌরী বিলাপের সুরে মাঝিকে বলিতেছে,

ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা চলকে ওঠে পানী ॥
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি ভাই মায়ের কাঁদন শুনি ॥ ইত্যাদি

অতঃপর নূতন পরিবেশানভিজ্ঞ গৌরীর ভীতিবিহ্বল প্রশ্নের উত্তরে স্বামী সূর্য তাহাকে আদরের সহিত অভয় দান করিতেছে এবং প্রকারান্তরে তাহাকে শ্বশুরবাড়ীর পরিজনবর্গের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিয়া সুগৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা হইবার শিক্ষা দিতেছে। গ্রাম্য কবির সহজ, সরল ছন্দ ও ভাষায় রচিত গৌরী ও সূর্যের এই উক্তি-প্রত্যুক্তি উল্লেখযোগ্য—

তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি মা বলিমু কারে।
আমার যে মা আছে মা বলিবা তারে॥
তোমার দেশে যামুরে সূর্য্যাই আমি বাপ বলিমু কারে।
আমার যে বাপ আছে বাপ বলিবা তারে॥

এই প্রকারে সূর্য অনভিজ্ঞা বালিকা গৌরীকে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহশীল ও অনুরক্ত করিয়া তুলিতেছে।

গ্রাম্যকবির মুখনিঃসৃত এই সকল বর্ণনা শুনিতে শুনিতে গ্রাম্য জনসাধারণ ভুলিয়া যাইত যে সূর্য তাহাদের ঘরের কেহ নহে, সূর্যদেব হিন্দুগণের পূজ্যদেবতা।

কৃষ্ণের গান—

ভারতবর্ষের সর্বত্রই কৃষ্ণপূজা বহুল প্রচলিত। বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে এখনও পরম সমাদরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানারূপে পূজা পাইয়া থাকেন, কখনও বালগোপালরূপে, কখনও নারায়ণরূপে, কখনও বা গৌরাঙ্গ, রাম ইত্যাদি অবতাররূপে, আবার কখনও কখনও মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে। ভারতের সর্বত্র

নানাপ্রকারের কৃষ্ণ-উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কিন্তু বাঙ্গালীজাতি কৃষ্ণকে যেরূপ আপন করিয়া নিয়াছে এমন আর কোথাও দেখা যায় না। বাঙ্গলাদেশে কৃষ্ণ কাহারও সখা, কাহারও পুত্র আবার কাহারও বা প্রেমাস্পদ। গ্রাম্যসমাজে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই বোধহয় প্রবল ছিল, তাই গ্রাম্যকবি-রচিত গাথাকাব্যগুলিতে কৃষ্ণের বাল্যলীলা-সংক্রান্ত কাহিনীই বেশী পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, তালভক্ষণ, ফলভক্ষণ, মৃত্তিকাভক্ষণ ইত্যাদি কাহিনী লইয়া রচিত একাধিক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। মৈমনসিংহের মহিলা কবি সুলাদেবী রচিত একটি গোপিনীকীর্তন সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাও গাথা জাতীয় কাব্য। এই সকল রচনার অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের পূজ্য দেবতা নহেন, শ্রীকৃষ্ণ এখানে দুরন্ত গ্রাম্যবালক। এই দুরন্ত বালক সঙ্গীগণ সহ পরের বাগান হইতে তাল চুরি করিয়া, ফলওয়ালীর ঝুড়ি হইতে ফল তুলিয়া লইয়া, ননীমাখন চুরি করিয়া গ্রামবাসিগণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। কোন কোন কবি ভক্তিভাব-প্রসূত আপন আপন রচনাশেষে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেও, গাথান্তর্গত কাহিনীর বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণকে আমরা গ্রাম্যবালকরূপেই পাই। প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ-এর উপাখ্যানসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহকালে গ্রাম্যকবিগণ গ্রাম্যজনসাধারণের উপভোগ্য বিষয়গুলিই গ্রহণ করিতেন এবং এই সমস্ত উপাদানের সাহায্যে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের উপযোগী গাথাসমূহ রচনা করিতেন। এইরূপ কয়েকটি গাথার বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

কৃষ্ণের জন্মকথা—

কৃষ্ণের জন্মকথা লইয়া রচিত একাধিক গাথা পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬৩৯, ১০৬০ সংখ্যক পুঁথি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯১৮ সংখ্যক পুঁথি, সুলাকবি রচিত গোপিনীকীর্তনের অন্তর্গত কৃষ্ণজন্মকথা প্রভৃতি প্রত্যেকটি রচনাই কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ ও বাসুদেবকর্তৃক শিশু কৃষ্ণকে গোকুলে স্থানান্তরকরণের বিবরণ লইয়া রচিত। বিভিন্ন কবি-রচিত এই সকল গাথায় গ্রাম্যভাষায় কৃষ্ণের জন্মবিবরণকাহিনী গীতের আকারে রচিত হইয়া জনগণের আনন্দবিধান করিত। কবিচন্দ্র কৃষ্ণের জন্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া গাহিয়াছেন—

দ্বাপোর যোগের সেসে কৃষ্ণ অবতার
কৃপা করি বিনাসিলা প্রথিবির ভার ॥

এই কৃষ্ণের জন্মকথা—

একচিত্তে সুনিলে অশেষ পাপনাশে।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ব্যাশের আদেশে ॥

। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৪৬৩৯।

পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যমহিলা কবি 'সুলা' বা 'সুলক্ষণা' বাসুদেবের গোকুল যাত্রার কথা বর্ণনা করিতে করিতে গাহিয়াছেন, যমুনার ধারে পৌঁছিয়া—

চিন্তাযুক্ত বসুদেব পড়িল বসিয়া।
উপরেতে কালমেঘ উঠিল গর্জিয়া ॥
বসুদেবের দুঃখে কান্দে দেবতাসকল।
ছুটিছে পবন অতি হইয়া প্রবল ॥

কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে—

বিজুলীর ছটা হইল বসুর সহায়।
বিজুলী পশরে বসু দেখিবারে পায় ॥
এক শৃগালিনী সেই যমুনার জলে।
হাঁটিয়া যমুনা পার হয় অবহেলে ॥
দেখিয়াত বসুদেবের সাহস বাড়িল।
জলধর কোলে করি জলেতে নামিল ॥

মহাভারতের চিরপ্রচলিত কৃষ্ণ-উপাখ্যানের বিবিধ কাহিনী এইরূপে গ্রাম্যকবিগণের সহজ, সরল ভাষার মাধ্যমে গীত হইয়া নিরক্ষর জনসাধারণের চিত্তরঞ্জন করিত।

উপরিউক্ত গ্রাম্যমহিলাকবির পরিচয় দিতে গিয়া ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে মৈমনসিংহ জেলার সর্বত্র সুলার নাম সুপরিচিত ছিল। সুলার পালাগান না হইলে কোনও আসর জমিত না। এই সকল গান গাহিয়া সুলাকবি প্রভূত উপার্জন করিত।

তালভক্ষণের পালা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে শ্রীকৃষ্ণের তালভক্ষণ লইয়া রচিত একটি গাথার সন্ধান পাই (পুঁথিসংখ্যা ১০২৭)। পুঁথিটি ক্ষুদ্র, তিন পাতার পুঁথি, রচয়িতা নন্দরাম ঘোষ কর্তৃক ১২১২ সালে রচিত। লিপিকার শ্রীবৃন্দাবন দুবে। এই গাথাটিতে আমরা গ্রাম্যবালকগণের দুরন্তপনার পরিচয় পাই।

প্রভাত হইল আল্য জত সিযুগণ।
রাম কানু সঙ্গে লঞা আনন্দিত মন॥
সিঙ্গাবেনুস্বরে সভে হরসিত হৢআ।
পরম কৌতুকে নাচে নন্দ দুলালিয়া॥

এইরূপে নাচিতে নাচিতে আনন্দিত মনে বালকেরা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সহ গিয়া বনের মধ্যে উপস্থিত হইল। বনে প্রবেশ করিয়া সকলে কানুর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রীড়াশেষে ক্ষুধার্ত শিশুগণ তালভক্ষণ করিবার জন্য

তাল বিক্ষে উঠে সভে কবিতে ভক্ষণ।

বৃক্ষ ঝাঁকাইয়া পাকা তাল মাটিতে ফেলিয়া শিশুগণ সেই তাল খাইতে লাগিল। এমন সময় তালবাগানের অধিকারী কংসরাজার দস্যু প্রহরী আসিয়া তাহাদের বলিল,

এই কাননে তোরা উপনিত হয়া।
লণ্ডভণ্ড কইলে কেনে কিসের লাগিয়া॥

দস্যুপ্রহরী শিশুদিগকে ভয় প্রদর্শন করিলে তাহারা—

তেজিল জিবন রাম কানু মুখ চায়া।
বন মাঝে একাকিনি সব সিযুগণ।
ধরণি মণ্ডলে পড়ি হল্যঅচেতন॥

তখন,

দেখিয়া বালকবধ প্রভু জগৎপতি।
প্রাণদান সভাকারে দেন রমাপতি॥
আনিয়া যমৃত বিষ্টি করাল্য সভায়।
মাএতে ভোজন জল করান তথায়॥

জীবন ফিরিয়া পাইয়া শিশুগণ রামকৃষ্ণের সহিত বৃক্ষতলে বসিল। রামকৃষ্ণ অসুর বধ করিয়া শিশুগণসহ গৃহে ফিরিলেন। দূত গিয়া কংসের নিকট অসুর নিধনের খবর দিল—

ছাড়িল নিশ্বাস ভূপ মনে পায়া বেথা।

এইখানেই কবির কাহিনী সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের ফলভক্ষণ—

এই বিষয়টি লইয়া রচিত বিভিন্ন কবির রচনা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই কাহিনীটি জনপ্রিয় ও সুপ্রচলিত ছিল। বীরভূমের

ইতিহাস প্রণেতা গৌরীহর মিত্র একটি ফলভক্ষণ পালার বিবরণ দিয়াছেন "বীরভূমের ইতিহাস—প্রথম খণ্ডে।" এই কাহিনীটি রতন লাইব্রেরীর (বীরভূম) ১৮৭৪ ও ২২৪৫ সংখ্যক পুঁথির অন্তর্গত। দ্বিজ বলরামের ভণিতা। বিশ্বভারতী—সংগ্রহের ৬৭৫ সংখ্যক পুঁথিও 'কৃষ্ণের ফল ভক্ষণ' লইয়া রচিত। এই পুঁথির লিপিকাল ১২১০ সাল। ১ পত্র, অখণ্ডিত। এই রচনাটিতে গাথাকাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শব্দের পুনরাবৃত্তি সংযোজিত হইয়াছে। এই একই বিষয় লইয়া রচিত আর একটি পুঁথি পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহে (পুঁথিসংখ্যা—৯০১)। এখানে রচয়িতা হিসাবে কবিচন্দ্রের নাম পাই। পুঁথিটি তিন পাতায় সম্পূর্ণ। রচনাকাল ১২৫৪ সাল বলিয়া উল্লিখিত। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আছে। বিভিন্ন পুঁথির অন্তর্গত কাহিনীতে ভাষা ও বিবরণের কিছু পার্থক্য থাকিলেও, কাহিনীটি মোটামুটি এইরূপ—

একদিন গকুল নগরে এক বুড়ি প্রভাতে লইঞা আইল্য ফল এক ঝুড়ি।
বসিল পথের ধারে বসিল পথের ধারে
ডাকে অরে : গকুলবাসি ছেল্যা উশ্চস্বরে : ধনি করে : ফল লাউল্যা বল্যা।

। বিশ্বভারতী : পুঁথি ৬৭৫ ।

ফলওয়ালী—

মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখে পাকা জামের ফল।
ফল কিন্না নেয়রে এস্যা বালক সকল॥
শ্রীদামাদী গোপ সিস্থ স্থনিবারে পায়।
ধান চাল কড়ি লয়্যা অতি বেগে ধায়॥

। বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৯০১ ।

ফল খাইতে খাইতে বলরাম বালকগণের সহিত কৃষ্ণের নিকট গেলে—

জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ কি খাওরে ভাই।
পাকা জামের ফল খাই বলেন বলাই॥

। বিশ্ব : পুঁথি ৯০১ ।

কৃষ্ণ গিয়া মাতা যশোদার নিকট ফল খাইবার আব্দার ধরিলে,

রাণী বলে পেটের সময় এখান হতে জা।
আঙ্গিনায় স্থধায় ধান্য লয়্যা ফল খা॥

কৃষ্ণ ধান্য লইয়া দৌড়াইলে কিছু ধান পথে পড়িয়া গেল। কবি গাহিয়াছেন—

চতুর্বর্গ ফলদাতা ফল খাইতে জায়।
দসমে ব্যাসের ভক্তি কবিচন্দ্রে গায়॥

। বিশ্ব : পুঁথি ৯০১।

ফলওয়ালীর ভাণ্ডে ধান ফেলিয়া দিয়া কৃষ্ণ 'দুটি হাত পাত্যা ফল মাগিতে লাগিল।' দুখিনী ফলওয়ালী গুটি দশ ধানে কি ফল দিবে, অবশেষে—

পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ চিনিতে না পারে।
গুটী বার তের ফল দিল তার করে॥

। বিশ্ব : পুঁথি ৯০১।

ফল খাইয়া আরও সুস্বাদু ফলের আশায় কৃষ্ণ আবার হাত পাতিলে দুখিনী ফলওয়ালী তাহার হাত ঠেলিয়া দিল। তখন—

মুনি চোরা চুরির সন্ধান জানে মুখরায়।
একাঞ্জলি ফল লয়্যা ঘরকে পালায়॥

। বিশ্ব : পুঁথি ৯০১।

এইরূপে ফল নষ্ট হইতে দেখিয়া দুখিনী ফলওয়ালী নন্দালয়ে আর কখনও আসিবে না এই বলিয়া—

মৃত্তিকার ভাণ্ড কাখে কান্দ্যা কান্দ্যা চলে।
দিবারূঢ় হস্থ গেল জমুনার জলে॥

ক্ষুধার্ত হইয়া ফলওয়ালী যমুনার তীরে ভাণ্ড রাখিয়া স্নান করিয়া ক্ষুধা দূর করিল।

অচিন্ত কৃষ্ণের মায়া বুঝা নাই জায়।
দুখিনী হইল জেন উর্বশীর প্রায়॥
মৃত্তিকার ভাণ্ড সে হইল সর্ন্নময়।
ধান্ন কড়ি নানা রতন দেখ্যা পায় ভয়॥

তখন দুখিনী কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া চিনিল, সে বুঝিল যে, তাহার 'ফল কিনে খাইল চক্রপাণী'। সেই নারায়ণের হাত সে ঠেলিয়া দিয়াছে, দুখিনী অনুতপ্ত হইয়া নারায়ণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

আমী পাপী অতি দুরাচার নিচজাতি।
মোর অপরাধ ক্ষেমা কর রোমাপতী॥

অতঃপর গৃহে ফিরিলে বৃদ্ধ স্বামী তাহার নবরূপ দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল না। তখন—

থাক তুমি কোথা কেন আইলে হেথা ভয় পাইয়া বৃদ্ধ ভাষে।
বট কোন জাতি কোথায় বশতি বোনে ভ্রম কেন একা।
নতনজোবন হাড়িয়্যা-ভবন সঙ্গে কেন্নো নাই সখা॥

ফলওয়ালী আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ দিলে, ভক্ত বৃদ্ধ কিরাত পত্নীসহ হরিগুণগান গাহিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণের কৃপায় 'ঘুচিল কিরাতবেশ হইল ধনবান।'

কৃষ্ণকে ফল খাওয়াইয়া এইরূপে দুখিনী ফলওয়ালী স্বামীসহ ধনশালী হইয়া রাজসভায় 'হরিগুণ গায় সদা নানা ভোগ করে'।

রচয়িতা কবিচন্দ্র বলিতেছেন—

এই উপাক্ষণ জেবা এক চিত্তে স্থনে
চতুর্বর্গ ফল পায় অন্তে জোম জিনে।

কবিচন্দ্রের রচনাটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী এবং রচয়িতাও কিছুটা শিক্ষিত তাই উপরোক্ত রচনাটিতে গ্রাম্যকবি রচিত গাথাসুলভ ভাবের বিকাশ কিছু কম। বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুঁথি ও বীরভূমের রতন লাইব্রেরীর পুঁথির শেষাংশে কাহিনীর কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই পার্থক্যের মাধ্যমে রচনাগুলিতে গ্রাম্য লৌকিক ভাব প্রকট হইয়া গাথাসুলভ বৈশিষ্ট্য আনিয়া দিয়াছে। এখানে দেখি কৃষ্ণ ফল খাইতে চাহিলে যশোদা বলিলেন—

ঘরে আসুন নন্দ,
ঘরে আসুন নন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র, ফল আনাব পাড়ি।
কিসের লেগে নীচের ঘরে মজাইবে কড়ি॥
। রতন লাইব্রেরীর পুঁথি।

এই বলিয়া কৃষ্ণ ও গোপশিশুগণকে ধান্য পাহারায় রাখিয়া কলসী লইয়া যশোদা জল আনিতে গেলেন। তখন

ধান্য মেলা ছিল, ধান্য মেলা ছিল
কৃষ্ণ নিল যঞ্চলে জত রয় দেখি প্রিয়সখা শ্রীদাম তাহা :
কৃষ্ণচন্দ্রে কয়।
আসিঞা মারিবে রাণি আসিঞা মারিবে রাণি :
সখার বাণি : তাঃ না যুনলে কানে ফল হারির দুস্থ তারি :
ভঞ্জিবার মনে। । বিশ্বভারতী পুঁথি।

কৃষ্ণ ধান্য লইয়া ফলওয়ালীকে দিলে সব ধান সোনা হইয়া গেল। ডোমনী কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া চিনিল এবং বলিল—

একবার বল মাতা,
একবার বল মাতা, শুনি কথা, এসো নীচের কোলে
নিকটে পেঞাছি বাছা পূর্ব জন্ম ফলে॥
। রতন লাইব্রেরীর পুঁথি।

কৃষ্ণ ভক্তের কোলে উঠিলেন, মা বলিলেন। ফল খাইয়া কৃষ্ণ ঘরে ফিরিলেন। মা যশোদা গৃহে ফিরিয়া ধান কম দেখিয়া কারণ জানিতে চাহিলে সাধারণ ছেলের মত কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিলেন। অতঃপর শ্রীদামের মুখে যখন যশোমতী সমস্ত শুনিলেন, তখন তিনি ক্রোধে দিশাহারা হইলেন। কৃষ্ণ শুধু চুরিই করে নাই, নীচ জাতিকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, তাহার কোলে চাপিয়াছে। যশোদা তাহাকে প্রহার করিলে কৃষ্ণ বাহির হইয়া গেলেন। এদিকে চারিদণ্ড বেলা, কৃষ্ণ ফেরে না। তখন স্নেহময়ী জননীর হৃদয় পুত্রবিরহে আকুল হইয়া উঠিল। শ্রীদামকে পাঠাইয়া কৃষ্ণকে আনিয়া যশোদার মাতৃহৃদয় শান্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা-ভক্ষণ—

গৌরীহর মিত্র সম্পাদিত 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের 'মৃত্তিকা-ভক্ষণ' বিষয়ক একটি গাথার বিবরণ পাই। এই গাথাটি ১২১২ সালে রচিত। (রতন লাইব্রেরীর পুঁথি সংখ্যা ১০১৮)।

রচনাটিতে বালক শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ ও যশোমতীকে আপন মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

একদিন শিশু সঙ্গে শ্রীনন্দ নন্দন।
খেলাবশে কৈল প্রভু মৃত্তিকা ভক্ষণ॥

একটি শিশু গিয়া যশোদাকে এই সংবাদ জানাইলে, আকুলহৃদয়ে দৌড়াইয়া কৃষ্ণের নিকট গিয়া—

হারে হোরে বলিঞা যশোদা ধৈল হাতে।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কর কেনে, কিছু পাওনা খেতে॥

এইরূপে যশোদা অনুযোগ করিতে থাকিলে, কৃষ্ণ বলিলেন—

মিছা-মিছি করিঞা বলঞ শিশুগণ।
মৃত্তিকা নাহি খাই গালি দেহ অকারণ॥

শুন গো মা যশোমতী করি নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে দেখ মিলিব বদন॥

এই বলিয়া—

মায়া করি মুখ যে মিলিএ চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী॥

নন্দরাণী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে কৃষ্ণের মধ্যে দেখিতে পাইলেন।

রামের গান—

রামায়ণের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাখ্যান লইয়াও গ্রাম্যকবিগণ ছোট বড় গাথাকাব্য রচনা করিতেন। ইহার মধ্যে দশরথ রাজা-কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুবধ, রামের জন্মকথা, রামকর্তৃক তাড়কারাক্ষসী বধ, অহল্যাউদ্ধার, রাম ও সীতার বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ ইত্যাদি কাহিনী লইয়া গ্রাম্যকবি রচিত একাধিক গাথা সংগৃহীত হইয়াছে। গুরুসদয় দত্ত তাঁহার 'পটুয়াসঙ্গীত' গ্রন্থে রামায়ণ কাহিনী লইয়া রচিত ছয়টি গাথার পরিচয় দিয়াছেন। পটুয়াগণ গ্রাম্যকবিরচিত এই সকল গাথা গাহিয়া তদনুযায়ী পট প্রদর্শন করিয়া গ্রামে গ্রামে উপার্জন করিয়া বেড়াইত। এইসকল গানের অন্তর্গত কাহিনীর সহিত রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীর বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। গ্রাম্যভাষায় গীতচ্ছন্দে রচিত এইসকল গাথাকাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মৈমনসিংহের মহিলাকবি চন্দ্রাবতীও রামায়ণ কাহিনী লইয়া এইরূপ একটি গাথা রচনা করিয়াছিলেন। এই রচনায় গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বিবিধ কিংবদন্তী স্থান পাইয়াছে। এই কারণে মূল রামায়ণের কাহিনীর সহিত চন্দ্রাবতীর রচনায় অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ মৈমনসিংহে সুপ্রচলিত ছিল। এই রামায়ণের ভাষা যেমন সহজ তেমনি সুন্দর। প্রতি পংক্তিতে একটি করিয়া 'গো' শব্দ লাগাইয়া গানের ছন্দ আনা হইয়াছে। অকালে পরলোক গমন করায় চন্দ্রাবতীর রচনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তিব্বত, মালয়, কাশ্মীর, জাভা, প্রভৃতি স্থানে সীতার জন্ম সম্বন্ধে যেসব প্রবাদ প্রচলিত আছে, চন্দ্রাবতী সেই সকল কথাই আপন রচনায় সংযোগ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতী বর্ণিত কুকুয়া চরিত্রটি কাশ্মীরী, মালয়, জাভা, কম্বোজ, এবং তিব্বতী রামায়ণেও পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল প্রবাদ লোকমুখে প্রচলিত হইতে হইতে মৈমনসিংহ অঞ্চলেও

প্রচার লাভ করে এবং সেই লৌকিক প্রবাদসমূহই চন্দ্রাবতীর রামায়ণে প্রবিষ্ট হইয়া রচনাটিকে গ্রাম্যগাথার বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।

দশরথ রাজাকর্তৃক সিন্ধুবধের বিষয় লইয়া রচিত একাধিক গাথার অন্তর্গত যে গীতিমূলক কাহিনীটি পাই তাহার কিছু বিবরণ দিতেছি—

রাজা দশরথ রথে চড়িয়া স্বর্গপথে গগনমণ্ডলে যাইতেছিলেন, এমন সময় জটায়ুপক্ষী তাঁহার রথ টানিয়া ভূমিতলে নামাইল। তখন রাজা দশরথ "নিজের গলার পুষ্পমালা খুলে জটাইর গলে দিল" এবং রাজা দশরথ ও জটায়ুপক্ষীর মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইল। রাজা রথখানি শালবৃক্ষের তলে বাঁধিয়া রাখিয়া বনের ভিতর মৃগয়া করিতে গেলেন।

এদিকে সেই বনে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতি একাদশীর ব্রত উপলক্ষ্যে পুত্র সিন্ধুক মুনিকে জল আনিতে বলিলেন, পুত্র উত্তর করিল—

(এই যে) আমি নিত্য আসি নিত্য যাই সরোবরের ঘাটে,
আজতো যাবনা পিতা, আমার প্রাণ কেঁদে উঠে।
(ওগো) ধর্ম করে মরে যদি পাণ্ডবের নন্দন
(ওগো) তবে লোকে ধর্ম করে কিসেরি কারণ।

এখানে পাণ্ডবদের উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে, এই সব অশিক্ষিত গ্রাম্য রচয়িতা বা গায়েনগণ রামায়ণ মহাভারতের সময়কাল সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। রামায়ণে ত্রেতা ও মহাভারতে দ্বাপরের ঘটনা বর্ণিত; সুতরাং রামায়ণের কাহিনী বর্ণনায় রামায়ণের অন্তর্গত কোনও চরিত্রের মুখে মহাভারতের অন্তর্গত চরিত্রের নামোল্লেখ সম্ভব নহে।

অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সিন্ধুক মুনি সরোবরের ঘাটে জল আনিতে গেল। ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কাই সিন্ধুক মুনির মন চঞ্চল করিয়াছিল গ্রাম্যকবি তাহাই বলিতে চান। মুনির জল ভরার শব্দ শুনিয়া দশরথ রাজা মৃগ মনে করিয়া বাণ মারিলেন। বাণ খাইয়া কাতর সিন্ধুক মুনি বলিল—

ওরে কে মেলিরে ব্রহ্মাস্ত্র বাণ আমার অঙ্গ গেল জ্বলে
(এই যে) পিতা মাতা কান্দে দুইজন দেখ বনেরি ভিতরে।
(এই যে) অমৃত নয় জল দাও গো যাব পিতারি নিকটে।
(এই যে) বাণে কাতর হয়ে সিন্ধুক মুনি পড়ে গেল যমুনারি জলে।

আপন কৃতকর্মে অনুতপ্ত রাজা ঘোড়া হইতে নামিয়া মরা সিন্ধুককে কোলে করিয়া বনে বনে তাহার মাতা-পিতার সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন।

সিন্ধুক মুনির মাতা পিতার বর্ণনাটি গ্রাম্যকবির রচনার গুণে হৃদয়গ্রাহী। অন্ধ পিতা-মাতা অধীর আগ্রহে পুত্রের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া আছেন—তাই দশরথের পদশব্দে আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন—

ওরে সিন্ধুক এলি না কে এলি বাপ আয়রে করি কোলে।

রাজা বলিলেন—

ওগো তোমার সিন্ধুক নয় গো মনি নামে দশরথ
আমি না জানাতে বধ করেছি তোমারি নন্দন।

তখন মুনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন—

কি কথা শুনাইলি রাজা তোর কি বেরোইল মুখে
(এই যে) বজ্রাঘাত হইল দেখ যেন দ্বিজ অন্ধক মুনির বুকে।
এই যে পুত্র যদি আছে রাজা তু নিপুত্রিকা হবি
আর পুত্র যদি না আছে রাজার তু পুত্তুর বর পেলি।

পুত্রের শোকে মুনি, মুনিপত্নী উভয়েই প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদের তিনজনের দাহকার্য সম্পাদন করিয়া অযোধ্যায় ফিরিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ পুত্রবর লাভ করিলেন।

পীরমাহাত্ম্য গাথা—

পীরসাহেব মুসলমানের পূজ্য দেবতা। এই পীর সাহেবের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রাম্যকবিগণ বিভিন্ন ছোট-বড় কল্পিত কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রোতাই সমভাবে এই সব কাহিনীর রসাস্বাদন করিতেন।

এইরূপ একটি রচনার নাম 'মাণিকপীরের গীত'। রচয়িতা 'আজিমাবাদ ধানশিয্যা' নিবাসী ফকীর মহাম্মদ, পিতার নাম রহিম, পুঁথি পশ্চিমবঙ্গের কোন হিন্দুর লেখা। রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। কালক্রমে কোন হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পীর-পীরানীর মাহাত্ম্য-কাহিনীতে পরিণত করিবার চেষ্টা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে। এই সময় হইতে হিন্দুপূজিত একাধিক দেবদেবীর প্রতিরূপ মুসলমান জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও

প্রতিষ্ঠিত হইতে শুরু হয়। ফকীর মোহাম্মদের মাণিক-পীরের গীতের অন্তর্গত মাণিক-পীর সময় সময় হিন্দু দেবতা শিবেরই প্রতিরূপ। মৎস্যেন্দ্রনাথের ইসলামী প্রতিরূপ পীর মছলন্দি। হিন্দুগণের দেবী মঙ্গলচণ্ডী (বা বনদুর্গা) হইলেন মুসলমানগণের বন-বিবি। হিন্দুধর্মের পূজাবিধিতে সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ অন্যতম প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এই পাঁচালীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি অর্বাচীন পৌরাণিক সাহিত্যেও ঢুকিয়াছে। কালক্রমে এই সমস্ত কাহিনীই রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন পীরমাহাত্ম্য গাথারূপে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে এবং সত্যনারায়ণের নূতন নামকরণ হয় সত্যপীর। কোথাও কোথাও পীর হইয়াছেন হিন্দু দেবতার প্রতিপক্ষ। যেমন সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের প্রতিপক্ষ বড়-খাঁ গাজী। এই বড়-খাঁ গাজী বঙ্গের পাঁচ পীরের অন্যতম। "নিম্নবঙ্গে গাজীর কথা শুনে নাই, এমন লোক পাওয়া যায় না। রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে গাজীকালুর নামও একসঙ্গে গ্রথিত। যশোহর-খুলনার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'মনসার ভাসান' যেমন প্রচলিত 'গাজীর গীত'ও তেমনি। এক সময়ে এদেশে গাজীর গীত এত প্রচলিত ছিল, এবং ইহার একই কথা লোকে শুনিতে শুনিতে এমন বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, 'গাজীর গীতের আলাপ' বলিলে, যে কথা লোকে শুনিয়া শুনিয়া আর শুনিতে চাহে না, এমন কথা বুঝায়। গাজীর নামে এই দুই জেলায় কত গ্রামের নাম আছে, গাজীর হাট, গাজীর ঘাট, গাজীপুরের অভাব নাই। লোকে কোনকার্যে বলপ্রয়োগ করিবার সময় গাজীর নাম স্মরণ করে। তবে গাজীর নাম সর্বাপেক্ষা অধিক স্মরণ করে নৌকার দাঁড়ি-মাঝিরা। এই নদীমাতৃক দেশে গাজীসাহেব নাবিকদিগের আরাধ্য দেবতা হইয়া রহিয়াছেন।"

পূর্ববঙ্গে যে গাজীর গীত প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর পাঁচ পীরের কথা পাই (শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা)। সুবর্ণ গ্রামে এই পাঁচপীরের নামে একস্থানে পাঁচটি দরগা বা মন্দির আছে। শ্রীহট্ট শহরে উহাদের কবরস্থান "পাঁচপীরের মোকাম" বলিয়া পরিচিত। (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪৭ পৃঃ)। আবার পাঁচপীর যে শুধু বঙ্গেই আছে, তাহা নহে। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে পাঁচপীর আছে এবং স্বতন্ত্র লোক লইয়া সে সব স্থানে পাঁচ পীর হইয়াছে। বঙ্গের পাঁচপীর—

গায়সউদ্দীন, সামসুদ্দীন, সেকন্দর, গাজী ও কালু। কিন্তু গাজীর গীতে ইহাদের সহিত যে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে, তাহার সহিত ইতিহাস মিলে না।

মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রে বলে, যিনিই বিধর্মীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া স্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই গাজী। গাজীগণ ইসলামধর্ম প্রচারোদ্দেশে বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাফর খাঁ গাজী ত্রিবেণীতে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্মাণ করেন।

এই গাজীসম্প্রদায় সকলেই হাতিয়াগড় অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যশোহর, খুলনার ভিতর প্রবেশ করিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছেন।" (যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড—সতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ.) বড়-খাঁ গাজী পীরের মাহাত্ম্য-সূচক বিবিধ গাথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। এইরূপ একটি গাথার খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। গাথাটি 'মদনের গান' বা 'মদন পালা' বলিয়া বর্ণিত। পুঁথি খণ্ডিত এবং রচয়িতার নামহীন (সাহিত্য পরিষদ, পুঁথিসংখ্যা ৯৩৪)। 'শ্রীশ্রীখোদায়' বলিয়া শুরু দেখিয়া রচয়িতা মুসলমান বলিয়া মনে হয়। ঢাকার নবাব শায়িস্তা খাঁ কর্তৃক দ্বাদশ ভৌমিকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ, রাজস্ব বাকী পড়ায় রাজপুরের ভূম্যধিকারী মদন রায়কে আহ্বান এবং মদন রায় কর্তৃক মবারক গাজী পীরের শরণ গ্রহণ ও গাজী পীরের কৃপায় উদ্ধারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। পীরের মাহাত্ম্য কীর্তনই রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। কোন কোন দেবতা দুই সম্প্রদায়ের ভাগে সমানভাবে পড়িয়াছেন। যেমন হিন্দুর কুম্ভীর দেবতা কালুরায় ও মুসলমানের মগর-পীর কালু শাহ। কখনও কখনও হিন্দুর দেবতা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান পীর হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নাম বদলায় নাই। যেমন, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণা জেলায় পীর গোরাচাঁদ।

সত্যপীরের মাহাত্ম্য লইয়া রচিত বিভিন্ন সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। মদনসুন্দর, লালমোন, মালঞ্চ, মনোহর ফাসিয়ারা ইত্যাদি লইয়া রচিত যে সমস্ত সত্যপীর কাহিনীর পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি কাহিনীই সত্যনারায়ণ পাঁচালীর অন্তর্গত। "এই সত্যপীর সাহিত্য (মুসলমান প্রধান অঞ্চলে 'পীর' এবং হিন্দু প্রধান অঞ্চলে 'নারায়ণ') সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া আছে। অন্ততঃ ওড়িষ্যায় প্রভূত পরিমাণে আছে এবং ওড়িষ্যার বেশীর ভাগ রচনাই বাঙ্গালী কবির নামাঙ্কিত।...বিদ্যাভবনের ওড়িয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জ-

বিহারী দাস মহাশয় মনে করেন ওড়িয়ায় সত্যপীরের ধারা বাঙ্গলাদেশ হইতে গিয়াছে।" (পুঁথি পরিচয়, ১ম খণ্ড—পঞ্চানন মণ্ডল)।

বাংলাদেশের পীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনীগুলি এইরূপে বাংলার বাহিরে প্রচার লাভ করিয়াছে। বাঙালীরা এখন এই সকল কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে ভিন্ন অক্ষরের অন্তরালে এই সকল কাহিনী আত্মগোপন করিয়া আছে।

পীরমাহাত্ম্য গাথাগুলিকে সার্থক গাথাকাব্য আখ্যা দেওয়া যায় না। এইগুলিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আমরা যেরূপে পাই, তাহার ভিতর হিন্দুবিদ্বেষ প্রকটতা লাভ করে। এই সময়ের রচনাগুলি কেচ্ছাগাথার রূপ গ্রহণ করে। ত্রিবেণীর কাছে যে পাণ্ডুয়া আছে—সেই স্থান শাহা-সুফীর আস্তানা বলিয়া বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এই শাহা-সুফীকেই পীর আখ্যা দিয়া মুসলমান কবি পাণ্ডুয়া অঞ্চলে কি করিয়া মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল সে সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া কেচ্ছা গাথা রচনা করিয়াছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য প্রচার করিবার জন্য এইরূপে বিভিন্ন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের উপর পীরমাহাত্ম্য আরোপ করিয়া কেচ্ছাগাথা রচনা করিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে। এইরূপ একটি রচনার নাম হইল 'গাজী সাহেবের গান'। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সমসের গাজীর জীবনী লইয়া ইহা রচিত। সমসের গাজি আলিবর্দী খাঁর সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ১৭৫২ খৃঃ শত্রুহস্তে ইহার মৃত্যু ঘটে। ডঃ দীনেশ সেন বলিয়াছেন যে, 'গাজীর গান' রচয়িতা গাজীর সমসাময়িক ব্যক্তি। কিন্তু রচনাটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত। এই গাথাটিতে ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত যুদ্ধে গাজীর জয়লাভ হইতে আরম্ভ করিয়া গাজীর বিবিধ মাহাত্ম্যকাহিনীর মধ্য দিয়া গাজীর মৃত্যু পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুর দেবীই মুসলমান গাজীকে হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আদেশ দিলেন এবং দেবীর কৃপায় গাজী জয়লাভ করিলেন। এইরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বিবিধ পীর ও গাজীমাহাত্ম্য গাথাগুলি জনসাধারণের মনে মুসলমান ধর্মপ্রীতি জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল।

'সত্যপীর মাহাত্ম্য' কাহিনী লইয়া যে সমস্ত গাথা বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বিষ্ণু শর্মার কাহিনীই সংখ্যায় অধিক। বিষ্ণু শর্মা নামে এক

দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সত্যপীরের সিন্নি দিয়া কি করিয়া দারিদ্র্যমুক্ত হইল তাহা লইয়া এই কাহিনী রচিত। ফকীর মহম্মদ রচিত 'মাণিকপীরের গীত' এ মাণিক পীর কর্তৃক দরিদ্র রাখাল বালক দুখের দুঃখমোচন বর্ণিত হইয়াছে। দুখে জঙ্গলের ধারে মাণিক পীরের সোনার খড়ম দেখিয়া তাহা লুকাইয়া রাখে ও এই খড়মের পরিবর্তে একে একে পীরের নিকট হইতে রাজকন্যা রাজ্য এবং ধন দৌলত আদায় করিয়া নেয়। ইহাই কাহিনীর বক্তব্য। বনবিবির মাহাত্ম্য গাথা লিখিয়াছিলেন অন্ততঃ দুইজন কবি, বয়নুদ্দীন ও মোহাম্মদ খাতের। আব্দুল গফুরের 'গাজী সাহেবের গান' বা 'কালু-গাজী-চন্দাবতী' ও পীরমাহাত্ম্য লইয়া রচিত। এই সবগুলিই রূপকথার অনুকরণে রচিত।

"পুঁথি পরিচয় ২য় খণ্ডে" শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল কতকগুলি পীরের গীতের বিবরণ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটিতে (পুঁথি সংখ্যা ৯৯৪) দেখা যায় পীর ও গোবিন্দ এক ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

এইরূপে প্রথমে হিন্দু ও মুসলমান দেবতার সংমিশ্রণ করিয়া গ্রাম্য কবিগণ বিবিধ পীরমাহাত্ম্য গাথা রচনা করেন এবং কালক্রমে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের স্পর্শে পরবর্তী পীরমাহাত্ম্য রচনাগুলির মাধ্যমে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচারিত হইয়া থাকে।

বিবিধ—

প্রচলিত স্থানীয় দেবীমাহাত্ম্য কাহিনী লইয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত কতকগুলি গাথা পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই ধরনের রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত হইয়াছিল 'যোগাদ্যার বন্দনা'। এই কাহিনী লইয়া রচিত বিভিন্ন কবির রচনা পাওয়া গিয়াছে। একই কবির ভণিতায় একাধিক রচনা, আবার অজ্ঞাত ভণিতার রচনাও সংগৃহীত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসংখ্যা ১,৪০৩, ১৫৫৬, ১৫৮৬, ১৫৯৩, ১৬০৭, ১৬৭২, ১৮৭৪, ২০৫১, ২১১৪, ২০৯৩, ৩৬৮৪, ৫২০৫, ৫৬১৪, প্রভৃতি বিভিন্ন সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রচনায় কৃত্তিবাস, দৈবকীনন্দন, পরমানন্দ দাস, দ্বিজ দয়ারাম প্রভৃতির ভণিতা পাই। অজ্ঞাত ভণিতার রচনাও আছে। প্রত্যেকটি রচনাই উনবিংশ শতাব্দীর। বর্ধমান সাহিত্য সভার পুঁথি ৯৩, ৯৪ ; গভর্ণমেন্ট এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৫৩৭২ (লিপিকাল ১২২১), ৫৩৭৬ (লিপিকাল ১২৫০), বিশ্বভারতী পুঁথি সংগ্রহের পুঁথি ৪০৩ (দ্বিজ বাঞ্ছারাম), ৪১ (ভণিতাহীন, খণ্ডিত, ১২১১

সাল), ৭৪ (খণ্ডিত—অজ্ঞাত কবি) এবং বাংলা প্রাচীন পুঁথি বিবরণীতে উদ্ধৃত 'কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ পরিধান' প্রভৃতি সমুদয় রচনাই 'যোগাদ্যার কাহিনী' লইয়া রচিত। রচনা সংখ্যা হইতেই গাথাটির সুপ্রচলন সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বিভিন্ন রচনার অন্তর্গত কাহিনীতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও কাহিনীর কাঠামো মোটামুটি এক। ক্ষীরগ্রাম, বিক্রমপুর এবং রাজবলহাট, বিভিন্ন রচনায় এই বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লিখিত হইলেও, ঘটনাটি রাঢ়েরই কোনও স্থানে ঘটিয়াছিল এবং অধিকাংশ রচনায় ক্ষীরগ্রামের উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে, ক্ষীরগ্রামেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কালক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে ইহা কিংবদন্তীর আকার ধারণ করিয়াছিল। তবে রচনাটি যে বহুল প্রচারিত একটি ধর্মাশ্রিত গাথা এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাহিনীটি মোটামুটি এইরূপ—

হনুমান কর্তৃক মহীরাবণের ঘর হইতে দেবী দশভুজাকে আনয়নের বিবরণ দিয়া কাহিনীটি আরম্ভ হইয়াছে। রাম এই মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন এবং

সিদ্ধিপিট মহামায়া করিয়া স্থাপন।
রাবণ বধিতে লঙ্কা গেলা নারায়ণ। ধুয়া

(বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৩৬৮৪)

এইরূপে মহামায়া ক্ষীরগ্রামে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

হরিদত্ত রাজা ঘুমাইতেছিলেন। তাঁহার শিয়রে বসিয়া দেবী তাঁহাকে স্বপ্ন দিলেন।

কত নিদ্রা যায় পুত্র হয়্যা অচেতন।
কৈলাষ তেজিয়া আইলাম তোমার কারণ।
তোমারে প্রসন্ন আমি হইলাম দেবি ভদ্রকালি।
মোর পূজা কর রাজা দিয়া নরবলি।

রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি 'দেখিলেন সিয়রে বসি জগতের মা'। দেবী আপন পূজাপদ্ধতি রাজাকে বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। রাজা বিবিধ প্রকারে দেবীর পূজা করিলেন। এমন কি—

'আপনার পুত্র কাটি দিল বলিদান।'

এইরূপে রাজা হরিদত্ত,

সাত দিন কৈল পূজা দিয়া সাত বালা।
অবসেসে খিরগ্রামে করে দিল পালা॥

সকলের পালা শেষ হইলে একদিন পূজারী ব্রাহ্মণের পালা পড়িল। কিন্তু—

এক পুত্র বিনে তার দিতিয় পুত্র নাই।
কি দিয়া করিব পূজা অভয়ার ঠাই॥

তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্র লইয়া রাত্রিবেলা ক্ষীরগ্রাম ছাড়িয়া চলিলেন। পথে যোগাদ্যা ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়া আপন দশভূজা মূর্তি দেখাইলেন। তখন—

প্রণমিয়া কন দ্বিজ দেবি বিদ্যমান।
সহস্তে আমার মাথা কর বলিদান॥

কিন্তু যোগাদ্যা ব্রাহ্মণের উপর দয়ার্দ্রা হইয়া নিয়ম করিলেন—

দেস দেশান্ত হইতে যে লোক আসিব।
বৎসর অন্তরে তাহাতে বলিদান লব॥

এই বলিয়া দেবী মন্দিরে গিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা হইলেন। ব্রাহ্মণ আপন গৃহে ফিরিলেন। ইহার পর—

একদিন মহামায়া বটবৃক্ষতটে।
স্নান হেতু বস্তেছিলেন ধামাসার ঘাটে॥

তখন এক শাঁখারি সেই পথে শাঁখা লইয়া যাইতেছিল। মহামায়া তাঁহার নিকট পূজারী ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া শাঁখা পরিলেন এবং বলিয়া দিলেন শংখের মূল্য পাঁচ তঙ্কা ব্রাহ্মণের ঘরের কুলুঙ্গীতে আছে। শাঁখারি শাঁখা পরাইতে গিয়া হাতে পদ্মচিহ্ন দেখিয়া কাতর হইয়া বলিল, 'কপট তেজিয়া মাতা দেহ পরিচয়'। এইখানে ভগবতী শাঁখারিকে যেভাবে আপন পরিচয় দিতেছেন তাহা পাঠ করিলে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত ভবানীর আত্মপরিচয় দানের বিবরণ মনে পড়ে। ভগবতী দ্ব্যর্থবোধকরূপে আপন পরিচয় দিলেন, কিন্তু—

ভবানির মায়ায় বেন্যা নারেন বুঝিতে।
হাতে তৈল্য দিয়া শংখ লাগিল পরাতে॥
ব্রাহ্মণাদি যেই পদ ধ্যানে নাহি পায়।
হাথে ধরি সংখ বেন্যা পরাইল তায়॥

শাঁখা পরাইয়া শাঁখারি টাকা আনিতে ব্রাহ্মণের ঘরে গেল। সমস্ত শুনিয়া ও গম্ভিরের ভিতর পাঁচ তঙ্কা দেখিয়া ব্রাহ্মণ সকলই বুঝিতে পারিলেন। তিনি শাঁখারিকে বলিলেন, 'এত কাল সেবা করিয়াও আমি তাঁহার দেখা পাইলাম

না, তুমি তাঁহাকে কোথায় শাঁখা পরাইলে'। সকল কথা অবগত হইয়া শাঁখারি আছাড় মারিয়া পাঁচ টাকা ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া ধামাসার ঘাটে চলিল। ব্রাহ্মণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে—

দ্বিজের স্তবনে দেবি হরসিত হইলা।
জল হইতে দুটি বাহু শঙ্খ দেখাইলা॥

আর শাঁখারি তখন হইতে প্রতিজ্ঞা করিল যে যতকাল সে বাঁচিবে বৎসরে বৎসরে দেবীর দুই বাহুর জন্য শঙ্খ যোগাইবে।

কিৰ্ত্তীবাশ পণ্ডীত করিয়া বিচক্ষণ।
জোগাধ্যার বন্দনা সাঙ্গ হরিবল বন্ধুজন।

উপরোক্ত কাহিনীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংখ্যা ৩৬৮৪এর অন্তর্গত। ইহার রচয়িতা কীর্তিবাস পণ্ডিত। ১২২৪ সালে লিপিবদ্ধ। 'যোগাদ্যার বন্দনা' বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইলেও কৃত্তিবাসের ভণিতাই সর্বাধিক লক্ষিত হয়। এ কৃত্তিবাস অনেক পরবর্তী কালের লোক।

পঞ্চম অধ্যায়

নীতিকথাশ্রিত গাথা

পাশ্চাত্ত্য সমালোচক টি. এফ. হ্যাণ্ডারসন বলিয়াছেন, 'গাথা কবিতাগুলি নীতি উপদেশে ভারাক্রান্ত হয় না।' পাশ্চাত্ত্য গাথা (ballad) সম্বন্ধে এই মতবাদ যথার্থ হইলেও বাংলা গাথা সম্পর্কে উহা সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়। পূর্বালোচিত প্রণয় ও ধর্মাশ্রিত গাথাগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ সমস্ত গাথার প্রায় প্রত্যেকটি হইতেই আমরা কিছু না-কিছু নীতি অথবা অধ্যাত্ম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। ঐ সকল নীতিবাক্যের প্রকাশ গাথাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য না হইলেও, গাথাশ্রবণান্তে শ্রোতার অন্তরে কাহিনীর অন্তর্গত প্রচ্ছন্ন নীতিমূলক উপদেশগুলি সহজেই প্রবিষ্ট হইয়া নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। অবশ্য বিশুদ্ধ নীতিকথাশ্রিত বাংলা গাথার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত এইরূপ যে কয়েকটি গাথা পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ের মূল উদ্দেশ্যই হইল শ্রোতাগণকে কোনও নীতিগত শিক্ষা বা উপদেশ প্রদান করা।

প্রাচীন বাংলায় প্রসিদ্ধ রাজাগণকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ কিংবদন্তী জনসমাজে প্রচারলাভ করিত। পরবর্তী কালের গ্রাম্য কবিগণ ঐ সকল কিংবদন্তীর উপর রং ফলাইয়া ছোট-বড় নানা আকারের নীতিমূলক পল্লীগাথা রচনা করিতেন। ঐ সকল পল্লীগাথার মাধ্যমে জনসাধারণের ভিতর বিভিন্ন নীতি-উপদেশ প্রচারিত হইত। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য বহুদিন ধরিয়া জনসাধারণের মনে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ রাজা ও তাঁহার সভার নবরত্নকে লইয়া পরবর্তী কালে অনেক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং গীতকাহিনীরূপে দেশে বিদেশে ঐ সকল গল্প সুপ্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপ রাজা ও রাজকাহিনী লইয়া রচিত একাধিক নীতিগাথা লোকমুখে প্রচারিত হইতে হইতে পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক সত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্ধশিক্ষিত পল্লীগায়েনগণ প্রাচীন গাথাগুলির পরিবর্তিত রূপগুলিকে লিপিবদ্ধ করিবার সময় আপন আপন পাণ্ডিত্য অনুসারে উহাদের ভিতর ছোট, বড, শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ নানাবিধ সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়া গাথাগুলিকে মার্জিত রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার ফলে শুদ্ধ, অশুদ্ধ এবং গ্রাম্য ভাষার সংমিশ্রণে গাথাগুলির মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য কালক্রমে লোপ পাইতে থাকে এবং অবশেষে তাহারা গাথাকাব্যের আকৃতি পরিত্যাগ করিয়া

ছোট ছোট নীতিগল্পের আকারে দেশে, বিদেশে প্রচার লাভ করিতে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি গ্রন্থেও এই সকল লোকগাথা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ কয়েকটি নীতিগাথার পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক বাংলাদেশের বিভিন্ন পাঠাগারে এখনও রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৬০, ৫৯২১, ১৬৪১ সংখ্যক পুঁথি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২১২৮ সংখ্যক পুঁথি এবং কতকগুলি মুদ্রিত পুস্তক হইতে আমরা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল-এর (৪র্থ হইতে ৫শ শতাব্দী) বিষয় বলিয়া বর্ণিত 'সসেমিরা', 'রাক্ষসীর সমস্যা', 'তোতাকাহিনী', ইত্যাদি এবং হিতোপদেশের অনুকরণে রচিত তুতিনামা (তোতা ইতিহাস), শুকসপ্ততী, প্রভৃতি নীতিকথাশ্রিত গাথাকাহিনীর পরিচয় পাই।

কয়েকটি বহুল প্রচারিত বিশুদ্ধ নীতিকথাশ্রিত গাথার পরিচয় এখানে দিতেছি।

গোপালন —

এই বিষয় লইয়া রচিত কতকগুলি ছোট-বড় গাথার বিবরণ পাই গুরুসদয় দত্তর 'পটুয়া সঙ্গীত' নামক পুস্তকে। রচনায় পার্থক্য থাকিলেও মূল কাহিনী এক। বাংলাদেশে গরু ভগবতীরূপে পূজা পাইয়া থাকে। বাংলাদেশের পটুয়াগণ গরু পালনের নিয়ম, প্রণালী, গোপালনের পুণ্য, গরুর প্রতি অযত্ন দেখাইলে তাহার জন্য কিরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হয়, এই সব বিষয় লইয়া নানাপ্রকারের গান বাঁধিত ও গ্রামে গ্রামে সেইগুলি গাহিয়া বেড়াইত। এই সব গানের মধ্যে ছোট একটি নীতিগল্পের আকারে গৃহস্থ বধূ ও তাহার গরুর পালন সম্বন্ধে একটি গাথা পাওয়া যায়।

এই সকল গানের আরম্ভে গায়েন গোপালন সম্বন্ধে প্রথমে কতকগুলি উপদেশ দিয়া নেয়। তারপর একটি গল্পের মাধ্যমে দেখাইতে চেষ্টা করে যে, এই উপদেশগুলি না মানিলে উপদেশ অমান্যকারীকে কি পরিমাণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কাহিনীটি এইরূপ—

গৃহস্থ ঘরের গৃহিণী নীলবতী তাহার সাতপুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিল, 'গরু বাছুরের সেবা কর মা তোমরা নিত্যি নিত্যি।' এই কথা বলিয়া শাশুড়ী—

সাতদিন সাত বউয়ের পালি বেটে দিল
প্রথম গোয়ালকাড়া বড় বউটির হল।

শাশুড়ী বলিল,—

প্রথম বড় বউ কুলেরি নন্দন
তোমা হতে হবে মা গরুরি পালন।
গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
তার সেবা করেছেন প্রভু নারায়ণ।

এমন কি স্বয়ং নারায়ণও গোসেবানুরাগী (কৃষ্ণ ব্রজের ধেনু চরাইতেন, কৃষ্ণ নারায়ণের অবতার) এই কথা বলিয়া পুত্রবধূকে উপদেশটি সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবহিত করা হইতেছে।

এখন পালা তো ভাগ হইল, কিন্তু গোয়ালকাড়ার নাম শুনিলে সাত বধূরই গায়ে জ্বর আসে। গায়েন গাহিতেছে—

ছোট বউ ছিল মা আলার ঘরে দুলো।
গোয়াল কাড়িবার নাম শুনিলে বউ গায়ে মাখে ধূলো।
নবউটী ছিল মা তাহার নাম নিত্য
গোয়াল কাড়িবার নাম শুনিলে তাহার নিত্য মাথা ধরত।
আর একটি বউ ছিল নামে চন্দ্রকলা
গোয়াল কাড়িতে যায় বৌ ঠিক দুপুরবেলা।
মধ্যম বউ বলে দিদি জ্বালার উপর জ্বালা
ভেবে গুণে দেখ গা ফুল বউটীর পালা।

এইরূপে গোসেবার নামে সকল বধূই ভীতা। বড় বধূর পালা পড়িলে নানা আভরণে সাজিয়া গুজিয়া—

রম ঝম করে বউ গোয়ালে দিছে পা
খিঁচ গোবর দেখে বউ কপালে মারে ঘা।

বড় বউ আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে—

মর মর মুনিশ খাটার ঘরে বিয়ে হত।
আত্র দিন খাটিতাম তারা গরু কোথা পেতো।
সাধের শংখতে যদি গোবর লাগাব
ঘরে যেয়ে বাড়া ভাত কেমনে খাইব।

ক্রোধের মাথায় শাশুড়ীর সকল উপদেশ ভুলিয়া,

সুবুদ্ধির বিটী তাকে কুবুদ্ধি দ্ব রল

তুলিয়া ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।

এইভাবে মার খাইয়া গাভী ঘরের বাহির হইয়া চলিল। গরু বিদায় হইল আর গোয়াল কাড়িতে হইবে না এই আনন্দে 'শন্তো গোয়ালে বউ নাচিতে লাগিল'।

এদিকে নীলবতী দধি দুগ্ধ বেচিয়া ঘরে ফিরিতেই ভগবতী গিয়া তাহার নিকট বিদায় চাহিল। গরু ভগবতী, গরু ঘরের লক্ষ্মী, সে বিদায় মাগিতেছে—শুনিয়াই তো নীলবতীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ভগবতীর নিকট সমস্তই জানিতে পারিল। তখন শ্বশ্রূহস্তে বধূগণের যে শাস্তি হইল তাহা অতি ভয়াবহ—

নাপিত ডাকিয়ে বউদের কেশ মুড়াইল।

পেটের ভুঁটী কেটে সার কুঁড়ে পু'তল।

গায়ের রক্ত কেটে আলিপন দিল।

ব্যতের জিহ্ব লয়ে কলার পাতে থুল।

অবশেষে—

মাথার খুলি নিয়ে ধুপসী বানাইল

হাড়চুড় গুড়া নিয়ে ধুপসীতে দিল।

ধূপ-ধূনা সাঁজ-সলতে গোয়ালেতে দিল।

অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, ভগবতীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বধূগণকে বলি দেওয়া হইল। তখন গাভীগণের ক্রোধ শান্ত হইল—

এক লক্ষ গাভী গরু ঘুরে আসিল

এক লক্ষ ছিল গাভী ছয় লক্ষ হইল

বছর বছর পাল বাড়িতে লাগিল।

গ্রাম্য অশিক্ষিতা বধূগণকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গোপালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া যে ফল পাওয়া যায় না, এই সকল গাথাকাহিনীর প্রচারের মাধ্যমে সেই ফল লাভ হইত। তাই গ্রাম্য বধূগণকে এইরূপ গাথা শুনাইয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইত। বিজ্ঞান অথবা নীতিমূলক উপদেশ অপেক্ষাও এই সকল গাথা কার্যকরী হইত বলিয়া, গ্রাম্যসমাজে এগুলি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

পটুয়াগণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে পটে অঙ্কিত ছবি প্রদর্শন করিয়া এই সকল গান গাহিয়া বেড়াইত।

টিটা-টিটিনি কথা—

হিতোপদেশের অনুকরণে রচিত একটি নীতিকথাশ্রিত গাথার পরিচয় পাই বিশ্বভারতী পুঁথি সংগ্রহের ২৫২২ সংখ্যক পুঁথিতে। পুষ্পিকা অংশে রচনাটির নাম 'টিটানির কবিত্ব' বসিয়া উলিখিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ দাসে বলে মনে বড় ডর।
সুরস্বতি কৃপা মুরে কর নিরন্তর॥

ইতি—টিটানির কবিত্ব সমাপ্ত।

কিন্তু বর্ণিত কাহিনী অনুসারে এই নামকরণের কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই কারণে গাথাটিকে 'টিটা-টিটিনি কথা' নামে উল্লেখ করিয়াছি।

পল্লীসমাজ লইয়া রচিত কাহিনীটির মাধ্যমে 'একতাই বল' এই নীতিবাক্যটি রচয়িতা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কাহিনীতে আলৌকিকতার সমন্বয় লক্ষিত হয়। গাথাটি আগাগোড়া অসম পয়ার ছন্দে রচিত। কবিত্ব গুণ কিছুই নাই। কেবল উল্লিখিত নীতিবাক্য প্রচারোদ্দেশ্যেই ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ভণিতা অংশে রামকৃষ্ণদাসের নাম দেখিয়া মনে হয় ইনিই রচয়িতা। নারায়ণ দত্ত ১২০৯ সাল অর্থাৎ ১৮০২-১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পুঁথিটি লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং প্রকৃত রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হওয়া সম্ভব। গাথাটি যে একেবারেই গ্রাম্যকবি রচিত তাহা রচনাটির অর্বাচীন গ্রাম্যভাষা হইতে অনুমান করা যায়।

আরম্ভে অসংলগ্নতা দেখিয়া মনে হয়, গাথাটির পূর্বে ১ক অংশে দেব-দেবী বর্ণনা দিয়া গায়েন গাথাটি শুরু করিতেন। কিন্তু লিপিকার সে অংশ লিপিবদ্ধ না করিয়া আরম্ভে বলিয়াছেন—

১খ। একটি এই আসলকবিত্ব কাহিনি।
জাহার পদ ছাড়িলে কি ছাই নাই জানি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জাহার সৃজিত।
ফল গুণ ভোগ বঞা টিএ হৈল উপনিত॥

কালক্রমে টিটিনি গর্ভবতী হইল। টিটিনির অনুরোধে 'সাগরের কূলে টিটা

পড়িলেক গা বাসা।' 'কাটা ঝোটা' দিয়া রচিত এই বাসায় টিটানি দুইটি ডিম প্রসব করিল। একদিন ডিম দুইটি বাসায় রাখিয়া টিটা ও টিটনি খাদ্যান্বেষণে গিয়াছে, এমন সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় বাসা হইতে ডিম দুইটি সাগরের জলে পড়িয়া গেল এবং একটি 'রাঘব বোআল' ডিম দুইটি গিলিয়া ফেলিল।

কতক্ষণ বৈ টিটা চরিআ ভরিআ আইল।

এখন থাকুক বাসার কাজ্য ডাড়াইতে ঠাঞি নাই॥

অর্থাৎ বাসা তো দূরের কথা টিটদম্পতী দেখিল দাঁড়াইবার স্থানটুকুও নাই। ডিমের শোকে টিটনি 'নোটাঞ নোটাঞ পরে স্বামির পাঅ'। টিটা তখন সাগরের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সকল পক্ষীকে ডাক দিল। এখানে কবি বহু বিচিত্র পাখীর নাম করিয়াছেন। টিটার অনুরোধে—

চলিল ত ফেঙ্গা পক্ষ গগন বিমানে।

নানা বর্ণের জাতি পক্ষ ডাক দিয়া আনে॥

শুক, সারি, সারস, রাজহাস, আলিহাস, বালিহাস, দামুড়ি, আদাচোরা, মাণিকজোড়, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পক্ষী আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপে—

সাগরের জলে টিটা পাখি জমা কৈল।

তোমা লাগি গড়ুরে আমগা খাইল।

কিন্তু সকল পাখী আসিলে কি হয়, গড়ুর পাখী আসিতে অস্বীকার করিল।

গড়ুর বলে কোথা কার পক্ষ্যান কেবা তারে জানে।

তোর বোলে ফেঙ্গারে আমি যাব কেনে॥

তখন—

একথা শুনিয়া ফেঙ্গার হইল গমন।

গেয়াতির সাক্ষাতে গিয়া দিল দরসন॥

ফেঙ্গারের মুখে গড়ুরের অসম্মতির কথা অবগত হইয়া জ্ঞাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া গড়ুরকে শাপ দিল এবং সেই শাপের ফলে—

গোঠে গোঠে খসে গেল গড়ুরের পাখ।

ইহা দেখিয়া গড়ুরের পিতা, মাতা, সকলে কাঁদিতে লাগিল এবং গড়ুরকে জ্ঞাতিগণের কাছে মাফ চাহিয়া শাপমোচন করাইবার পরামর্শ দিল। তখন—

সকল পুখ উঠে গিয়ে গড়ুরের আছে দুটি ঠেঙ্গ।

নাফে নাফে যায় গড়ুর যেন কোলা বেঙ্গ।

গড়ুরের পাখা সব খসিয়া গিয়াছে, তাই তাহার উড়িবার ক্ষমতা নাই। তাহার

পা দুইটি কেবল সহায়, সেই দুই পায়ের সাহায্যে লাফাইতে লাফাইতে সে জ্ঞাতিগণের নিকটে চলিল। গড়ুর জ্ঞাতিগণের নিকট ক্ষমা চাহিতেই—

তুষ্ট হঞা গেঅতি সকল ঘুচাইল সাঁপ।

গুচে গুচে বিড়াইল গড়ুরের পাথ॥

তখন জ্ঞাতিগণের কথামত,

বিষ্ণুবাহন গড়ুর গাত্র কৈল বল।

ডান কান পাতি নিল সাগরের জল॥

এইরূপে সাগরের জল শুকাইয়া যাওয়ায় 'মিন মকর গোলা করে ধড়ফল।' গড়ুর সাগরকে বলিল—

তোমার গাছে তোমার মাছে টিটিনির ডিম্ব খাঅ।

তেকারণে হেরে আমার পাথ ছেদ জাঅ।

গড়ুরের এইকথা শুনিয়া সাগর—

বোআইল মাছকে তখন ডাকিয়া আনিল।

টিটিনির ……দুটি ডিম্ব আনি দিল॥

এইখানেই গাথাটি সমাপ্ত। অতঃপর পুষ্পিকা অংশে কেবল কবির নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না। এইরূপে ক্ষুদ্র পক্ষীজাতির একতাবদ্ধ বলের নিকট বিশাল সমুদ্রও পরাজয় মানিল।

চোর চক্রবর্ত্তী —

'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা', এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে বহু গল্প বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে। চোরের বুদ্ধির প্রখরতা এই সকল গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই জাতীয় কোন কোন গল্পের সহিত অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। পুরাতন বাংলায় লিখিত এইরূপ একাধিক পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি কাহিনী গাথার আকারে গ্রাম্যসমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। ইহার নাম 'চোর চক্রবর্ত্তী'। এই কাহিনী লইয়া রচিত পুঁথি কয়েকবার মুদ্রিতও হইয়াছে। বিভিন্ন গায়েন ও প্রকাশক কর্তৃক বিভিন্ন নামে মুদ্রিত ও লিপিবদ্ধ হইলেও, বিভিন্ন রচনার অন্তর্গত ভণিতায় বারংবার 'কাশীশ্বরে'র নামোল্লেখ দেখিয়া মনে হয় কাহিনীটির আদি রচয়িতা কাশীশ্বর নামক কোনও গ্রাম্য কবি। এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এক গ্রন্থের কথা ১২১৩ সালে রাজা পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'গৌরীমঙ্গল' নামক

গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে। সংগৃহীত পুঁথি অথবা মুদ্রিত পুস্তকগুলির ভিতর কোনওটি পৃথ্বীচন্দ্র উল্লিখিত গ্রন্থের সহিত অভিন্ন কিনা, বলিবার উপায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে বীর কাশীশ্বরের ভণিতায় 'চৌর চক্রবর্ত্তী' নামে একটি সম্পূর্ণ রচনা রক্ষিত আছে (পুঁথি সংখ্যা ৮৮৬)। ইহার লিপিকাল ১১৭২ সাল। লিপিকারের নাম নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহে রক্ষিত ৬২১৫ সংখ্যক পুঁথিও 'চোর চক্রবর্তীর' কাহিনী লইয়া রচিত। লিপিকাল ১২৬১, কাশীশ্বরের ভণিতা। এই কাহিনী লইয়া রচিত একটি মুদ্রিত পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুস্তকালয়ে আছে। বর্তমান অবস্থায় এই সকল পুঁথি ও পুস্তক হইতে কাহিনীটির প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তবে পুঁথিগুলির লিপিকাল সর্বপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখিয়া মনে হয় মূল কাহিনীটি ঐ সময়েই অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী এই দীর্ঘ কালের মধ্যে রচিত একাধিক পুঁথিসংখ্যা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, কাহিনীটি গ্রাম্যসমাজে সুপ্রচলিত ছিল।

এক প্রসিদ্ধ সুচতুর চোরের চৌর্য বর্ণনাই এই কাহিনীর উপজীব্য বিষয়। বিভিন্ন পুঁথি ও পুস্তকের অন্তর্গত মূল কাহিনী এক-বর্ণনায় সামান্য কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত চোর চক্রবর্তীর নাম বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাহার কীর্তিবিষয়ক নানা উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। কাহিনী রচিত ও প্রচারিত হইবার কিছুকাল মধ্যেই, কাহিনীর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া গায়েন অথবা শ্রোতাগণ কর্তৃক কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হয়। গাথাকাব্য হিসাবে এই কাহিনীর বিশেষ কোনও গুরুত্ব না থাকিলেও, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কত বিভিন্ন বিষয় লইয়া গাথা রচিত ও গীত হইত তাহার নমুনা হিসাবে ইহার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। নীতিকথাশ্রিত গাথাকাব্য হিসাবে এই কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এই যে চোরের রীতি-নীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই ইহার উদ্দেশ্য—চোরের প্রশংসা বা চৌর্যের উৎসাহ প্রদান ইহার কাম্য নহে। তাই, রচয়িতা প্রথমেই বলিয়াছেন—

চোর চক্রবর্তীর কথা সুনিতে মধুর।
জাহাকে সুনিলে লোক হয়েত চতুর।

নিরক্ষর গ্রাম্য জনসাধারণকে চতুর চোর সমাজের দৌরাত্ম্য হইতে সাবধান থাকিবার জন্য কিছু বুদ্ধিমূলক উপদেশ দানই এই গাথাটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল।

কাহিনীর নায়ক 'চোর চক্রবর্তী' উপাধিধারী এক সুচতুর চোর। চোরের নাম খরবর—পিতা বিজয়নগরের রাজার পাত্র উগ্রসেন, মাতা গুণবতী। নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খরবর চৌর্যবিদ্যা অধিগত করিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে 'চোর চক্রবর্তী' সাধারণ চোর নয়, সে রীতিমত শিক্ষিত এবং উচ্চবংশোদ্ভূত ব্যক্তি।

চম্পাবতী নগরীর রাজা চক্রধর, তাঁহার কোটাল দোসাহ্—

অতি বড় প্রবল কোতাল মহাসয়।
চোরধাঙড় কাটি রাজ্য করিলা নির্ভয়॥

কোটালের অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া চোরের দল-চোর চক্রবর্তীর নিকট নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল।

সুনিঞা প্রতিজ্ঞা কোপ হইল প্রচণ্ড।
জাইব চম্পাবতী পুরি করিব লণ্ডভণ্ড।
একে একে করিব সকল নগর চুরি।
নগবিঞা লোকেরে আমি করিব ভিখারি।

কোটালের চোর নিধন প্রতিজ্ঞা শুনিয়া 'চোর-চক্রবর্তী' প্রচণ্ড রাগিয়া অবশেষে—

মনেত ভাবিঞা কার্য্য শক্তি কৈল সার।
লুকাইঞা গেলে হবে অপজস আমার।

গোপনে যাওয়া লজ্জার বিষয় মনে করিয়া চোর এক পত্র লিখিয়া নিজের প্রতিজ্ঞার কথা প্রথমে রাজাকে জানাইয়া দিল। পত্র পড়িয়া চোরের সাহস দেখিয়া চম্পাবতীর রাজা বিস্মিত হইলেন। চোরের নাম শুনিয়া কোটাল ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কোটালের ব্যবস্থাক্রমে সর্বপ্রকারে নগরী সুরক্ষিত করা হইল।

এদিকে সন্ন্যাসীবেশে চোর খরবরা চম্পাবতী নগরীতে প্রবেশ করিল। চৌকিদার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে খরবরা উত্তর করিল—

অযোধ্যাতে ঘর মোর নাম কৃষ্ণদাস
নানা তির্থ ভুমিলাঙ মনের অভিলাস।

চৌকিদার এই পরিচয় বিশ্বাস করিল না, সে তাহাকে রাজার নিকট লইয়া

যাইতে চাহিল তখন সন্ন্যাসীবেশী চোর কপট ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভয়ে চৌকিদার তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর রাজার মালীর নিকট প্রকৃত পরিচয় দিয়া চোর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। খরবরাকে সকলেই ভয় করিত। কাজেই মালী ভয়-ভক্তি করিয়া তাহার বন্ধুত্ব গ্রহণ করিল ও তাহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে রাজী হইল। চোর মালীর আশ্রয়ে থাকিয়া, বিভিন্ন ছদ্মবেশের অন্তরালে দিনের পর দিন অত্যাচার করিয়া চম্পাবতী নগরীর জনসাধারণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। শেষ পর্যন্ত কোটালকে নাস্তানাবুদ করিয়া, তাহার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া চোর কোটালের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইল। রাজা চোর ধরিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া কলাধর নামক এক সর্বজ্ঞকে আনাইলেন। কিন্তু চোরের বুদ্ধির নিকট কলাধরও পরাজয় মানিল। কোটাল তখন সুযোগ বুঝিয়া কলাধরকে উপহাস করিতে থাকিলে কলাধর সাহঙ্কারে বলিল,

তবে মোকে সর্বজান বুলিহ কলাধর।
কালি ধরিঞা দিমু চৌর খরবর।

কিন্তু আস্ফালনই সার। চোর কৌশলে কলাধরের হাত কাটিয়া লইয়া রাজার বাড়ীতে গিয়া সিঁধ কাটিল। ঘরে কেহ জাগরিত আছে কিনা জানিবার জন্য চোর কলাধরের কাটা হাতখানি সিঁধের গর্তে ঢুকাইয়া দিল। সতর্ক রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার উপর খড়্গাঘাত করিতেই কাটা হাত ফেলিয়া দিয়া চোর পালাইল। রাজা ভাবিলেন চোরের হাত কাটা পড়িল, এই কাটা হাতই চোরকে সনাক্ত করিতে সাহায্য করিবে। প্রভাতে চোর গণকঠাকুর সাজিয়া রাজপুরীতে আসিল। চোরের কথা শুনিয়া গণকঠাকুরবেশী চোর কপট গণনায় বসিল এবং গণনাশেষে রাজাকে লইয়া কলাধরের বাড়ী উপস্থিত হইয়া কলাধরকে দেখাইয়া দিল। হাতকাটা কলাধর চোর বলিয়া সনাক্ত হইল। রাজা তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলে পাইকগণ কলাধরকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—নগরের লোকসকল মিলিয়া তাহাকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া তুলিল। তখন কলাধরের অবস্থা দেখিয়া চোর-চক্রবর্তী দয়ার্দ্র হইয়া রাজার নিকট পূর্বাপর সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিল। কোটালকে শিক্ষা দেওয়াই যে তাহার উদ্দেশ্য—চুরি করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। রাজা সমস্ত শুনিয়া এবং চোরের বুদ্ধি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আপন কন্যার

সহিত রাজা চোর-চক্রবর্তীর বিবাহ দিলেন। চোরও কিছু জিনিস মালীকে দিয়া অপহৃত সমস্ত জিনিসের বাকী অংশ ফিরাইয়া দিল; কোটালের স্ত্রী-কন্যাকে লুক্কায়িত স্থান হইতে ফিরাইয়া দিল।

নাগরিক মুক্তকণ্ঠে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে লাগিল।

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চোর চক্রবর্তী স্বদেশে ফিরিল। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে অনেক টাকা দক্ষিণা দিল এবং সকল চোরকে উপহার প্রদান করিল। অতঃপর চোর-চক্রবর্তী চোর সকলকে উপদেশ দিয়া বলিল—

আপনার সুখে তোমরা জথা তথা যাও।
ব্রাহ্মণ সজ্জন এড়ি চুরি করি খাও॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিন জন।
ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন॥

'চোর-চক্রবর্তীর' কাহিনীটি ইংরাজী ballad "Robin Hood" এর কাহিনী স্মরণ করায়। Robin Hood যেমন আদর্শ ডাকাত ছিল, চোর-চক্রবর্তীও তদ্রূপ আদর্শ চোর ছিল।

পরবর্তী কালে বাংলা শিশু পত্রিকা 'সন্দেশে' চোর-চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত উপদেশমূলক গল্প প্রকাশিত হয়।

'সসেমিরা'-গল্প —

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৬৪১ সংখ্যক পুঁথিতে অজ্ঞাত রচয়িতা এবং লিপিকারের ভণিতায় ১ হইতে ১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ একটি প্রায় দুইশত বৎসরের পুরাতন 'বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান' পাই। এই উপাখ্যানের অন্তর্গত কাহিনীটি বিখ্যাত নীতিগাথা 'স-সে-মি-রা'-র সংস্কৃত ও পরিবর্তিত রূপ। গ্রাম্যভাষায় রচিত গাথাটিতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক সংযুক্ত হইয়াছে।

মহারাজা বিক্রমাদিত্য, রাণী ভানুমতী ও নবরত্নের অন্যতম বররুচিকে লইয়া কাহিনীটি রচিত। এই কাহিনীর অন্তরালে যে নীতিবাক্য প্রচারিত হইতেছে তাহা হইল, সর্বকালে, সর্বঅবস্থায় মিত্রের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করাই হইল প্রকৃত বন্ধুর আদর্শ। কাহিনীটি এইরূপ—

রাজা বিক্রমাদিত্তি মহাপূর্ণবান।
প্রজার পালন করেন পুত্রের সমান॥

রাজসভা নবরত্নে শোভিত। রাজরাণী—ভানুমতী রূপবতী ও গুণবতী। রাণীর মোহে,

বিক্রমাদিতি রাজা থাকে সদাই অন্দরে।
ভানুমতি ছাড়ি রাজা না আইসে দরবারে॥

রাজার অবহেলায় ক্রমশঃ রাজকার্যের ক্ষতি হইতে লাগিলে। পাত্রমিত্রগণ এই কথা রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা বলিলেন যে, তিনি ভানুমতীকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিবেন না, সুতরাং রাজার আদেশে সুনিপুণ কারিগরদ্বারা ভানুমতীর এক মূর্তি গড়িয়া—

রাজদরবারে তাহা আনিঞা রাখিল।
খীন রাজা সিংহাসনে আসিয়া বাসিল॥

সকলে কারিগরের প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু বররুচি বলিলেন যে ভানুমতীর মূর্তিগঠনে সামান্য একটু খুঁৎ রহিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া—

কারিগর রাগে তুলি আছাড়ে ফেলিল।
তুলি হইতে কালি বিন্দু উরুতে লাগিল॥
তাহা দেখি তখন বররুচি কহিল।
ভানুমতীর সর্ব্বত্তর এখন হইল॥
ভানুমতীর আছে তিল বিন্দু উরুদেশে।
দেয় নাই এবে দিল হইল বিসেযে॥

বররুচির এই কথায় রাজার সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভানুমতীর উরুদেশে যে তিল আছে তাহা বররুচি কি প্রকারে জানিলেন, সন্দিগ্ধ রাজা 'লস্করে হুকুম দিল তার গর্দ্দান মারিতে।' কিন্তু পণ্ডিত মানুষকে জহ্লাদ হত্যা করিতে পারিল না। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া শৃগাল, শুয়ারের রক্ত নিয়া রাজাকে দেখাইল। বররুচি বনে বনে পালাইয়া আর এক দেশে গিয়া রমণীর বেশ ধারণ করিয়া দাসীরূপে এক দ্বিজের আশ্রয়ে রহিলেন। কিছুদিন পরে বিক্রমাদিত্যের পুত্র শিকার করিতে বনে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি হইয়া রাজপুত্র সঙ্গীছাড়া হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীদের হারাইয়া রাজপুত্র একাকী বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে—

দিবাগতো রাত্রী হইল ভয় পাইল মনে।
বৃহদ বিক্ষ্য পরে উঠে রহিল জতনে॥

ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক বাস করিত। সে আসিয়া রাজপুত্রকে দেখিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে গেল কিন্তু রাজপুত্র তাহাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতেই,

ঋক্ষ্য বলে মিত্র হইলে স্বচ্ছন্দেতে থাক।
বিক্ষ্য তলে ব্যাঘ্র থাকে সাবধানে দেকো॥

এই বলিয়া ভল্লুক রাজপুত্রকে নিদ্রা যাইতে বলিয়া আপনি পাহারায় রহিল। কিছুক্ষণ পরে ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত। ব্যাঘ্র ভল্লুকের কাছে রাজপুত্রকে চাহিলে,

ভল্লুক বলেন আমি কভু না পারিব।
ফেলে দিলে বন্ধুহর্তার পাতকি হইব॥

বাঘ অনেক সাধ্যসাধনা করিল তবুও ভল্লুক রাজপুত্রকে ফেলিয়া দিল না। কতক্ষণ পরে রাজপুত্র উঠিলে ভল্লুক তাহাকে ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিল যে, এইবার রাজপুত্র জাগিয়া পাহারা দিবে এবং সে ঘুমাইবে। কিন্তু তবুও,

অবিশ্বাসি নর জাতি বিক্ষ ভাবি মনে।
গাছে নোক ফুটাইয়া ঘুমায় ততক্ষণে॥

পুনরায় ব্যাঘ্র আসিয়া রাজপুত্রকে বলিল শীঘ্র ভল্লুককে ফেলিয়া দিতে, নহিলে সে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে থাকিল। ভল্লুকের উপকারিতার কথা ভুলিয়া রাজপুত্র ভল্লুককে ঠেলিয়া ফেলিতে গেল, কিন্তু নোখ ফুটাইয়া থাকায় ভল্লুক পড়িল না। জাগিয়া উঠিয়া ভল্লুক বলিল যে, বন্ধু বলিয়া সে তাহাকে প্রাণে মারিবে না। প্রভাত হইলে উভয়ে বৃক্ষতলে নামিল। 'স-সে-মি-রা' বলিয়া ভল্লুক রাজপুত্রের গালে চারিটি থাপড় মারিয়া বনে চলিয়া গেল, আর—

করাঘাতে রাজপুত্র ক্ষেপ্ত ততক্ষণে।
সসেমিরা সসেমিয়া কহে সর্বক্ষণে॥

প্রভাতে হারানো পুত্রের সন্ধানে রাজা চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। অবশেষে—

অনুখোন খুঁজি তারে পাইল সকলে।
কোথা ছিলে জিজ্ঞাসিলে সযেমিরা বলে॥
ঘরে গেল রাজপুত্র জিজ্ঞাসে তাহারে।
ঐ বোল বিনা আর না দেয় উত্তরে॥
বার বার রাজা তবে জিজ্ঞাসে সর্ত্তরে।
সসেমিরা কহে সদা উত্তর না করে॥

রাজা রাজপুত্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার চিকিৎসার্থে বৈদ্য আনিতে দিকে দিকে লোক পাঠাইলেন।

বররুচি এই.কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, তিনি রাজপুত্রকে ভাল করিয়া দিবেন। তখন,

বিপ্র বলে ধোন লোভে ইহা জে কহিব।
কিন্তু ভাল না হইলে প্রমাদ ঘটীব ॥

কিন্তু বররুচির অনুরোধক্রমে ব্রাহ্মণ গিয়া রাজার নিকট খবর দিলেন এবং বররুচির ইচ্ছানুসারে রমণীবেশী বররুচিকে সকলের অগোচরে এক কক্ষে রাখিয়া আর একটি কক্ষে রাজপুত্রকে লইয়া সকলে রহিলেন। দাসীবেশধারী বররুচি অপর কক্ষ হইতে রাজপুত্রের মৃগয়াযাত্রার বর্ণনা করিয়া অবশেষে যখন বলিলেন—

রাজপুত্র সত্যহারি আপন সত্য হারা
রিক্ষ করাঘাতে সদা বলে সসেমিরা।

তখন, বররুচির কথা 'স্থনি রাজপুত্রে চক্ষে ধারা যে পড়িল।
সসেমিরা চারি কথা তবু না ছাড়িল ॥

এইবার বররুচি কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে একে একে 'স-সে-মি-রা' কথাটির অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রাজপুত্রও একে একে একটি একটি করিয়া শব্দ ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

রচয়িতা বররুচি কথিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি লিখিয়া পরে উহার অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন জনসাধারণের স্থবিধার্থে।

বররুচি যখন বলিলেন যে, সৎভাব, প্রীতি ইত্যাদি বিষম সংকটকালেও যে রক্ষা করে সেই প্রকৃত বন্ধু। সদ্‌ভাবাপন্ন ভল্লুকের সহিত মিত্রতা করিয়া রাজপুত্র পুনরায় তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তখন ইহা শুনিয়া রাজপুত্র 'স'ত্যাগ করিয়া শুধু 'সেমিরা' বলিতে লাগিলেন। অতঃপর বররুচি বলিলেন—

সেতুবন্ধ সমুদ্র আর গঙ্গাসাগরে।
এ সব তির্থেতে যদি কেহ সান করে ॥
ব্রহ্মহত্যাদি সব পাপ মোচন হয়।
মৃত্তদ্রোহে পাপ কভু নাহি হয় ক্ষয় ॥

বররুচি এই কথা বলিতেই রাজপুত্র 'মিরা', 'মিরা' বলিতে লাগিলেন। বররুচি বলিলেন—

মূর্ত্তদ্রোহি কর্ম দেখ অতি পাপদয়।
বিশ্বাস ঘাতকি কর্ম জে জোন কর্রয় ॥
সেই অধার্মিক মহানর্ক্ক বাসি হয়।

তখন রাজপুত্র কেবল 'রা', 'রা' করিতে লাগিলেন।

অবশেষে বররুচি বলিলেন—

রাজারাজপুত্র মোর বাক্য স্নুনে নেহ।
এ সকল বিসএ জদি কল্যান চাহ ॥
ব্রাহ্মণেরে দান করে পূরাহ বাসনা।
করহ একান্ত মনে দেব আরাধনা ॥

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রের ক্ষিপ্ততা দূর হইল। রাজপুত্র আরোগ্য লাভ করিয়া দাসীর পরিচয় এবং কিছু না দেখিয়াও সে কি করিয়া রাজপুত্র ও ভল্লুকের বৃত্তান্ত অবগত হইল তাহা জানিতে চাহিলে দাসী কোনও কথা জানাইতে অস্বীকার করিল। রাজপুত্র নির্ভয় প্রদান করিয়া বলিল—

ভয় নাহি স্নুন্দরী স্নুনহ স্নুসিলতা।
কহ কহ তব জত বিবরণ কথা ॥
তুমি যদি দোস কর তাহা দোস নয়।
কহ তব সব কথা হইয়া নির্ভয় ॥

বররুচি উত্তর করিলেন—

দেবগুরু দ্বিজ আদি প্রসাদেতে করি।
মম উচুখ্যাগ্রেতে স্বরে স্বতি বাষ করি ॥
এসব বিত্তান্ত জদি নাহি জানি মনে।
ভানুমতির জথা তিল জানিলাম কেমনে ॥

রাজা এইকথা শুনিয়াই দাসীবেশী বররুচিকে চিনিলেন এবং তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

পূর্বমত বররুচি রহিলা সভায়।
সবপ্রেক্ষা মান্ডমান হইল তথায় ॥

সুবিন্ন পণ্ডীত তুমি বরুচি মহাসয়।
বিত্যার গুণেতে তার সর্ব্বর্ত্তেতে জয় ॥

এই কাহিনীটি দ্বারা দুইটি নীতিবাক্য প্রচারিত হইত, প্রথমটি বন্ধুর প্রতি বন্ধুর বিশ্বাস রক্ষা করা আদর্শ বন্ধুর পরম কর্তব্য এবং দ্বিতীয়টি প্রকৃত বিদ্বান সর্ব্বত্রই জয়লাভ করেন।

তোতা-কাহিনী ঃ

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সমভিব্যাহারে রাজসভাতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় এক যোগাপুরুষ আসিয়া রাজাকে বলিল—

তুমি বড় দাতা খ্যাত দেশে বিদেশেতে
শুনিয়া এসেছি কিছু জাচিঞা করিতে।

রাজা যোগীর প্রার্থনা পূরণ করিবার অঙ্গীকার করিলেন এবং যোগীর অনুরোধক্রমে তাঁহাকে লইয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যোগী গৃহের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া একটি মৃত তোতা পক্ষী বাহির করিয়া রাজাকে বলিল মৃত তোতাপক্ষীর প্রাণদান করিতে। সত্যপরায়ণ, দানবীর রাজা আপন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া স্বীয় প্রাণ দিয়া তোতার জীবন দান করিলেন। যোগী এই অবসরে রাজার পরিত্যক্ত-প্রাণ দেহে আপন প্রাণ প্রবিষ্ট করাইয়া রাজা সাজিয়া বসিল। যোগী নিজের দেহ মাটির তলায় লুকাইয়া রাখিল। রাজাবেশী যোগী তোতাকে মারিয়া ফেলিতে গেলে অকস্মাৎ,

পবনের দয়া হৈল বিপদ দেখিয়া।
গবাক্ষ দ্বারেতে বেগে গেলা পলাইয়া ॥

এইভাবে রাজা পলাইয়া বনের ভিতর আশ্রয় নিলেন। রাজার দেহধারী যোগী তোতাকে মারিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফল হইল। অতঃপর তোতার দেহধারী রাজার বুদ্ধিবলে যোগীর প্রাণ রাজার দেহ ছাড়িয়া এক মেষদেহে প্রবিষ্ট হইলে সেই অবসরে রাজা পুনরায় নিজদেহে অধিষ্ঠান করিলেন। যোগীর দেহ মৃত্তিকাতল হইতে উঠাইয়া রাজা তাহাতে মেষদেহস্থিত যোগীর প্রাণ প্রবিষ্ট করাইলেন। দেহ ও প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া যোগী লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। রাজা তখন যোগীকে সদুপদেশ দিয়া ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

এইরূপ বিভিন্ন লৌকিক এবং অলৌকিক কাহিনীর মাধ্যমে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গুণাবলীসমন্বিত পল্লীগাথাগুলি জনসাধারণের ভিতর নীতি শিক্ষা প্রচার করিত।

বিক্রমাদিত্য উপাখ্যানের অন্তর্গত আর একটি ছোট নীতিগাথার পরিচয় পাওয়া যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহের ১৬৪১ সংখ্যক পুঁথিতে। পুঁথিটি ১২ পাতার, প্রায় দুইশত বৎসরের পুরাতন, রচয়িতা বা লিপিকারের নাম নাই। পুঁথিটিতে রাজা বিক্রমাদিত্য-উপাখ্যানের অন্তর্গত 'সসেমিরা', 'রাক্ষসী সমস্যা' প্রভৃতি বিভিন্ন নীতিগাথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্য গাথাটি পুঁথিটির একেবারে শেষাংশে লিপিবদ্ধ। ক্ষুদ্র কাহিনীটির নাম 'শুকোপাখ্যান' দেওয়া যাইতে পারে। কাহিনীটিব মাধ্যমে হিতোপদেশের অনুকরণে শুকপক্ষীর মুখনিঃসৃত বাক্যের দ্বারা সৎসঙ্গের গুণ ও অসৎসঙ্গের দোষ বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনী সামান্য—বর্ধমান চাকলায় রাজপুর গ্রামে এক বিপ্র বাস করিতেন। একদিন তিনি শিষ্যগণসহ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক চণ্ডাল ব্যাধের দেখা পাইলেন এবং তাহার সহিত যাইতে যাইতে—

> পথমর্দ্ধে দেখে এক বৃহদ বিক্ষ্য আছে।
> সুক সারস পক্ষি তায় বাস করিয়াছে॥

শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্মণ বুঝিলেন যে, এই পাখীদুইটি যাহার গৃহে থাকিবে তাহার উপর মা লক্ষ্মীর অশেষ কৃপা হইবে।

ব্রাহ্মণ ব্যাধকে পাখী দুইটি ধরিয়া দিবার জন্য কহিলে ব্যাধ একটি পাখী দাবী করিল। ব্রাহ্মণ তাহাতেই রাজী হইলেন। অতঃপর ব্যাধ পাখী দুইটি ধরিলে ব্যাধ ও ব্রাহ্মণ পাখী দুইটি লইয়া গৃহে ফিরিল। এই পাখী যাহার ঘরে থাকে 'অনাআসে কোমলার কৃপা হয় তাকে।' সুতরাং ব্যাধ ও ব্রাহ্মণ উভয়ের প্রতিই লক্ষ্মীর অশেষ কৃপা হইল। দুইজনেই অট্টালিকা, হস্তি, ঘোড়া প্রভৃতির মালিক হইয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। দুইজনে,

> আপন আপন দ্বার মর্দ্ধে পক্ষিরে রাখিল।
> দৈবজোগে সেই গ্রামে এক বিপ্র আইল॥

বিদেশী ব্রাহ্মণ প্রথমে চণ্ডালের অট্টালিকার দ্বারে গিয়া অতিথিরূপে আশ্রয় চাহিল। চণ্ডালের পালিত পাখী ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই গালিগালাজ করিয়া তাড়াইয়া দিল। পথে চলিতে চলিতে বিস্মিত ব্রাহ্মণ ঠিক 'সেইরূপ আর

একটি গৃহ দেখিতে পাইল।' এই অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে—

ভাবিতে ২ দ্বিজ দ্বারে প্রবেসিল।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া পক্ষ সমাদর কৈল॥
চাকরে কহিল সিগ্র আনহ আসন।
পদ প্রক্ষ্যালনের জল দেহ ভিত্তগণ॥

পক্ষীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহস্থিত পক্ষীর নিকট উভয় পক্ষীর ব্যবহারের তারতম্যের কারণ জানিতে চাহিলে—

পক্ষি কহে মাতাপীত্যা দোহি পক্ষ মোর।
সেহ পক্ষি সেহ মোর ভাই সহোদর।
এই দ্বিজবর দেখ আনিয়াছে মোরে।
চণ্ডালেতে আনি পালন করেছে তাহারে।
সংসর্গ দোষে অধমতা প্রাপ্ত হয়।
আর উত্তম স্থানে থাকিলেই উত্তম হয়।

গাথাটির ছন্দ সুখশ্রাব্য নহে। 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ' এই নীতিবাক্যটি প্রচারোদ্দেশ্যেই কোনওক্রমে কাহিনীটিকে গাথার রূপ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রচনাটিতে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক দেখিয়া মনে হয়, কাহিনীটি যিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তিনি কিছুটা শিক্ষিত ছিলেন এবং গাথাটি লিপিবদ্ধ করিবার সময় মূল রচনার সহিত তিনিই এই শ্লোকগুলি সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

তুতিনামা—

'তুতিনামা' বা 'তোতা-ইতিহাস' নামক একটি নীতিগাথা গ্রাম্যসমাজে সুপ্রচলিত ছিল। এই কাহিনী লইয়া রচিত গাথার বহু সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই গাথাকাহিনীটি এসিয়ার সর্বত্রই সুপ্রচলিত ছিল। পারসী ভাষা হইতে অনূদিত 'তুতিনামা' উপাখ্যানের একটি অসম্পূর্ণ পুঁথি (৩৪৬০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহে আছে। এই নীতিমূলক গল্পটি সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই গাথার আকারে উদ্ভূত হইয়া সপ্রচারের ফলে দেশ-বিদেশে পরিচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বাংলা ভাষায় কাহিনীটি লিপিবদ্ধ না থাকার দরুণ পরবর্তী কালে বিদেশী ভাষা হইতে কাহিনীটিকে উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ—

পূর্বকালে আদম্ সুলতান নামে এক ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সন্তানসন্ততি না থাকায় তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট সন্তান কামনা করিতেন। দেবতার বরে অবশেষে সুলতান এক পুত্র লাভ করিলেন এবং তাহার নাম রাখিলেন ময়মুন্। কালক্রমে ময়মুন্ বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিলে সুলতান খোজেস্তা নাম্নী অতিশয় সুন্দরী এক কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। ময়মুন্ ও খোজেস্তা পরম আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন ময়মুন্ বাজারে একটি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তোতাপাখী দেখিয়া তাহাকে এক সহস্র হুণে কিনিয়া আনিলেন। অতঃপর এক সারী কিনিয়া তাহাদের একত্রে রাখিলেন। ময়মুন্ তোতার পরামর্শেই সকল কাজ করেন। কিছুদিন পর ময়মুন্ বাণিজ্যে যাইবার কালে খোজেস্তাকে বলিয়া গেলেন যে, সকল বিষয়ে যেন তিনি তোতা ও সারীর পরামর্শ ও উপদেশমত চলেন, তাহা হইলে কোনও বিপদ হইবে না। পতিবিরহে খোজেস্তার ছয়মাস কাটিয়া গেল। একদিন খোজেস্তা অট্টালিকার গবাক্ষ দিয়া পথের কৌতুক দেখিতেছিল এমন সময় সেখানে এক বিদেশী রাজপুত্রকে দেখিলেন এবং রাজপুত্রের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। রাজপুত্রও পথ হইতে খোজেস্তাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং এক কুটনী মারফৎ খোজেস্তার নিকট গোপনে খবর পাঠাইল যে, এক রাত্রি চারিদণ্ডের সময় খোজেস্তা যদি রাজপুত্রের বাড়ী যায় তো তাহার বদলে রাজপুত্র তাহাকে লক্ষ হূণ (পারস্য মুদ্রা) মূল্যের এক অঙ্গুরী দিবে। খোজেস্তা প্রথমে স্বীকার না যাইলেও, পরে মোহের বশীভূত হইয়া অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজপুত্রের নিকট যাইতে সম্মত হইল। রজনীতে অনেক ভাবিয়া খোজেস্তা সারীর নিকট পরামর্শ চাহিলে, সারী যাইতে নিষেধ করিল। তখন কুপিতা খোজেস্তা তাহার দুই পা ধরিয়া এমন জোরে আছাড় মারিল যে, সারীর প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন খোজেস্তা তোতার নিকট গিয়া বিস্তারিত জানাইয়া রাজপুত্রের নিকট যাইবার অনুমতি চাহিলে, জ্ঞানী তোতা বুঝিল যে, খোজেস্তার এই অন্যায়কর্মে বাধা দিলে তাহারও সারীর দশা হইবে, সে তখন কৌশলের সাহায্য লইল। তোতা প্রতি রাত্রে খোজেস্তার যাইবার সময় একটি করিয়া চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুরু করে এবং প্রাতঃকালে শেষ করে। খোজেস্তা সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণের ফলে অনিদ্রায় ক্লান্ত হইয়া প্রভাতে শয়ন করিতে যায়। এইরূপে তাহার আর রাজপুত্রের নিকট যাওয়া হয় না। বুদ্ধিমান তোতা এইরূপে কৌশলের সাহায্যে খোজেস্তাকে পাপকাজ হইতে নিবৃত্ত করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বারমাসী গাথা

বারমাসী গাথা প্রাচীন বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বৎসরের বারটি মাস অথবা ছয়টি ঋতুর বর্ণনার মাধ্যমে নায়িকার অন্তরের বিরহ অথবা মিলনের ভাব প্রকাশ করাই এই রচনার উদ্দেশ্য। বারমাসী গাথা একান্তই নারীজীবনাশ্রিত সঙ্গীত। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন ও তাহার সহিত মনুষ্যজীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধে পল্লীকবিগণ কিরূপ সচেতন ছিলেন এই সকল বারমাসী গাথার ভিতর দিয়া আমরা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করি। এই শ্রেণীর গাথা সর্বপ্রথম কবে এবং কোথায় রচিত হয় আজ তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। কেবল বাংলাসাহিত্যে নহে, ভারতবর্ষের সমস্ত আঞ্চলিক সাহিত্যের ভিতর নানাভাবে এই বারমাসী গীতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পল্লীকবিরচিত বাংলা বারমাসী গাথাগুলিকে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের এক একটি চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত বারমাসী গীতের মধ্য দিয়া পল্লীনারীর অন্তরতম হৃদয়ের বিভিন্ন রস বিভিন্ন ভাবের আকারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল বারমাসী গাথার মধ্যে প্রেম, শোক, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের প্রকাশই অধিক। তাহার ভিতর করুণরসই বিভিন্ন বারমাসী গাথার মূলরসের দ্যোতক।

বারমাসী গাথাগুলিকে দুইটি বিভিন্ন আকারে আমরা পাইতেছি। আখ্যানমূলক বারমাসী গাথা ও বর্ণনামূলক বারমাসী গাথা। প্রথমোক্ত শ্রেণীর রচনায় একটি কাহিনীর মাধ্যমে বৎসরের বিভিন্ন মাস ও ঋতুরত নায়িকার মনোভাব বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গাথাগুলি অধিকাংশই প্রেমরসজাত। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাথায় বারমাস ও ঋতুর বর্ণনামাধ্যমে নায়িকার হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর গাথাগুলিতে শৃঙ্গার ও বাৎসল্যরসজাত নায়িকা হৃদয়ের বিরহ, মিলন, শোক, আনন্দ ইত্যাদি ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

বাংলা পল্লীসাহিত্যের অন্তর্গত সমগ্র বারমাসী গাথাসাহিত্যকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়—
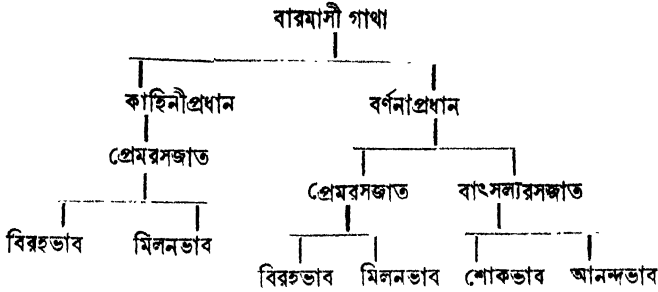
ইহা ছাড়া চাষ-আবাদের বর্ণনামূলক বারমাসী গাথাও কিছু পাওয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ফুল্লরার বারমাসী, খুল্লনার বারমাসী, সুশীলার বারমাসী, মনসার বারমাসী এবং বৈষ্ণব কাব্যের অন্তর্গত গৌরাঙ্গ বারমাসী, বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসী, নিমাইর বারমাসী, ইত্যাদির মূল উৎস যে এই পল্লীগাথাগুলি তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পল্লীকবি রচিত এই সকল বারমাসী গাথাগুলি মানবহৃদয়ের শোক, দুঃখ ও আনন্দের ভাষা বহন করিয়া কালক্রমে মানবমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং সুশিক্ষিত কবিগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া তাঁহাদের রচনার ভিতর আপন আপন স্থান করিয়া নিয়াছিল। এইরূপে পল্লীকবি রচিত এই বারমাসী গাথাগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এই সকল বারমাসী গীত ছাড়াও বিভিন্ন গায়েন কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং বিভিন্ন পল্লীকবি মুখনিঃসৃত যে সকল বারমাসী গীত সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে বারমাসী গাথার নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত করা যাইতে পারে। লোকমুখে পরিবর্তিত হইতে হইতে এই সকল গাথা অনেকটা কৃত্রিমতা লাভ করিলেও প্রাচীন বারমাসী পল্লীগাথার রূপান্তরিত নিদর্শন হিসারে ইহাদের মূল্য কিছুমাত্র কম নহে। উপরি-উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এই প্রকারের কতকগুলি বারমাসী গাথার বিবরণ নিম্নে দিতেছি।

কাহিনীপ্রধান বারমাসী গাথা—

এই শ্রেণীর অন্তর্গত গাথাগুলি প্রেমরসজাত। বৎসরের অন্তর্গত বারমাস এবং কখনও কখনও ছয় ঋতু বর্ণনার মাধ্যমে বিরহিণী নায়িকা-হৃদয়ের গভীর

শোকোচ্ছ্বাস বর্ণিত। গাথানিঃসৃত করুণরসে শ্রোতাগণের মন নিষিক্ত হইয়া যাইত, সুতরাং পরিশেষে যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়ক ও নায়িকার মিলনে গাথা সমাপ্ত হইত তখনও শ্রোতাগণের হৃদয়ে এই মিলনের আনন্দ অতিক্রম করিয়া দুঃখের বেদনা অনুরণিত হইত। এইপ্রকারে কাহিনীপ্রধান বারমাসী গাথাগুলি বিয়োগান্তই হউক অথবা মিলনান্তই হউক, করুণরসই রচনাগুলিতে প্রাধান্য লাভ করিত। দুঃখের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া নরনারীর প্রেমকে সমুজ্জ্বল দেখানো প্রাচীন পল্লীকবিগণের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বারমাসী গাথাগুলিও সে বিশিষ্টতা অতিক্রম করিতে পারে নাই। এইরূপ কয়েকটি গাথার পরিচয় দিতেছি।

দামিনীচরিত্র—

ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে একটি ছোট বারমাসী প্রণয়-গাথা একদা সুপ্রচলিত ছিল। ঋতুসংহারের কাঠামোর চিরবিরহিণী বালিকা-পত্নীর হৃদয় পরীক্ষা লইয়া কাহিনী রচিত। ভোজপুরী লোকগীতে এই গাথা এখনো চলিত আছে। পশ্চিম-বাংলায়,—উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এবং আসামেও এই গাথা পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভিতর পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত গাথাটিই সর্বাপেক্ষা পুরাতন আকৃতিতে পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) কার্তিক-পৌষ, ১৩৫২ সংখ্যায় ডঃ সুকুমার সেন সর্বপ্রথম এই গাথাটির পরিচয় উদ্ধৃত করেন। গাথাটির নাম 'দামিনীচরিত্র'। রচয়িতা স্বরূপ। এই গাথাটি বর্ধমান সাহিত্য সভার ১৯৯ সংখ্যক পুঁথির অন্তর্গত। পুঁথিটিতে লিপিকাল আছে তারিখ, মাস ও বার। সালের উল্লেখ নাই। কাগজের অবস্থা ও ধরণ দেখিয়া ডঃ সুকুমার সেন ইহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ধমান জেলার দক্ষিণপ্রান্তে তাঁহার গ্রামে এক বোঝা পুঁথির মধ্যে এই পুঁথিটি ছিল। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক ইহা সংগৃহীত হয়। পুঁথির পত্র সংখ্যা ১২। পয়ার-ত্রিপদী ছত্র-সংখ্যা ৩৩০।

শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন গাথাটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

"পূর্ববঙ্গ গীতিকার সৎসাহিত্যসুলভ রোমান্টিক সৌন্দর্য ইহাতে নাই। অশিক্ষিত গায়েনের অর্থহীন শৈথিল্যও নাই। আলোচ্য দামিনীচরিত্রে আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথায় অকৃত্রিম অতএব অনুজ্জ্বল সরল রূপটি পাইতেছি।

দেবদেবীর বন্দনা বা দোহাই নাই। সুতরাং এটি একটি লৌকিক প্রণয়-গাথার দুর্লভ প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

উত্তরবঙ্গের গাথাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন গ্রীয়ারসন সাহেব। ইহাতে পাত্রীর নাম নীলা। আব্দুল করীম সাহেবের 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'-এ এইরূপ দুইটি বারমাসী গাথার আংশিক পরিচয় পাই (১৩২০ সাল)। দুইটি রচনা এক না হইলেও, কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ইহাদের মূল রচনা অভিন্ন। বিভিন্ন গায়েন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইবার কালে ইহাদের আকৃতি পৃথক হইয়া গিয়াছে। দুইটি রচনাই একেবারে গ্রাম্যভাষায় রচিত।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ডে 'শান্তি' ও 'নীলা' নামে এইরূপ দুইটি গাথার পরিচয় দিয়াছেন (১৯২৬ খৃঃ)। 'নীলা' পালাটির ভণিতায় জয়ধর বাণিয়ার নাম দেখিয়া মনে হয় উহা অসমীয়া গাথার রূপান্তরিত অবস্থা। 'শান্তি' পালাটিও ঐ এক কাহিনী লইয়াই রচিত। এইরূপে একই কাহিনী লইয়া রচিত বিভিন্ন নায়িকার নামে বিভিন্ন লিপিকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে গাথাটির সুপ্রচলন সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণা জন্মে। 'নীলা' পালাটির রচয়িতা জয়ধর অথবা শ্রীধর বাণিয়া একই ব্যক্তি এবং ইনি শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। ইঁহার রচিত গাথাটি আসাম ও বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রচারলাভের ফলে বিভিন্ন গায়েন কর্তৃক বহু পরিবর্তিত হইয়া যায়। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন "জয়ধর বাণিয়া এই পালার আদি-রচয়িতা না হইতেও পারেন।" রচয়িতা যিনিই হউন একই বিষয় লইয়া রচিত বারমাসী গাথাটি যে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। কাহিনীটি মোটামুটি এইরূপ—

অতি শৈশবে নায়িকার যখন বিবাহ হয়, তখন স্বামীকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই। দৈববশে স্বামী বিদেশে বাণিজ্যে গেলে, পিতৃগৃহে পতিবিরহিণী নায়িকার দিন কাটিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে নায়িকা যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে তখন বাণিজ্য হইতে ফিরিবার পথে নায়িকার স্বামী আপন পরিচয় গোপনান্তে একান্তে পত্নীর প্রণয় প্রার্থনা করিয়া এক বৎসরের বারটি মাস ধরিয়া নানা প্রলোভনে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। পত্নীর নিষ্ঠা কিছুতেই টলিল না। তখন নায়ক-নায়িকার বহুআকাঙ্ক্ষিত মিলনে কাহিনীটি সমাপ্ত।

প্রত্যেকটি রচনাই দীঘির ঘাটে নায়িকা ও তাহার অপরিচিত পতির কথোপকথনে আরম্ভ। বারমাস বর্ণনার মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার বিচিত্র কথোপকথন গাথাটিকে বারমাসী গাথার বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

নায়িকা স্নান করিতে গিয়াছে। জলে নামিয়া সে যখন স্নান করিতেছে তখন দীঘির ঘাট হইতে তাহার অপরিচিত স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেছে—

কাহার ঘরের কন্যা তুমি কিবা তোমার নাম,
মাথা তুলি কহ কথা জুড়ুক পরাণ।

এই কথা বলিয়া সাধুপুত্র দামিনীর রূপবর্ণনা করিতে লাগিল। সাধুপুত্রের হীনচাটু বাক্যে বিরক্ত হইয়া সতীসাধ্বী দামিনী ঘরে ফিরিয়া গেল। তখন সাধুপুত্র গিয়া কন্যার বাড়ী অতিথি হইলে দামিনী ভিক্ষা দিতে আসিল এবং এই অবসরে সাধুপুত্র প্রণয়ভিক্ষা করিয়া বলিল—

কার্তিক মাসেতে কন্যা নিরমলা রাতি,
নিশির স্বপনে দেখি তু হেন যুবতি।
আলিঙ্গন দেই মোরে করিয়া পিরিতি,
আশীর্বাদ নেহ তুমি রহুক খেআতি।

দামিনী উত্তর দিল,

কি কাজ পিরিতি মোর ধর্মে থাকুক মতি,
আলিঙ্গন দিব যখন আসিবেন পতি।

এইরূপে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র প্রভৃতি প্রতি মাসেই সাধুকুমার আসিয়া দামিনীকে বিবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কন্যার মন টলাইতে পারিল না। অবশেষে আষাঢ় মাসে আসিয়া সাধুপুত্র কন্যাকে ভয় দেখাইয়া বলিল—

আষাঢ় মাসে কন্যা ল মেঘের ঘটা,
শান্তিপুরের সাধুর তোমার মাথা গেছে কাটা।

কিন্তু সতীসাধ্বী রমণী এ কথায় দমিল না, স্বামীর অমঙ্গল ঘটিলে বহুদূরে থাকিয়াও সতীসাধ্বী রমণী তাহা বুঝিতে পারে। তাই দামিনী উত্তর করিল,

আমার সাধু মরিত জদি জানিতাম আমি,
সতেসরি হার মোর খসিত তখনি।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে সংহীত গাথাগুলিতে কন্যার এই উক্তি আরও বলিষ্ঠ—

আমার যদি সাধু হারে মরত কাঞ্চনপুরের ভাটি।
আমার আওলাইত মাথার ক্যাশরে ছিড়ত গলার মোতী॥
রাম লক্ষ্মণ দুড়ী শংখ আমার ভাইঙ্গ্যা হইত চুর।
আস্তে আস্তে মৈলাম হৈক শিস্তার সিন্দুর॥

এইরূপে মাসে মাসে অন্যাকে পরীক্ষান্তে তাহার দৃঢ়চিত্ততা ও ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া সাধুপুত্র আশ্বিনমাসে আসিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দিয়া বিদায় নিল।

আশ্বিন মাসেতে কন্যা পুরিল বার মাস,
না রব তোমার হেথা যাব আপন বাস।
বুঝিলাঙ তোমার মন পতিব্রতা সতী,
আশীর্বাদ দিলাঙ তোমাএ শুন ল যুবতি।

এই বলিয়া আপন পরিচয় প্রদানান্তে সাধুপুত্র চলিয়া গেল। তখন দামিনী মাতার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে মাতা বুঝিলেন এ ব্যক্তি জামাতা ছাড়া আর কেহ নহে। তখন খোঁজ-খবর করিয়া প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া আদর করিয়া জামাতাকে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। কন্যা-জামাতার মিলন হইল। দামিনী কটুকথা বলিবার জন্য পতির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সাধুপুত্র বলিল,

তোমার বরণিমা নাহি তার সীমা
কহিলাঙ বহু তরে,
তুমি বড় সতী আমি তব পতি
খেমা দেহ তুমি মোরে।

লেখায় কবিত্বের পরিচয় তেমন কিছু না পাওয়া গেলেও, বর্ণনার কৌশলে অনস্বীকার্য।

আলোচ্য বারমাসী গাথাটি বিরহ সঙ্গীত হইলেও মিলনের সুরটি এখানে বড়ই মধুর হইয়া বাজিয়াছে।

মলয়ার বারমাসী—

পূর্বালোচিত 'লীলা ও কঙ্ক' নামক প্রণয়গাথার নায়ক কঙ্ক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। এই কবি কঙ্কই 'মলয়ার বারমাসী' নামক বারমাসী গাথাটির রচয়িতা।

'মলয়ার বারমাসী' সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয় নাই। সম্ভবতঃ কবি কঙ্কও ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এইগাথা রচনাকালেই তাঁহাকে হয়তো গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আপন হৃদয়ের দুঃখবেদনার অনুভূতি দিয়া কবি এই রচনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বারমাসী বর্ণনায় কবির রচনা প্রশংসনীয়। 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায়' আমরা গাথাটির পরিবর্তিত রূপ পাই। কঙ্কের সময় অনুসারে মূল রচনাটি সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলিয়া মনে হয়।

নবরঙ্গপুরে বিত্তশালী এক সদাগর ছিলেন। সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে বাঁধা থাকিত। সদাগরের এক কন্যা, নাম তাহার মলয়া 'চন্দ্রের সমান কন্যা দেখিতে সুন্দর। আইন্ধার করিয়া আলো রূপের পশর॥' কন্যা নবম বৎসরে পড়িলে সাধু তাহার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে,

ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু কোন কাম করে।
বাণিজ্য করিতে যায় বৈদেশ নগরে॥

সাধু দেশে দেশে পাত্রের সন্ধান করে। ছয় বৎসর ঘুরিয়াও কোনও পাত্রই সাধুর মনোভাব হইল না।

এদিকে নবরঙ্গপুরে এক হার্মাদ ডাকাত অত্যাচার করিয়া ফিরিতে লাগিল। একদিন রাত্রে সেই ডাকাত চল্লিশজন অনুচরসহ সদাগরের পুরী ঘিরিয়া ফেলিল এবং মলয়াকে ধরিয়া লইয়া গেল। বনের মধ্যে হার্‌য়া নামে এক ডাকাত কন্যাকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। নয় বৎসরের কন্যা কান্নাকাটি করে, হার্‌য়া তাহাকে কন্যার স্নেহে পালন করে, আদর করে—কিন্তু কন্যার ক্রন্দন থামে না।

থলকুলের রাজার বসন্ত নামে এক পুত্র ছিল।
দেখিতে সুন্দর রূপ কার্তিক কুমার।
যেই দেখে সেহি জনে রূপেরে বাখানে।
রাজপুত্রের রূপ দেখ চন্দ্রকলা জিনে॥

রাজপুত্র সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। একদিন রাজপুত্র শিকারে যাইতে চাহিলেন। রাজার নিষেধ সত্ত্বেও রাজপুত্র লোকলস্কর লইয়া শিকারে যাত্রা করিল।

এদিকে একদিন ডাকাত বাহিরে গেলে সদাগর কন্যা সুযোগ বুঝিয়া বনের পথে বাহির হইল। এদিক-ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে কন্যার সহিত রাজপুত্র বসন্তের দেখা হইয়া গেল। কন্যার রূপে বসন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। কন্যা আপন পরিচয় দিয়া কুমারকে পলাইতে অনুরোধ করিল। রাজপুত্র কন্যার নিকট

আপন পরিচয় প্রদানান্তে তাহাকে তাহার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিল। আপন রাজ্যে ফিরিয়াও রাজপুত্র কন্যার কথা ভুলিতে পারিল না। রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং 'কোটালে ডাকিয়া রাজা সাধুরে বান্ধিল।' অবশেষে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া রাজপুত্র বসন্ত ও সদাগরপুত্রী মলয়ার বিবাহ হইল। ছয় বৎসর একাকী বনমধ্যে ছিল এই কারণে আপন সতীত্বের সত্যতা প্রমাণের জন্য কন্যাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হইল। কিন্তু মলয়া পরীক্ষায় সফল হইল না। বলা বাহুল্য সেই সমস্ত আজগুবি পরীক্ষা শুধু মলয়ার নির্যাতন কল্পেই স্থির হইয়াছিল। মলয়াকে বনবাসে দেওয়া হইল। বনের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মলয়ার দিন অতিবাহিত হয়। মলয়া বারমাসী গীত গাহিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে। মলয়ার এই বারমাসী গীতই এই কাহিনীটির মুখ্য অঙ্গ। এই বারমাসী গীতের মাধ্যমে আমরা পূর্ববর্ণিত ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বৎরের বিভিন্ন মাসে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মলয়ার জীবনাবর্তনের মাধ্যমে তাহার দুঃখানুভূতির পরিচয় লাভ করে। ইহার পর একদিন বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে মলয়া আবার হার্‌্যা ডাকাতের সামনে পড়িল। ইহার পর গাথাটির কিছু অংশ নাই। তারপর দেখি যে, কুমার নাগপাশে হার্‌্যাকে বাঁধিয়া আনিল এবং কন্যাকে খুঁজিবার জন্য লোকলস্কর লইয়া অশ্বারোহণে কুমার বনের মধ্যে প্রবেশ করিল—

কোথায় রইল লোক লস্কর শূন্যে ঘোড়া ছুটে।
আর বার যায় ঘোড়া গইন বনের মাঝে ॥

ইহার পর রচনাটি আর পাওয়া যায় নাই, তবে অনুমান করিতে পারা যায় যে, বনে মধ্যে কুমার ও কন্যার মিলনেই কবির রচনার অভীপ্সিত সমাপ্তি।

বৎসরের বিভিন্ন মাসের প্রকৃতির বর্ণনার সহিত মলয়ার অবস্থা ও মনোভাবের বর্ণনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

আইল আইল শাওণ মাসের ঘন বরিষণ।
দেওয়ার গর্জন শুন্যা কাঁপে নারীর মন ॥
উলকিয়া ফিনকি ঠাডা আসমান ভাইঙ্গা পড়ে।
চমকাইয়া বেস্থরা নারী আপন স্বামী ধরে ॥
গলায় সাফলার মালা আর শীতল পাটি।

ভালত বিছায়া শয্যা করি পরিপাটি ॥
বিভোলা বন্ধেরে লইয়া ঘুমে অচেতন।
এই কালে মলয়ার দুঃখ নিবারণ ॥
ভাঙ্গিয়া গাছের ডাল ধরিয়াছে শিরে।
দুরন্ত বাদল বর্ষ্যা অঙ্গ বাইয়া ঝরে ॥
ভিজা চুল ভিজা বস্ত্র মাটিত শয়ান।
এত দুঃখেতেও কেন না বাইরায়রে পরান ॥

আবার আশ্বিন মাস আসিলে মলয়ার দেশের কথা মনে পড়িতে লাগিল, শৈশবে এই দিনে দেশের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইত, কত আনন্দেই তাহার দিন কাটিয়াছে, কিন্তু এখন বনে বনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার রাত্রি প্রভাত হয়।

আইল আগুন মাস জ্বলিল আগুনি।
শিশিরে দহিল অঙ্গ কাতর হইল প্রাণী ॥
সুমুখে দারুণ শীত অঙ্গে বাস নাই।
দারুণা শীতের কাল কিমতে কাটাই ॥

অবশেষে পৌষমাসে কন্যা এক কাঠুরের নিকট আশ্রয় পাইল। কিন্তু মাঘের প্রচণ্ড শীতে কাঠুরিয়াও বন ছাড়িয়া শহরের দিকে গেল—

মাঘ মাসেতে কন্যার দুঃখ হইল ভারী।
বন ছাইরা নগরেতে চলিল কাঠুরী।

তখন নিরুপায় হইয়া মাঘ মাসের

উদাস বনেতে কন্যা থাকে একেশ্বরী।

এইরূপ বৎসরের বিভিন্ন মাসে কন্যা বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে।

বগুলার বারমাসী—

ইহাও একটি কাহিনীপ্রধান প্রেমরসাশ্রিত বারমাসী গাথা। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৪র্থ খণ্ডে এই বারমাসীটি প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৩২ খৃঃ)। গাথাটি মৈমনসিংহের গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন গাথাটির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"বগুলার বারমাসীতে সামাজিক যে সকল চিত্র দেওয়া আছে, তাহা চণ্ডীদাসের যুগের, স্ত্রীলোকের এতটা স্বাধীনতা পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগের রুচিসম্মত ছিল না, কবি তাঁহার

রচনা ফেনাইয়া দীর্ঘ করেন নাই, বরং তাঁহার লেখা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে সংক্ষিপ্ত। এই পালায় বণিক কন্যার সঙ্গে তাহার তরুণ বন্ধুর কথাবার্তার পরে অনেক ঘটনা কবি বাদ দিয়াছেন। এ গানটিতে যে ভাষা পাওয়া যায় তাহাও চণ্ডীদাসের যুগেরই ভাষা।

এই বারমাসীটি মামুলি ধরণের। ষড়-ঋতুভেদে বঙ্গমাতার রূপ ও বেশ পরিবর্তন চিরপুরাতন হইয়াও পল্লীবঙ্গকে আমাদের চোখে নূতন করিয়া তুলিয়া ধরে।

করুণরসপ্রধান এই বারমাসী বিরহগাথাটি শেষ হইয়াছে নায়ক-নায়িকার মিলনে।

গাথাটির আরম্ভে ফকিররাম কবিভূষণ রচিত শশিসেনার বর্ণনার সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। রাজকন্যা কর্তৃক ভূপাতিত লেখনী তুলিয়া দিবার অনুরোধ এবং লেখনী তুলিয়া দিবার পরিবর্তে তরুণ যুবক কর্তৃক রাজকন্যাকে বিবাহের অভিলাষ জ্ঞাপন, এইরূপ ঘটনার দ্বারা কাহিনী আরম্ভ করিবার রীতি তখনকার গ্রাম্য কবিদের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। ফকিররামের 'শশিসেনা' ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন মজুমদারের 'ঠাকুর্দাদার ঝুলির' অন্তর্গত 'পুষ্পমালা' নামক গাতিকায় আমরা অনুরূপ বর্ণনা পাই। 'বগুলার বারমাসীতে'ও দেখি রাজকন্যা বগুলার কলম পড়িয়া যায় এবং সাধুর পুত্র তাহা তুলিয়া দেয়। কিন্তু তিনবারের বার সাধুপুত্র বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল,

সত্য যদি করলো কন্যা সত্য কর তুমি।
তবেত লেখনীর কলম তুল্যা দিবাম আমি॥

এই বলিয়া রাজকন্যাকে বিবাহের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে রাজকন্যা উত্তর করিল,

শুন শুন সাধুর পুত্র আমার মিনতি।
কলম যে তুলিয়া দেওরে তুমি পরাণ পতি॥
আইজের নিশির চন্দ্ররে তারা সাক্ষী করি আমি।
জীবনে মরণে বন্ধু তুমি মোর স্বামী॥

চন্দ্র-সূর্য, পৃথিবী, পবন, পশু, পক্ষী, নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতিকে সাক্ষী মানিয়া রাজকন্যা বগুলা সাধুপুত্রকে পতিত্বে বরণ করিল। তখনকার গ্রাম্যসমাজে মানুষের জীবনের সহিত প্রকৃতির এরূপ সম্বন্ধ ছিল যে, প্রকৃতির উপাদানগুলিকে সাক্ষী মানিতে তাহার কোনও দ্বিধা হইত না।

রাজাও কন্যার ইচ্ছানুসারে সাধুপুত্রের সহিতই তাহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন বাদে বণিকপুত্র বাণিজ্য করিতে বিদেশ যাত্রা করিল। বিরহিণী বগুলার দিন কাটিতে চায় না। ইহার উপর আরেক উপদ্রব শুরু হইল। রাজকন্যার প্রণয়প্রার্থী হইয়া এক রাজপুত্র তাহার যৌবন যাচঞা করিয়া পত্র দিলে বগুলা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াও রেহাই পাইল না। বৎসরের বারটি মাস ধরিয়া রাজপুত্র কেবল তাহার নিকট পত্র পাঠাইতে লাগিল। এইভাবে বারমাসের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং তদনুযায়ী বগুলার মনের অবস্থা বারমাসী গীতের সাহায্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্বামী-বিরহিণী বগুলা অতি কৌশলের সহিত মিথ্যা আশ্বাস দিয়া রাজপুত্রকে সন্তুষ্ট রাখিতে লাগিল। কারণ সে জানিত যে, রাজপুত্র রুষ্ট হইলে তাহার বিদেশস্থিত স্বামীর অনিষ্ট ঘটাইতে চেষ্টা করিবে। রাজপুত্রের নিকট হইতে মাসে মাসে দূতী লিখন লইয়া আসে আর বগুলাও নানা অজুহাতে সময় চাহিয়া লয়।

রাজপুত্রের ব্যবহারে অতিষ্ঠ বগুলা প্রতিক্ষণে দেবতাদের নিকট স্বামীর প্রত্যাবর্তন যাচঞা করিয়া প্রার্থনা করে। শ্রাবণ মাস আসিল। তখন,

> শাওণ বাওনা মাসে আথাল পাথাল পানি।
> মনসা পূজিতে কন্যা হইল উৎযোগিনী॥
> কান্দিয়া বসাইল ঘট আপনার গিয়ে।
> প্রাণপতি ঘরে আইসে মনসার বরে॥
> চাচর চিক্কণ কেশে গিরটি মাঞ্জিল।
> নূতন পিটালি দিয়া আলিপনা দিল॥
> পঞ্চনাগ আঁকে কন্যা শিরের উপরে।
> মনসাদেবীরে আঁকে অতি ভক্তিভরে।
> শির নোয়াইয়া করে শতেক পন্নতি।
> 'বর' দাও মনসাগো ঘরে আইওক পতি॥

আশ্বিন মাস আসিলে বগুলা ভাবিতে লাগিল,

> আশ্বিন মাসেত হায়রে দুর্গাপূজা দেশে।
> অবশ্যি আইব পতি দুগ্‌গারে পূজিতে॥

এইরূপে বারমাসী গীতের মাধ্যমে গ্রাম্যকবিগণ তখনকার গ্রাম্যসমাজের রীতি-নীতি, পূজাবিধি এবং গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ফুটাইয়া তুলিতেন।

অবশেষে রাজপুত্র আর কিছুতেই অপেক্ষা করিতে রাজী নহে দেখিয়া মিথ্যা করিয়া বগুলা তাহাকে চৌদল পাঠাইতে বলিয়া কবুতরের সাহায্যে লিখন পাঠাইল। বগুলা আপন মাথার কেশে বিষ লুকাইয়া রাখিয়া শেষ মুহুর্তেও স্বামী দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিল। এদিকে বগুলার লিখন ননদিনীর হাতে পড়িল। গালমন্দ দিয়া ননদিনী তাহাকে ঘরে আটক করিল। দৈবযোগে সাধুর ডিঙ্গাও ঠিক এই সময়ে ঘাটে ভিড়িল। ভগ্নীর মুখে বগুলার লিখনের কথা অবগত হইয়া সাধু পত্নীকে বনবাসে দিল। বনে বনে বগুলা কাঁদিয়া বেড়ায়। একদিন আর এক দেশের রাজপুত্র বনের মধ্যে তাহাকে পাইয়া আপন দেশে লইয়া গেল। রাজপুত্র বগুলাকে বিবাহের অভিপ্রায় জানাইলে, ব্রত-পালনের নামে বগুলা সময় চাহিল ও ব্রতের উপকরণ হিসাবে চাহিল মেষ, মহিষ, কৈতর, কালাধলা পাঁঠা, শবরী কলা, এক লক্ষ সোনার চম্পায় গাথা মালা এবং সর্বোপরি সর্বসুলক্ষণযুক্ত এক সাধুর নন্দন। রাজপুত্র তখন সাধুদিগকে ধরিয়া আনিতে লাগিল। কোন সাধুই বগুলার পছন্দ হয় না। লক্ষ লক্ষ সাধুপুত্র বন্দী হইল।

একদিন কন্যার তবে আশা যে পুরিল।
আপন সোয়ামীরে কন্যা বন্দিত করিল॥

তখন

কন্যা কয় 'অন্য জনে আর নাই সে কাম'।
যত যত সাধুর পুত্রে দিল মুক্তি দান॥

কার্তিক মাসের শেষে ব্রতের দিন আসিলে লিখন পাঠাইয়া আপন স্বামীকে প্রকৃত তথ্য জানাইল এবং

নিশি দুপুরকালে কন্যা কোন কাম করে।
স্বামীরে লইয়া কন্যা ডিঙ্গার কাছি ছাড়ে॥

বগুয়া স্বামী লইয়া পুনরায় দেশে ফিরিল, কন্যা ও কুমারের মিলনে গাথাও সমাপ্ত হইল।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্গত বিভিন্ন গাথায় আমরা এইরূপ বারমাসী বিরহগাথার বিবরণ পাই। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণের অন্তর্গত সীতার বারমাসী ও বিভিন্ন কবিরচিত সীতা অথবা রামচন্দ্রের বারমাস্যা, মলুয়ার বারমাসী, কমলার বারমাসী, সুনাইএর

বারমাসী প্রভৃতি বিভিন্ন বারমাসীই বিরহিণী নায়িকার মুখনিঃসৃত আপন জীবনকাহিনী লইয়া রচিত। এই সকল বারমাসী গাথায় নায়িকাগণ বৎসরের বারমাসের সামাজিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনার মাধ্যমে আপন আপন জীবনের বিরহ-কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছে। এই সকল গাথার অন্তর্গত বারমাসী বর্ণনায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইলেও বারমাসী গীত গ্রাম্যসমাজে সুপ্রচলিত থাকায় একের রচনায় অপরের রচনার প্রভাব পড়িয়াছে।

বর্ণনাপ্রধান বারমাসীগাথা—

প্রেমরসজাত বিরহ ও মিলন ভাবপ্রধান গাথা :—এই শ্রেণীর অন্তর্গত বর্ণনা-মূলক বারমাসী গাথা হইল ঋতুর বারমাস, সীতার দশমাস, সখীর বারমাস, জ্ঞান বারমাস, জৈগুনের বারমাস, উদ্ধবের বারমাস, যদুনাথ বারমাস, রাধিকার বারমাস প্রভৃতি।

বর্ণনামূলক গাথাগুলিতে কাহিনী বর্ণনা অপেক্ষা বৎসরের বারমাসে প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও তদনুযায়ী নায়িকার বিভিন্ন মনোভাব বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে দেখা যায়। এই শ্রেণীর অন্তর্গত উপরোক্ত প্রেমরসাশ্রিত গাথাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

ঋতুর বারমাস—

বিরহিণী রাধা বিভিন্ন ঋতু এবং মাসকে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রাকৃতিক বিবরণ বর্ণনান্তে তাহাদের নিকট আপন অন্তরের কৃষ্ণবিরহের বেদনা নিবেদন করিতেছেন। এই বারমাসীটি ৫৮ শ্লোকে সমাপ্ত, ভণিতায় 'কমরালী' নাম দেখা যায়। কমরালী রচনাটির রচয়িতাও হইতে পারেন আবার গায়েনও হইতে পারেন। বারমাসীটির সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

পউষ মাসেতে রিত পড়এ শিশির।
কৃষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হৈল চৌচির॥
হেমন্তের রিত বহে দীঘল যামিনী।
কৃষ্ণ বিনে কিরূপে বঞ্চিমু অভাগিনী॥
মাঘ মাসেতে রিত নগুণ পড়ে জাড়।
ছাড়ি গেল প্রাণকৃষ্ণ কি গতি আমার।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ আরও কয়েকটি রাধিকার বারমাসী পাওয়া গিয়াছে। ফকিরচাঁদ দেয়দাস কর্তৃক ১২০১ মঘী, ৮ই আশ্বিনে লিপিবদ্ধ একটি

রাধিকার বারমাসীতে কৃষ্ণবিরহিণী রাধার বিরহসঙ্গীত অতি অপরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিরহিণী রাধিকা আপন সখীর নিকট হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—

চৈত্রে চাতক পাখী ডাকে পিয়া পিয়া।
বিধাতা বঞ্চিত কৈল হাতে নিধি দিয়া।
পলাশ কাঞ্চন বিকশিত নানা ফুল।
আর নি প্রাণের নাথ রে আসিব গোকুল॥
বৈশাখ মাসেতে সখি প্রচণ্ড তপন।
হেন হি সময় কৃষ্ণ নাহি বৃন্দাবন॥
ভ্রমর উড়িয়া ফুলের মধু করে পান।
শ্রীনন্দের নন্দন বিনে না রহে পরাণ॥
জ্যৈষ্ঠে নিষ্ঠুর ভানু আনলের প্রায়।
নিদাঘে বিরহ হিয়া সহন না যায়॥
দারুণ মলয়ার বাও।
না জুড়ায় শ্রীরাধা গাও॥

এইরূপে প্রতিমাসে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিরহিণী রাধার অন্তরেও বিভিন্ন বিরহভাবের উদয় হইতেছে। এই সকল বর্ণনায় বৈষ্ণব কাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

সীতার বারমাসী অথবা দশমাসীগুলিতে সরযূতীরে বনবাসে বিসর্জিতা সীতার অন্তরের গভীর শোকোচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। আবার কখনও কখনও দেখি অযোধ্যাগতা সীতা আপন সখীর নিকট বিগত জীবনের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। রামের বনবাসকালীন অবস্থা বর্ণনা করিয়া সীতা বলিতেছেন—

পৌষে প্রবল শীত বস্ত্র নাহি পাশ।
হিমালয় পর্বতে আস্তা দারুণ বাতাস।
শীতে তনু থরথর দন্তে দন্তে বাজে
তিন দিঘে তিন জন অগ্নি কর‍্যা মাঝে।

আবার, ফাল্গুনে দ্বিগুণ দুঃখ সীতার অন্তরে

রঞা রঞা পড়ে মনে অজধ্যা নগরে।
রঞা রঞা পড়ে মনে কৌশল্যা শাশুড়ী
চঞ্চল হইল মন রহিতে না পারি।

(বিশ্বভারতী পুঁথিসংগ্রহের—৬১ সংখ্যক পুঁথি
রচয়িতা—কীর্তিবাস)।

'সখীর বারমাসে' বিদেশগত স্বামীর বিরহে আকুল রমণীর বিরহবেদনা ব্যক্ত হইয়াছে। স্বামীর প্রত্যাবর্তনের আশায় পথ চাহিয়া চাহিয়া কেমন করিয়া প্রতিটি মাস কাটিয়া যাইতেছে তাহাই বর্ণনা করিয়া বিরহিণী নায়িকা সখীর নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

প্রেমরসজাত বর্ণনামূলক গাথাগুলির মধ্যে মিলনভাব প্রকাশকারী বারমাসী গাথার সংখ্যা খুবই কম। 'রসরঙ্গের বারমাস' এই জাতীয় গাথার উদাহরণ। বারমাসের বর্ণনামাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনচিত্র আঁকিয়া এই গাথা রচিত হইয়াছে। আশ্বিনের বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্রের বর্ণনায় রচনাটি সমাপ্ত।

প্রথমে আশ্বিন মাসে, শরতের ঋতু বৈসে,
সাগরে নির্মল হইল পানি।
নির্মল নক্ষত্র শশী, প্রকাশ ধবল নিশি,
জলে শোভে পদ্মকুমুদিনী॥

এইরূপে,—

দেবগণ পাখিগণ, যার কাল যেই ক্ষণ,
প্রেমানন্দে নাদে ঋতজ্ঞানী।
জন্মিয়া মনুষ্যকুলে, কালে কার্য না করিলে,
অনুশোচে ত্যজিবা পরাণে॥
ভাদ্রেত বৎসর সাঙ্গ, যে করিল প্রিয়রঙ্গ,
সে হইল্ স্বামীর সোহাগিনী॥

ভণিতায় 'মতিওল্লার' নাম পাওয়া যায়। পদসংখ্যা ৫১।

'যদুনাথ বারমাস' নামক বারমাসীটিও বিরহিণী রাধিকার অন্তরের বেদনা লইয়া রচিত। ইহার রচয়িতা হিসাবে ভণিতায় 'শ্রীধর বাণিআর' নাম পাওয়া যায়। লিপিকালের নাম নাই। এই শ্রীধর বাণিআ ও কাহিনীমূলক বারমাসী 'নীলা'-র রচয়িতা জয়ধর বাণিয়া সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি।

'রামচন্দ্রের বারমাস' নামক একটি বারমাসী গাথায় প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এই বারমাসী বর্ণনার ভিতর দিয়া সীতার বিরহে রামের অন্তরে করুণ ক্রন্দন বর্ণিত হইয়াছে। ভণিতা ও লেখকের নাম নাই। ১২০৭

মাঝাতে লিখিত। দশমাসের বর্ণনার ভিতর দিয়া রামচন্দ্রের হৃদয়ের শোক বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখের বর্ণনা প্রদানান্তে কবি বলিতেছেন—

কোন দোসে বিধাতা এ দিল এথ তাপ ॥
সিতা সোকে রঘুনাথে করয়ে রোদন।
কথ দিনে হৈল দেখা সুগ্রীবের সন ॥

অতঃপর বালী বধ ও সুগ্রীবের সাহায্যে যুদ্ধযাত্রা বর্ণনান্তে,

কার্তিক মাসে ত রাম যুদ্ধ অবসেস।
বিভিসন রাজা কৈল লঙ্কাতে বিসেষ ॥

সীতার পরীক্ষা গ্রহণান্তে সকলের দেশে ফিরিবার বর্ণনা দিয়া গাথা সমাপ্ত। গাথাটি মিলনান্ত।

বাৎসল্যরসজাত বারমাসী গাথা—

এই শ্রেণীর অন্তর্গত গাথার মধ্যে পাই নিমাইচাঁদের বারমাস, রামচন্দ্র বারমাস, কৌশল্যার বারমাস, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বারমাস প্রভৃতি।

নিমাইচাঁদের বারমাসের মধ্য দিয়া গৌরাঙ্গজননী শচীমাতার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। নিমাই সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসে চলিয়া গেলে নিমাই-এর মাতা শচীরাণী পুত্র বিরহে কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন। করুণ রসপ্রধান এই বারমাসীটির মাধ্যমে আমরা পুত্রহারা বঙ্গজননীর প্রতিমূর্তি দেখিতে পাই। এই রচনাগুলি অতীব মর্মস্পর্শী। শচীমাতা বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছেন—

হা হা পুত্র নিমাইচাঁদ দুঃখের যাদুমনি।
কিরূপে ধরাইমু চিত্ত শচী অভাগিনী ॥
মাঘল মাসেতে নিমাই ব্যাকুল হইল।
কেশব ভারতী গুরু কি না মন্ত্র দিল ॥
কি না মন্ত্র পাইয়া নিমাই হইলা উদাস।
বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে থুইয়া নিমাই যায় সন্ন্যাস ॥

সারা বৎসর এইরূপ বিলাপ করিয়া পৌষ মাস আসিল।

'পৌষ মাসেতরে নিমাই তুষেরি রন্ধন।
রান্ধন চড়াই মাত্র জুড়িল কান্দন ॥
কান্দিতে কান্দিতে মাত্র করিল শয়ন।
নিদ্রাতে আসিয়া পুত্র দেখাইল স্বপন ॥

অনুক্ষণ পুত্র চিন্তা করিতে করিতে শচী স্বপ্নের ভিতর দিয়া পুত্রকে কাছে পাইলেন। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে শচী পুত্রকে হারাইয়া আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নিমাইহারা শচীর বর্ণনা করিতে গিয়া পল্লীকবি পুত্রহারা বঙ্গজননীর মর্মব্যথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

হা হা পুত্র নিমাইচাঁদ ফাটি যায়ে বুক।
আর নি দেখিব মায়ে নিমাই চান্দের মুখ॥
কেবা হরি নিল নিমাই কে করিল চুরি।
আন্ধার হৈয়া রৈল নদীয়ার পুরী॥
সন্ন্যাসী না হৈয় বাছা বৈরাগী না হৈয়।
অভাগী মাএর চিত্ত সদাএ না জ্বালাইয়॥

'রামচন্দ্র বারমাসে' রাম বনবাসে গমন করিলে রামজননী কৌশল্যার অন্তরের বেদনাবিহ্বল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। এই রচনাতেও পুত্রহারা বাঙ্গালী জননীর গভীর শোকোচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই।

হা হা পুত্র রামচন্দ্র কমললোচন।
আর নি দেখিব মাএ এ চন্দ্রবদন॥
মাঘ মাসেত রাম গেলা বনবাস।
সেই ধরি অভাগী মাএ ছাড়ে গৃহবাস॥
দিনে দিনে খীন তনু পাঞ্জর সুখাএ।
রামের লাগিআ মাএ বর দুক্ষ্য পাএ॥

অবশেষে পৌষ মাসে রামের প্রত্যাবর্তন ও জননীর সহিত মিলনে গাথাটি মিলনান্তক বর্ণনায় শেষ হইয়াছে। রামের প্রত্যাবর্তনে রামজননী কৌশল্যার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে।

পুস্পল মাসেত রাম আইলা মাএর কোলে।
রামলক্ষ্মণ সীতাদেবী দেখিলা সকলে॥

ভণিতায় 'ছাদক আলি' নাম পাই। লিপিকারের নাম বা লিপিকাল উল্লিখিত নাই।

'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—বারমাস' ভাদ্র মাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাসে মাসে শ্রীকৃষ্ণের রূপবৈচিত্র্যের বর্ণনা লইয়া রচিত। ইহার ভণিতায়

'শ্রীধর বাণিআর' নাম পাই। রচনাটি সন ১১৮২ মঘি তারিখ ১৮ রোজ এ লিপিবদ্ধ।

ভাদ্রেতে জন্মিলেন কৃষ্ণ শুভলগ্ন তিথি।
স্নান করিতে গেল গঙ্গার ভাগিরতি॥
স্নান করিতে গেল লৈয়া গোপীগণ।
ব্রাহ্মণের করে দান অমূল্য রতন॥

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গোপ-গোপীগণের বিভিন্ন আনন্দোৎসবের বর্ণনা।

উপরিউক্ত বারমাসগুলি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য একটি বারমাসী গাথার আংশিক পরিচয় পাই আবদুল করিম সাহেবের পুঁথি বিবরণীতে। এই বারমাসীটির নাম 'মা বাপের বারমাস'। মাতৃপিতৃহীন এক অসহায় অনাথ বালকের করুণ ক্রন্দনে বারমাসীটি হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। রচয়িতার নাম বা লিপিকাল কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। গাথাটির সামান্য উদ্ধৃতি হইতেই রচনাটির অকৃত্রিম করুণ-রসাশ্রিত ভাবটি উপলব্ধি করা যায়—

আরম্ভ :—

হা হা রে দারুণ বিধি কিনা ভাবম তোরে।
অল্প বঅসের কালে ছেঁঅর কৈলা মোরে॥
বৈশাখ মাসেত মা বাপ রবির কিরণ।
অবিরত পোড়ে মোর মা বাপের কারণ॥

শেষ :—

চৈত্র মাসেত মা বাপ বৎসর হৈল শেষ।
আমারে ছেঁঅর করি রহিলা স্বর্গবাস॥
স্বর্গেতে গিআ মা বাপ নিশ্চিন্তে রহিলা।
আমরা হেন পুত্র কন্যা জলেতে ভাসাইলা॥

কবিত্বগুণ বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু অসহায় বালকের শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ অভিমান হৃদয়ে করুণরসের প্রবাহ বহাইয়া দেয়।

চাষ-আবাদের বর্ণনামূলক বারমাসী গাথা কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। 'শিবের গানের' অন্তর্গত এইরূপ বারমাসী গাথা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। আবদুল করিম সাহেবের পুঁথি বিবরণীতে 'মুরসিদের বারমাস' নামে একটি বারমাসী গাথার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা চাষ-আবাদের বর্ণনা লইয়া রচিত। একটি

হস্তলিখিত পুঁথি ও অপর একটি ছাপা পুঁথি হইতে এই বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। হস্তলিখিত পুঁথিটি ১২৩১ মাঘীর লেখা, পদসংখ্যা ৩৪। ছাপা পুঁথিতে ভণিতা নাই। হস্তলিখিত পুঁথির ভণিতাটিও সন্দেহজনক। সামান্য উদ্ধৃতি দিয়া রচনাটির পরিচয় দিতেছি—

দবে বোলে মুর্শিদ মুর্শিদ মুর্শিদ কেমন জন।
ধড়ের মাঝে আছে মুর্শিদ অমূল্য রতন॥

... ...

কার্তিক মাসেতে মুর্শিদ ধানে ভরে থির।
ধান হইআ জান তুনিআই হৈল স্থির॥
গিরতে থাকিলে কড়ি খেল্যা লইঅ ধন।
কড়ি না থাকিলেরো নিষ্ফল জীবন॥

পুঁথির বিবরণীর সামান্য উদ্ধৃতি হইতে রচনাটির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

॥ আধুনিক গাথা ॥

পূর্বালোচিত গাথা কাব্যের সহিত আধুনিক গাথাকাব্যের কোন সম্পর্ক নাই। আধুনিক গাথার প্রবর্তনকালে পূর্বালোচিত গাথাগুলি মুদ্রিত হইয়া শিক্ষিত জন-সমাজের গোচরে আসে নাই। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে দেবনাগরী হরফে 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নামক বাংলার পল্লীগাথা প্রকাশিত হইয়াছিল। জি. এ. গ্রীয়ারসন এই পল্লীগাথা মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ করিয়া সর্বপ্রথম শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং তখন হইতেই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পল্লীগাথাগুলি গ্রামাঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ করাইতে আরম্ভ করেন। এইরূপ প্রাচীন অজ্ঞাত পল্লীগাথাগুলি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সর্বপ্রথম শিক্ষিত জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই আধুনিক গাথার প্রবর্তন হয়। সুতরাং আধুনিক গাথার ঐ সকল পল্লীগাথার কোনও প্রভাব পড়ে নাই। আধুনিক গাথা ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবপ্রসূত। ইংরাজী শিক্ষিত কবিগণ ইহাদের রচয়িতা। এইজন্য আধুনিক গাথাগুলিতে আমরা শিক্ষিত সমাজ ও ব্যক্তিমানসের স্পর্শ অনুভব করি। পূর্বালোচিত পল্লীগাথাগুলি গ্রামের চিত্র, আধুনিক গাথাগুলি সহরের চিত্র। এই সকল গাথাগীত হইবার জন্য রচিত হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষিত কবিগণের ব্যক্তিমানসের সৃষ্টি এই রচনাগুলি পাঠ্য-গাথা, ভাবে এবং ভাষায় পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা পাইবার উপযোগী। আধুনিক গাথাগুলির ভাব এবং গঠন প্রণালী ইংরাজী ballad এর অনুকরণে রচিত। এখানে কাহিনীর পাত্রপাত্রীগণ অধিকাংশক্ষেত্রেই বিচার বুদ্ধি সমন্বিত শিক্ষিত বাঙ্গালী, সূক্ষ্ম বিচার ও বিবেচনার মাধ্যমে পাত্রপাত্রীগণের মনোভাব ও কার্যপ্রণালী ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু পল্লীগাথাগুলির পাত্রপাত্রীদের মধ্যে আমরা অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিমূর্তি দেখিতে পাই, পল্লীগাথার নায়কনায়িকাগণ একই ভাবের অনুপ্রেরণায় এক লক্ষ্য হইয়া কর্তব্য স্থির করিয়াছে, তাহারা বিচার-বিবেচনার সাহায্য করে নাই, আপন অন্তরের বিশ্বাসই তাহাদের কার্যের পথপ্রদর্শক। আধুনিক গাথাসাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব হইল ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা ও তজ্জনিত নব রসবোধের ফলে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য একাধিক ইংরাজী কাব্য বাংলায় অনূদিত হয়। Parnell-এর "Hermit" কাব্য একাধিক লেখক কর্তৃক বাংলা গদ্যে অনূদিত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও অদ্ভুত রামায়ণ ইত্যাদির অনুবাদক হরিমোহন গুপ্তের 'সন্ন্যাসিনীর উপাখ্যান' (১৮৫৯), লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর 'সন্ন্যাসী অথবা সুখলাভবিষয়ক রূপক' (দ্বি-স ১৮৬৪) এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সন্ন্যাসীর উপাখ্যান (১৮৭০) পার্নেলের কাব্যের অনুবাদ। গোল্ডস্মিথের 'ডেজার্টেড ভিলেজ' কবিতা অনুবাদ করিয়াছিলেন যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় 'পরিত্যক্ত গ্রাম' (১৮৬২) নামে। ইহাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। এইরূপে বিভিন্ন বাঙ্গালী লেখক কর্তৃক পোপ-এর 'এসে অন ম্যান', স্কটএর 'লে অফ দি লাষ্ট মিনষ্ট্রেল', 'লেডি অফ দি লেক', মুর-এর 'লালা রুখ', প্রভৃতি কাব্যগুলি অনূদিত হইয়া ইংরাজী Poetry ও Ballad-এর প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহার ফলে সমসাময়িক বাংলা কাব্যলেখকদিগের উপর ইংরাজী কাব্যধারার প্রভূত প্রভাব পড়ে। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে এইরূপ ইংরাজী সাহিত্য প্রভাবিত গাথাকাব্যের প্রবর্তন করেন। তাঁহার রচিত 'উদাসিনী' (১৮৭৪ খৃঃ) বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম আধুনিক গাথা। আকার, প্রকার এবং রচনাবিন্যাসে ইহা ইংরাজী ballad-এর অনুকরণ। কিন্তু আধুনিক গাথার সর্বপ্রথম রচয়িতা কুচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ (১৭৮৩-১৮৩৯)। ১২১০ সালে অর্থাৎ ১৮০৪ খৃঃ মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ 'উপকথা' নাম দিয়া একটি গাথা কাহিনী রচনা করেন। ইহার কিছুদিন বাদে তিনি আরও একটি গাথা রচনা করেন। হরেন্দ্রনারায়ণ সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচনা দুইটির ভিতর একটির উপাখ্যানভাগ তিনি তাঁহার অধীন কর্মচারী জয়নাথ ঘোষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গল্পটি কোনও ফার্সী গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অপর কাহিনীটি তিনি কোনও রমণীর মুখে শ্রবণ করেন। এইরূপে বিভিন্ন লৌকিক কাহিনীর মিশ্রণে কাহিনীগুলি রচিত হইয়াছিল। সুশিক্ষিত মহারাজা কাহিনীগুলির উপর বিভিন্ন ইংরাজী কাব্যের প্রভাব আনিয়া ফেলিয়াছেন, রচনাগুলিতে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রভূত প্রভাবও লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই রচনা দুইটি গীত হইবার জন্য রচিত হয় নাই, কাব্য সৃষ্টিই

রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে হরেন্দ্র নারায়ণ রচিত 'উপকথা' নামক গাথা কাহিনী দুইটির উপাদান লৌকিক হইলেও, রচনা দুইটিকে প্রাচীন পল্লীগাথান্তর্ভুক্ত না করিয়া আধুনিক গাথা সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করাই অধিকতর সঙ্গত। ১৮০৪ খৃঃ পূর্বে রচিত ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবপূর্ণ এইরূপ গাথা কাহিনী আর পাওয়া যায় নাই। সুতরাং মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণই সর্বপ্রথম আধুনিক গাথা রচয়িতার সম্মানলাভের অধিকারী। কিন্তু ১৯১৮ খৃঃ পূর্বে তাঁহার রচনার পরিচয় শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। ইহারা পুঁথিবদ্ধ অবস্থায় লোকচক্ষুর অগোচরে পড়িয়াছিল। ১৩২৪ সালের 'মানসী ও মর্মবাণীতে' কালীপদ মিত্র সর্বপ্রথম একটি কাহিনীর বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর ১৩৩৪ ও ১৩৩৬ সালে শরৎচন্দ্র ঘোষাল কাহিনী দুইটির সম্পূর্ণ মুদ্রিত রূপ প্রদান করেন। অতএব, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বাংলা আধুনিক গাথার সর্বপ্রথম রচয়িতা হইলেও সর্বপ্রথম প্রবর্তনকারী নহেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮ খৃঃ) কাব্যটি গাথাকাব্যের আকারে ও প্রকারে রচিত হইবার প্রয়াসে থাকা সত্ত্বেও ইহা প্রকৃত গাথা কাব্যের রূপ পায় নাই। পদ্মিনী উপাখ্যানে যে কাহিনী অংশ স্থান পাইয়াছে, দেশে প্রচলিত জনশ্রুতি তাহার সমর্থক, কিন্তু রচনাভঙ্গী গাথাকাব্যের উপযোগী নহে। ইহার কিছুকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একটি গাথাজাতীয় কবিতা লিখিয়াছিলেন 'ললিতা' (১৮৫৬) কিন্তু ইহার অনুসরণ কেহ করেন নাই এবং নবপ্রবর্তিত গাথা-কাব্যের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'উদাসিনী' (১৮৭৪ খৃঃ) নামক গাথাকাব্য হইতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গাথার সর্বপ্রথম প্রবর্তন হয়। 'উদাসিনী' কাব্যে রচয়িতার নাম ছিল না। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের উক্তি হইতেই আমরা 'উদাসিনী' কাব্যের রচয়িতা হিসাবে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নাম পাই। রচনা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। আপন ভোলা সুশিক্ষিত এই ব্যক্তিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন। 'উদাসিনীর' আখ্যানবস্তু কতকটা পার্নেলের 'দি হার্মিট' কাব্যের অনুকরণে কল্পিত। অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, নবীনচন্দ্র সেন, ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিগণ গাথাকবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী রচিত গাথাগুলি প্রকাশিত হইবার পর হইতেই ইংরাজী শিক্ষিত কবিগণের ভিতর বিভিন্ন প্রকারের আধুনিক গাথা রচনার সাড়া পড়িয়া যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন কবি কর্তৃক বিভিন্ন বিষয় লইয়া বহু আধুনিক গাথা রচিত হয়। আধুনিক গাথা রচয়িতা হিসাবে অক্ষয়কুমার বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, জগচ্চন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৮৩ খৃঃ) গাথাকাব্যের আকারে ও প্রকারে রচিত হইবার প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও গীকিকাব্যপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়াই পরবর্তী কালের গীতিকাব্যের সূচনা। এইরূপে আধুনিক গাথা-কবিতার ক্রমপরিণতিতে একদিকে আমরা গীতিকাব্যগুলিকে পাই—অপরদিকে পাই রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র কবিতাগুলি এবং 'বিদায়-অভিশাপ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য।

এই সকল আধুনিক গাথাকাব্য বা কবিতাকে উনবিংশ শতাব্দীতে কাব্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যায়।

এখন কতকগুলি উল্লেখযোগ্য আধুনিক গাথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পল্লীগাথাগুলির সহিত ইহাদের রচনাভঙ্গী ও উপস্থাপনার পার্থক্য প্রদর্শনের চেষ্টা করা যায়।

হরেন্দ্রনারায়ণের 'উপকথা'—

কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত 'উপকথা' দুইটি আনুমানিক ১৮০৪—১৮০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র হরেন্দ্র-নারায়ণ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৫৩ বৎসরকাল রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময় কোচরাজ্যে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের চর্চা বিশেষভাবে করিতেন। ইনি নিজে এবং সভাকবিদিগের দ্বারা বহু বাংলা আধ্যাত্মিক গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং মহাভারত, রামায়ণ, স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মোত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং হিতোপদেশ এই গ্রন্থগুলির কাব্যানুবাদ করাইয়াছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত গাথা দুইটির নাম এক ('উপকথা') হইলেও, উভয়ের

আখ্যানবস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উভয় কাহিনীই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের মিশ্রণে রচিত।

একটি কাহিনীর পরিচয় দানকালে কালীপদ মিত্র বলিয়াছেন—

"কুচবিহারে অবস্থানকালে আমি রাজপুস্তকাগারে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত একখানি সুবৃহৎ বাংলা কাব্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাই। এই কাব্যখানির নাম 'উপকথা'। পাণ্ডুলিপিখানি এতই জীর্ণ যে, আমাকে অতি সাবধানে ইহা পাঠ করিতে হইয়াছিল। শতাব্দী পূর্বে কোচবিহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এই কাব্যপাঠে অবগত হইতে পারা যায়।

এই পুঁথির মলাট দুইটিতে চারিটি চিত্র আছে। প্রথমটিতে রাজা ও মন্ত্রীর কথোপকথন ও দ্বিতীয়টিতে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের মৃগয়া এবং একই অশ্বপৃষ্ঠে রাজপুত্র ও স্বপ্নবতীর আরোহণ চিত্রিত হইয়াছে।

মহারাজ এই কাহিনী এক রমণীমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন। কাহিনীটির সহিত পাঞ্জাব, বাংলা ও কাশ্মীরে প্রচলিত বিভিন্ন লোকগাথার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আরব্য উপন্যাসেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ইংরাজী কাব্য, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল', ইত্যাদিরও প্রচুর প্রভাব কাহিনীটির উপর পড়িয়াছে। বিভিন্ন লোকগাথান্তর্গত কাহিনী সুশিক্ষিত হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতিভাস্পর্শে, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া আধুনিক গাথার রূপ নিয়াছিল। দুইটি কাহিনীই বৃহৎ এবং জটিল ঘটনার আবর্তনে পড়িয়া লোকগাথার বিশিষ্টতা হারাইয়াছে। রচনাগুলিতে বিশিষ্ট শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত কাহিনীগুলিতে অশ্লীলতা দোষও দৃষ্ট হয়। রচনা দুইটিতে মাঝে মাঝে কোচবিহারে প্রচলিত গ্রাম্যভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য কাহিনীটি মহাদেবের বর্ণনাদ্বারা আরম্ভ।

কলিঙ্গদেশে চন্দ্রোপমকান্তি চন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ধার্মিক এবং অসীম ক্ষমতাশালী রাজা একদিন মন্ত্রীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন যে, যদি একের পুত্র এবং অপরের কন্যা জন্মে তবে উভয়ের বিবাহ দিবেন, আর যদি উভয়েরই পুত্র জন্মে তবে তাহাদের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিয়া দিবেন। যথাসময়েই রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই পুত্র লাভ করিলেন এবং

প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে খেলাধূলা করিয়া, শিক্ষাদীক্ষা লইয়া দুইজনে বড় হইলেন। দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন খুবই দৃঢ় হইল। যৌবনে উপনীত হইলে সিন্ধুরাজ তনয়ার সহিত রাজপুত্রের এবং একটি গুণযুক্তা, রূপবতী, নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞা কন্যার সহিত মন্ত্রীপুত্রের বিবাহ হইল। একদিন রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের সহিত মৃগয়ায় গিয়াছেন সেই সময়ে—

হেমময় মৃগ এক, সেই স্থানত আসিলেক
দেখিলন্ত তাক সর্বজন।

রাজপুত্র মৃগটি পাইবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু—

সে যে মৃগ মায়াময়
অতিশয় বিক্রম করিয়া।
পবন সঞ্চারে অতি, করিলেক ঘোর গতি
নরনাথ সুত অগ্র দিয়া।

রাজপুত্র তখন মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সিন্ধুরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রীপুত্রও বন্ধুকে অনুসরণ করিলেন। সিন্ধুরাজা জামাতা ও জামাতৃবন্ধুর যথেষ্ট আপ্যায়ন করিলেন। মন্ত্রীপুত্র বন্ধুর দেহরক্ষী হিসাবে রাত্রে রাজপুত্রের শয়নগৃহের বহির্ভাগে শুইয়াছিলেন তখন দেখিলেন যে, সিন্ধুরাজকন্যা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া উপপতি সম্ভাষণে চলিল। সিন্ধুরাজকন্যা যে অসতী তাহা দেখাইবার জন্যই সেই মায়ামৃগ তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিয়াছিল। রাজপুত্রী বাহির হইয়া গেলে এক তস্কর শয়নগৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু অনতিকাল পরেই রাজকন্যা ফিরিয়া আসিয়া শাণিত অস্ত্রের দ্বারা রাজপুত্রের মুণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনরায় জারসম্ভাষণে চলিল। মন্ত্রীপুত্র ও গৃহে লুক্কায়িত চোর উভয়েই এই দৃশ্য দেখিল। রাজপুত্রীর এই বীভৎস আচরণে উপপতির অদ্ভুত পরিবর্তন হইল। রাজপুত্রীকে নির্দয়ভাবে কশাঘাত করিয়া সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেল। ইহার পর রাজকন্যার কপট ক্রন্দন, মন্ত্রীপুত্রের উপর দোষারোপ, চোরের সাক্ষ্যে মন্ত্রীপুত্রের নির্দোষিতা প্রমাণ ও রাজপুত্রীর স্বামিহননে সিন্ধুরাজের বিষাদ বর্ণিত হইয়াছে। রাজপুত্রীর ব্যবহার দেখিয়া মন্ত্রীপুত্র আপন পত্নীকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্বশুরালয়ে উপনীত হইলেন। আসিবার সময় বন্ধুর শবদেহ সঙ্গে লইলেন।

মন্ত্রীকন্যা আপন গুরুপত্নীর বিদ্যাপ্রভাবে সমস্তই অবগত হইলেন এবং গুরুপত্নীর নির্দেশক্রমে শ্মশানে ইষ্টদেবের অর্চনা ও পতি-বন্ধুর হিতার্থে দেবীর উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, দেবীর দয়ায় রাজপুত্রের প্রাণ ফিরাইয়া আনিলেন। দুই বন্ধুর আনন্দের সীমা রহিল না। মন্ত্রীকন্যাও আপন সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

একদিন রাত্রে অত্যধিক গরমে রাজপুত্র উদ্যানে আসিয়া শয়ন করিলে, মধুমালার গল্পের ন্যায়, চিত্রমালা, চন্দ্রকলা প্রভৃতি চারিটি অপ্সরা আকাশপথে যাইবার কালে রাজপুত্রকে দেখিল এবং স্বপ্নে রাজপুত্রকে স্বপ্নবতীর রূপ দেখাইল। স্বপ্নে স্বপ্নবতীর রূপ দর্শনে রাজপুত্র তাহাকে লাভ করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং দিন দিন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধুর অবস্থা দর্শনে এবং ইহার কারণ অবগত হইয়া মন্ত্রীপুত্র গুণবতী ও পতিব্রতা পত্নীর নির্দেশক্রমে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া স্বপ্নবতীকে আনিয়া রাজপুত্রের সহিত মিলিত করিলেন। রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র অতঃপর পত্নীদ্বয়কে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বামিহন্ত্রী রাজকন্যার উপযুক্ত শাস্তি হইল।

আখ্যানবস্তু বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে রচিত হওয়ার দরুণ গাথা-কাব্যের সহজ, সরল গুণ রচনাটিতে পাওয়া যায় না। রাজার অমাত্যপ্রীতি, বান্ধবের প্রতি বান্ধবের অচ্ছেদ্য অনুরাগ ও স্বার্থত্যাগ, সতী স্ত্রীর স্বামী ও গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা, ইত্যাদি এই কাহিনীর অন্তর্গত শিক্ষণীয় বিষয়। পাত্র-পাত্রীর রূপবর্ণনায় রচয়িতা প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত উপমাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন গাথাকাহিনী হইতে উপাদান সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও রচনাটি যে আধুনিক গাথার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে উপরোক্ত আলোচনা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়।

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত অপর 'উপকথা'-টিও উপরোক্ত কাহিনীর ন্যায় বৃহৎ ও জটিল ঘটনাবলী লইয়া রচিত। আলোচ্য গাথার উপাখ্যানভাগ মহারাজ তাঁহার অধীন কর্মচারী জয়নাথ ঘোষের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন। কাহিনীর মূল উপাদান কোনও ফার্সী গ্রন্থ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়।

এখানেও দেখি মঙ্গলাচরণ ও শিববন্দনা করিয়া কাহিনী শুরু হইয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, মহারাজ শিবভক্ত ছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারে সাগরদীঘি নামে এক প্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার পশ্চিম পারে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাহা বর্তমান রহিয়াছে।

প্রথম কাহিনী কলিঙ্গ রাজপুত্রকে লইয়া। আলোচ্য কাহিনীটি মহাচীনের রাজপুত্রকে লইয়া রচিত। কাহিনীর উপস্থাপনায় বেশ নূতনত্ব দেখা যায়।

মহাচিন দেশ বাসি রাজা য়েকজন।
নিত্য জপ নামে ক্ষ্যাত দুর্দ্দন্ত দলন॥

রাজার মৃত্যুর পর—

তার পুত্র দেশে রাজা হৈইল সর্ত্তর
মদনসুন্দর নাম ক্ষ্যাত অবনিত।
গুণালয় গুণিগণ বর্দ্ধন সুনিত॥

বৃদ্ধ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া গুণবান রাজপুত্র রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। একদিন—

দিবস চতুর্থভাগে বিড়ল স্থানত।
বসিয়া আছয় শে জে রাজা সেকালত॥
(কুচবিহারে প্রচলিত দেশী ভাষা লক্ষণীয়)

বসিয়া থাকিতে থাকিতে রাজা মন্ত্রীকে ডাকিবার জন্য একজন অনুচর পাঠাইলেন। এদিকে মন্ত্রী আসিতে না আসিতেই আলস্যে রাজার নিদ্রার আবেশ হইল। তখন তিনি শয়নাগারে গিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। মন্ত্রিবর আসিতেই—

তার পদশব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল ভূপের।
বাড়িল প্রবাহ অতি রাজার কোপের॥

ক্রুদ্ধ রাজা মন্ত্রীর মাথা কাটিবার আদেশ দিলেন। কিছু বুঝিতে না পারিয়া মন্ত্রী বলিলেন—

অখণ্ড প্রচণ্ড আজ্ঞা নরেন্দ্র তোমার।
আদেসে আইলাম আমী কি দোস আমার॥

রাজা তখন মন্ত্রীকে তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। স্বপ্নে রাজা একটি রম্য

পুষ্পবনে এক অতি লাবণ্যবতী কন্যাকে দেখিয়াছেন এবং কন্যার রূপবর্ণনা করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন—

সেহি আসি দাড়াইল মোর সন্নিধানে।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বলিতে বচনে॥
সেহি সময়ত তব চরণ সবদে।
ভাঙ্গিল আমার নিদ্রা পড়িলাম প্রমাদে॥
তুমি জদি সেকালত না আসিলা হয়।
তবে কি সেজন সঙ্গে নহে পরিচয়॥
সেহি ক্রোধে তব শির কাটিতে আদেশ।
দিলাম মন্ত্রী হে বলিলাম সব সেষ॥

রাজার এই কথা শুনিয়া তখন মন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়াই হউক তিনি এই কন্যাকে আনিয়া দিবেন। কন্যার রূপ বর্ণনায় মার্জিত রুচির ছাপ ও সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। মন্ত্রী নিজগৃহে ফিরিয়া সুনিপুণ চিত্রকর দ্বারা রাজার বর্ণনানুসারে এক কন্যার চিত্র অঙ্কন করাইলেন। চিত্র রাজাকে দেখাইলে তিনি আনন্দিত হইয়া মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, 'এহি মত সে জনার বটে রূপচয়'। মন্ত্রী অতঃপর মহারাজার নিকট বিদায় লইয়া চিত্রসহ কন্যার সন্ধানে চলিলেন। বহু পথিক, বণিক, ইত্যাদি চলাচল করে এইরূপ একস্থান বাছিয়া মন্ত্রী এক গৃহ নির্মাণ করাইলেন এবং

বণিক পথিকগণে, ডাকী আণী অনুক্ষণে
সে জে চিত্র দেখায় আনিয়া॥

চিত্র দেখাইয়া মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন এই সুন্দরীকে কেহ কোথাও দেখিয়াছে কি না। কিন্তু কেহই তাহাকে দেখে নাই এই কথা শুনিতে শুনিতে মন্ত্রী ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন. এমন সময় একদিন এক সাধু বলিলেন তিনি এই সুন্দরীকে দেখিয়াছেন—কাম্বোজদেশের রাজা 'জসোধ্বজ' তনয়া দেখিতে ঠিক এই চিত্রের মত। মন্ত্রী তখন মহারাজের নিকট সব কথা জানাইয়া শুভদিনে শুভক্ষণে কাম্বোজনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নগরে পৌছিয়া লোকমুখে জানিলেন রাজার দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কনিষ্ঠা বিবাহ করিবে না, সে যৌবনে যোগিনী। মন্ত্রী আরও অনুসন্ধানে থাকিয়া কনিষ্ঠার বিবাহে অনিচ্ছার কারণ অবগত হইলেন। একদিন রাজকন্যা উদ্যানের শোভা দেখিতে দেখিতে এক

বনের মাঝে আসিয়া পড়েন। সেই জঙ্গলে এক গাছে এক কপোতদম্পতী ছিল। তাহাদের দুইটি ডিম্ব। হঠাৎ বনমধ্যে প্রচণ্ড দাবানল জ্বলিয়া উঠিলে, কপোতীকে সম্বোধন করিয়া কপোত পলাইবার পরামর্শ দিলে প্রাণাধিক ডিম্ব দুইটিকে ফেলিয়া যাইতে কপোতী রাজী হইল না। কপোত কপোতীকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলাইল। কপোতী দাবানলে জ্বলিয়া মরিল। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজকন্যা পুরুষজাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

না হেরিব পুরুসের বদন কখন।
না করিব বিভা আমী সত্য এ বচন॥

সেইদিন হইতে রাজকন্যা যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়াছেন।

বুদ্ধিমান মন্ত্রী তখন নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর চিত্র নগরে বিলাইতে লাগিলেন। চিত্রের সৌন্দর্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ। ক্রমে রাজকন্যাও এই চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং খোঁজ নিয়া জানিলেন এক যোগী এই চিত্রকর। বলা বাহুল্য ছদ্মবেশী মন্ত্রীই এই যোগী। রাজকন্যা মাতার নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, রাজ্যে এক সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়া যোগী চিত্রকর দ্বারা মন্দিরগাত্রে বিচিত্র চিত্রনির্মাণ করাইলে তিনি খুব আনন্দিতা হইবেন। রাণীর মুখে কন্যার বাসনা শুনিয়া রাজা যোগীকে আনাইতে লোক পাঠাইলেন। মহারাজের অনুরোধক্রমে যোগী মন্দিরগাত্রে বিচিত্র চিত্ররাজি অঙ্কন করিতে লাগিল। চিত্রকর মন্দির গাত্রে নানাবর্ণ চিত্রের মাঝে এক ময়ূরদম্পতীর চিত্র আঁকিল। তাহার পাশে চিত্রের সাহায্যে দেখাইল এক নদের জলে বাসা ভাঙ্গিয়া চারি ডিম্বের সহিত ময়ূর মরিয়া গেল, কিন্তু ময়ুরী পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজা মদনসুন্দর বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া চাহিয়া আছেন। রাজনন্দিনী মন্দিরগাত্রের চিত্রদর্শনে আসিয়া নানা চিত্র দেখিয়া আনন্দিতা হইলেন। অবশেষে ময়ূরদম্পতী ও মদনসুন্দরের চিত্রের সম্মুখে আসিয়া রাজকন্যা—

সেহি স্থানে দেখে এক পুরুষ সুন্দর।
মদনমোহন রূপ অতি মনোহর॥

চিত্রে মদনসুন্দরের রূপদর্শনে রাজকন্যা মুগ্ধ হইলেন। যোগীর নিকট চিত্রের মর্মকথা শুনিতে চাহিলে যোগীবেশী মন্ত্রী এই সুযোগে রাজকন্যাকে মদনসুন্দরের পরিচয়, গুণাবলী ইত্যাদি প্রদান করিয়া বলিলেন, একদিন মৃগয়ায় গিয়া মদনসুন্দর এই ময়ূরদম্পতীকে দেখিতে পান এবং হঠাৎ নদের জলে বাসা ভাসাইয়া নিলে রাজপুত্র

দেখেন ময়ূর সন্তানের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া চারি ডিম্বের সহিত ডুবিয়া মরিল, কিন্তু ময়ূরী পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। রাজপুত্র ময়ূরীর নির্দয়তা দর্শনে সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

যাজি হনে না হেরিব নারির বদন।
না করিব বিভা যার সত্য এ বচন॥

বলা বাহুল্য, মন্ত্রী এই কাল্পত কাহিনীদ্বারা রাজকন্যাকে মদনসুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। রাজকন্যা মদনসুন্দরকে পাইবার জন্য অস্থির হইলেন, অবশেষে লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া রাণীর নিকট মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রেমেরই জয় হইল। রাজা যোগীবেশী মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কন্যার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যেমন করিয়াই হউক এই বিবাহ ঘটাইতে হইবে নতুবা রাজকন্যার প্রাণরক্ষা করা যাইবে না। মন্ত্রী তো ইহাই চান। মদনসুন্দর ও রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের বর্ণনা অতিশয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিবাহিত জীবনের বর্ণনায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত কুরুচিপূর্ণ বর্ণনার প্রভাব পড়িয়াছে।

রাণী লইয়া রাজা মদনসুন্দর সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন রাজার মুখে রাণী মন্ত্রীর কৌশলের কথা শুনিলেন এবং রাণীর ইচ্ছানুসারে রাজা আপন রাজ্যে ঐরূপ একটি মন্দির নির্মাণ করাইলেন। যে চিত্রকর মন্দিরগাত্রে ছবি অঙ্কন করিল তাহার কন্যা একদিন মন্দির গাত্রে এক মজুরের চিত্র আঁকিয়া রাখিল। রাজা মন্দির দর্শনে আসিয়া মজুরের চিত্রকে প্রকৃত মজুর ভাবিয়া তীর ছুঁড়িতেই দেওয়ালে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল, রাজা আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন। রাজার কার্য দেখিয়া চিত্রকরনন্দিনী হাসিয়া উঠিলে, রাজা তাহার হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চিত্রকরনন্দিনী নির্বুদ্ধি বলিয়া রাজাকে উপহাস করিলে রাজা অপমানিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়াই হউক এই নারীকে বিবাহ করিবেন। চিত্রকরকে খবর দিয়া একদিন 'শুভক্ষণে বিভা তাকে করিল রাজন।' এক সুন্দর পুরী নির্মাণ করাইয়া চিত্রকরনন্দিনী চিত্ররেখা সখী চন্দ্রকলার সহিত সেখানে রহিল। অতঃপর রাজা কর্তৃক চিত্ররেখার বুদ্ধি পরীক্ষা এবং রাণীর সাহায্যে চিত্ররেখার সমস্যা সমাধান এবং চিত্ররেখা কর্তৃক রাণীর সমস্যা সমাধানের বিস্তারিত বর্ণনা।

অবশেষে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, রাণী ও চিত্ররেখা উভয়েই সমান বুদ্ধিমতী, তুজনকেই একভাবে রাখা উচিত।

এহি ভাবি নিজচিত্তে নরেন্দ্র তখনে।
ডাকিয়া একত্র করিলেন তুয়োজনে॥
তুহাক মিলন করি দিল নরেশ্বরে।
তুইয়ো সমভাবে রৈল সেবি নৃপবরে॥

কাহিনীও সমাপ্ত হইল। হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত এই গাথাকাহিনী তুইটি হইতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গাথার সূত্রপাত।

উদাসিনী—

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'উদাসিনী' নামক গাথাকাব্যটি হইতেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গাথার প্রবর্তন শুরু হয় একথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই হিসাবে আধুনিক গাথা সৃষ্টির ইতিহাসে 'উদাসিনী' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কাহিনীটি দশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গের দৃশ্য কিন্নর-কানন, সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর। গভীর অরণ্যে পথহারা এক পথিকের সহিত বনদেবীর সাক্ষাতে কাহিনী শুরু। পথিক ও বনদেবী কিছুদূর গিয়া এক তরুণীকে চিতাগ্নিতে আত্মবিসর্জনে উদ্যতা দেখিয়া তাহার এইরূপ কার্যের কারণ জানিতে চাহিলে, তরুণী তখন আপন জীবনের করুণ কাহিনী বিবৃত করিতেছে। এই তরুণীই কাহিনীর নায়িকা সরলা।

বিদর্ভের রাজ্যচ্যুত রাজা বিজয়ের কন্যা একদিন পীড়িত পিতার পথ্যানুসন্ধানে বাহির হইয়া ঘটনাচক্রে গঙ্গাতীরে বিশ্রাম লাভকালে বানের জলে ভাসিয়া যায় এবং যুবক সুরেন্দ্র কর্তৃক মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। সুরেন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া সরলার পিতা দেহত্যাগ করিলে সুরেন্দ্র মৃতদেহের সৎকার সাধন করে এবং সরলার সহিত অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া কার্যব্যপদেশে চলিয়া যায়। কবি সরল ও সুরেন্দ্রের প্রেম স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করেন নাই, কেবলমাত্র আভাস দিয়া কাজ সারিয়াছেন। অসহায়া সরলা মৃতপিতার উপদেশানুসারে সে দেশের রাজার নিকট গিয়া পিতার পত্র দিলে, রাজা তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিল। পত্রে সরলার পরিচয় বৃত্তান্ত ছিল। রাজঅন্তঃপুরে সুরেন্দ্র-বিরহে

সরলার দিন কাটে। গাথাকাব্যের করুণ-রস এখানে পাই। একদিন রাজোদ্যানে সরলার সহিত সুরেন্দ্রের মিলন হইল এবং রাত্রি গভীর হইবার পূর্বেই সুরেন্দ্র গোপনে উদ্যান পরিত্যাগ করিল। পরদিন সরলা খবর পাইল উদ্যান হইতে পলাইবার সময় সুরেন্দ্র রাজপুত্রের হাতে ধরা পড়িয়াছে এবং শীঘ্রই তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। এই রাজপুত্রের সরলার উপর লোভ ছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রে অনুরক্তা সরলা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। নিরুপায় হইয়া অবশেষে সরলা সুরেন্দ্রের প্রাণরক্ষার বিনিময়ে রাজপুত্রকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। রাজার ছেলের সঙ্গে সরলার বিবাহ স্থির হইলে রাণী সরলাকে তাহার পিতার পত্র পড়িতে দিল। আপন পরিচয় জানিয়া সরলার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিবাহরাত্রিতে সুরেন্দ্র-বিরহে কাতরহৃদয়ে সরলা উদ্যানে আসিয়া অশোক বৃক্ষে সুরেন্দ্রের লেখা পড়িয়া জানিল যে, সুরেন্দ্র তাহার জন্য বিবাগী হইয়াছে। সরলাও তখন হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া প্রিয়তমের সন্ধানে চলিল। এইখানে নায়িকা সরলার ভিতর আমরা প্রাচীন প্রণয়গাথার নায়িকার রূপ পাই। এ কলঙ্ক প্রেম সরলাকে সমস্ত সুখ, ঐশ্বর্য ও নিশ্চিন্ততার মধ্য হইতে টানিয়া পথে বাহির করিয়াছে। পথে যাইতে যাইতে সরলা একস্থানে দেখিল মানুষের হাড় পড়িয়া আছে এবং তাহার পাশেই সুরেন্দ্রের অঙ্গুরীয় দেখিয়া সে ধারণা করিল যে, সেগুলি সুরেন্দ্রেরই অস্থি। তাহার জন্যই সুরেন্দ্র আজ মৃত্যুবরণ করিয়াছে। সুরেন্দ্রবিহীন জীবন সে কি করিয়া কাটাইবে, তাই সরলা চিতাগ্নিতে জীবন বিসর্জন দিতেছিল এমন সময় পথিক ও বনদেবীর আবির্ভাব।

সরলার বৃত্তান্ত শুনিয়া বনদেবী তাহাকে প্রাণবিসর্জন হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে লইয়া পথিকের সহিত হিমালয় পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোমুখীতে আসিয়া তাহারা গভীর তপস্যা নরত এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল। এই সন্ন্যাসীই সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রকে দেখিয়াই সরলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর উপর সরলাকে দেখিবার ভার দিয়া বনদেবী পথিকের সঙ্গে জলপাত্রের সন্ধানে গেলেন। সন্ন্যাসীবেশী সুরেন্দ্র মূর্চ্ছিতা সরলাকে দেখিয়া আপন হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে কহিল—

> যে আশেই আসা তব—অভাগা ছলিতে,
> অথবা দ্বিগুণ শোক প্রবল করিতে,
> কিছুতে কিছুতে আমি করিব না ভয়।
> যখন সরলারূপে হয়েছ উদয়।

সরলার জ্ঞান ফিরিলে উভয়ের মিলন হইল।

পথিক ও বনদেবীর বর্ণনার উপর পার্নেলের 'হারমিট' কাব্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী অক্ষয়চন্দ্রের অনুসরণে কতকগুলি গাথাকাব্য রচনা করেন। 'উদাসিনী' অপেক্ষা এই রচনাগুলিতে গাথাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যকৈশোরক যুগের অধিকাংশ রচনাই গাথাকাব্য বা গাথাকবিতা। কয়েকটি গাথাকবিতায় বিহারীলালের প্রবর্তিত তিন মাত্রার ছন্দ দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ডে বলিয়াছেন—

"পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরক কবিতাগুলির জন্য লজ্জাবোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যপ্রতিভার অকাল-বসন্তে এই ফল প্রত্যাশাবিহীন বনফুল-মুকুল-সম্ভার বৃথাই দেখা দেয় নাই"

সত্যই রবীন্দ্রনাথ রচিত গাথাকাব্য ও গাথাকবিতাগুলি ভাবে ও ভাষায় যে অভিনবত্বের সূচনা করিয়াছিল তাহা সে সময়ের বাংলা সাহিত্যে অপ্রত্যাশিত। তাঁহার রচনার সহজ, সরল ও অকৃত্রিম ভাবসম্পদে আধুনিক গাথাগুলিকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবার মর্যাদা প্রদান করিয়াছে। তাঁহার রচিত গাথাকাব্য 'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী'-র ছন্দ ও কাহিনী অংশে তাঁহার পূর্ববর্তী কবি অক্ষয়চন্দ্র ও বিহারীলালের অনুকরণ লক্ষিত হইলেও, তাঁহার গাথা কবিতাগুলি অপূর্ব সৃষ্টি। মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ছোট ছোট এই কাহিনীগুলির ভিতর গাথাসাহিত্যের বিশিষ্ট ভঙ্গী রক্ষিত হইয়াছে। এই গাথা কবিতাগুলিতে ইংরাজীকাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

'বনফুল' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত রচনা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যদিও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'বনফুল' আট সর্গে বিভক্ত। আকার, প্রকার ও কাহিনীর বিচারে ইহা একটি প্রণয় গাথাকাব্য। কাহিনীর শুরুতে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী'-র অনুসরণ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-এর এইসকল গাথাকাব্যের গঠনরীতি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তী কালে তাঁহার নবউন্মেষ-শালিনী প্রতিভাস্পর্শে গীতিনাট্যের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

'বনফুল'-এর প্রথম ও শেষ দৃশ্যে তুষারশুভ্র হিমালয়ের বর্ণনা। পিতা ও কন্যা হিমালয় শিখরে এক কুটীরে বাস করে। পিতা ছাড়া কন্যা আর দ্বিতীয় মানব দেখে নাই। এই অংশে কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও সেক্সপীয়ারের 'মিরান্দার' প্রভাব পড়িয়াছে। পিতার মৃত্যুদিবসে কমলা বিজয়কে প্রথম দেখিল। তাহার জীবনে এই প্রথম সে তৃতীয় মানবের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিজয় কমলাকে লোকালয়ে লইয়া গেল এবং ভালবাসিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। কমলা কিন্তু বিজয়ের এই ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারিল না, সে বিজয়ের বন্ধু নীরদকে মনে মনে ভালবাসিল। এদিকে নীরজা বিজয়ের প্রতি আসক্ত। নীরদ কমলার এই অসঙ্গত প্রেমে বাধা দিয়াও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। বিজয় কমলার মনোভাব অবগত হইয়া ঈর্ষার জ্বালায় অবশেষে নীরদকে হত্যা করিল। নীরদের দেহের সৎকার করিয়া কমলা বিধবাবেশ ধারণ করিয়া পুনরায় হিমালয় বক্ষে ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেখানেও সে শান্তি পাইল না। নীরদের স্মৃতি তাহার চিত্তকে দহন করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন তুষারশিলায় পদস্খলিত হইয়া কমলা দেহত্যাগ করিল।

কবি এই গাথাকাব্যটিতে অসঙ্গত প্রেমের বিষবহ পরিণাম প্রদর্শন করিয়াছেন। এইখানেই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত রচয়িতার মধ্যে পার্থক্য। গ্রাম্য গাথাচয়িতাগণ নিষিদ্ধ প্রেমকেও অনেকস্থলে অবলীলাক্রমে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কবিকাহিনী :—রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত রচনাবলীর মধ্যে 'কবিকাহিনী' সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। 'বনফুল' ইহার পূর্বে রচিত ও প্রকাশিত হইলেও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল পরে। ১৮৭৮ খৃঃ ইহা (কবিকাহিনী) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কবিকাহিনী' সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

'কবিকাহিনীর' নায়ক একজন ভাবুক কবি। এই ধরণের নায়কের পরিচয় আমরা গ্রাম্য গাথাগুলিতে পাই নাই। এমন কি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির রচনাতেও এই ধরণের কবি কল্পনা বিরল। প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে এইরূপ একটি গাথাকাব্য রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছিল। 'কবিকাহিনী' চারিটি সর্গে সমাপ্ত। অমিত্রাক্ষর পয়ার ও ত্রিপদীছন্দে কাব্যটি রচিত। অমিত্রাক্ষর ত্রিপদী লিখিয়া কিশোর কবি ছন্দের নূতনত্ব দেখাইলেন। মানুষ যে মানুষের সঙ্গ পাইতে ভালবাসে তাহাই এই গাথাকাব্যের মূল বক্তব্য।

কাব্যের নায়ক ভাবুক কবি প্রকৃতির মধ্যে আপন সঙ্গিনীর সন্ধান করিয়াছে। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া—

মনের অন্তর তলে কি যে কি করিছে হু হু
কি যেন আপন ধন নাইক সেখানে।

রক্তমাংসের মানুষ প্রাণহীন প্রকৃতিকে সঙ্গিনী হিসাবে পাইলেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাহাতে নাই। কবি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাই সে আপনার মন বুঝিতে পারে না। কাব্যের অন্তর্গত এই সকল দার্শনিক মনোভাব গ্রাম্যকবি রচিত গাথায় পাই না। সেখানে পাত্র, পাত্রী আপন বিবেচনায় যাহা ভাল বুঝিতেছে তাহাই করিতেছে এবং তাহার ফলভোগ করিতেছে।

কবির যখন এই অস্থির মনোভাব তখন অকস্মাৎ একদিন প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত এক সহজ, সরল বালিকা কবির হৃদয় জয় করিল। কবির অশান্ত হৃদয় তৃপ্ত হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে কবির হৃদয় আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। তখন বালিকা নলিনীও কবির অন্তরের অশান্তি দূর করিতে পারিল না। কবি বালিকাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিশ্বভ্রমণে বাহির হইল। কবির বিরহে বালিকা দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাহার অন্তরে শুধু একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া রহিল—

আর কোন সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু
কবিরে দেখিয়া যেন হয় গো মরণ।

কবিও বিশ্বভ্রমণে তৃপ্তিলাভ করিল না। নলিনীর অভাবে তাহার সমস্ত শূন্য ঠেকিতে লাগিল। একক জীবন অপেক্ষা দ্বৈত জীবনই মানবের অধিক কাম্য, অথচ সে তাহা বুঝিতে পারে না। সঙ্গীহারা হইলেই তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠে। অতৃপ্ত কবি পুনরায় নলিনীর নিকট ফিরিয়া আসিল কিন্তু নলিনী তখন ইহজগতে নাই। কবি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত নলিনীর স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া হিমালয়ের বক্ষে কাটাইয়া দিল। প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির বাহ্যসঙ্গী হইয়া রহিলেও, কবির অন্তরের মানবসঙ্গিনী নলিনীর স্মৃতি বক্ষে লইয়া অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে,

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।

কবির পরবর্তী কালের রচিত কাব্যনাট্য 'প্রকৃতির পরিশোধে' (১২৯১) এই কাব্যের প্রভাব পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গাথাকবিতাগুলি 'শৈশব-সঙ্গীত' (১২৯১ সাল) কাব্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 'প্রতিশোধ' নামক গাথাকবিতার কাহিনীতে সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটক-কাহিনীর প্রভাব আছে।

গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে আহত পিতা মৃত্যুর সময় পুত্রকে দিয়া প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন। পুত্র কুমার গুপ্তঘাতকের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একদিন রাত্রিকালে এক কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই কুটীরের অধিকারী প্রতাপই কুমারের পিতৃহন্তা, কিন্তু কুমার তাহা জানিত না। প্রতাপ একমাত্র কন্যা মালতীকে লইয়া কুটীরে বাস করিত। কুমারকে তাহারা সাদরে আশ্রয় দান করিল। প্রতাপও কুমারের পরিচয় জানিত না। কুমার-মালতী দুই যুবক-যুবতী পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ হইল। প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শত্রুর সন্ধানের কথা ভুলিয়া গিয়া কুমার প্রণয়িনীর সহিত সেই কুটীরেই রহিয়া গেল। উভয়ের প্রণয় দেখিয়া প্রতাপ তাহাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল। বিবাহ সভায় প্রতাপ যখন মালতীকে কুমারের হস্তে সমর্পণ করিল, তখন কুমারের পিতার প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইয়া কুমারকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। প্রেতাত্মাদর্শনে প্রতাপ ও মালতী মূর্ছিত হইয়া পড়িল এবং নিমন্ত্রিতেরা পলাইয়া গেল। প্রেতমূর্তি পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—

> হা রে কুলাঙ্গার, অক্ষত্র সন্তান,
> এই কি রে তোর কাজ?
> শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে
> বিবাহ ক'র্‌লি আজ!

কুমার বুঝিল প্রতাপই পিতৃহন্তা। মূর্ছিত প্রতাপকে মারিতে গিয়াও কুমারের হাত উঠিল না। প্রতাপ ও মালতী চেতনা পাইলে প্রতাপের মুখে কুমার সকল কথা শুনিল। তখন প্রতাপের মনেও অনুতাপ জাগিয়াছে, কুমারেরও এই অবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার স্পৃহা নাই। এমন সময় প্রেতাত্মা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া পুত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কুমার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া প্রতাপের বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। এই বীভৎস দৃশ্যে ভয়ে ও শোকে অভিভূত হইয়া মালতী মূর্ছিত হইয়া কুমারের পায়ের তলায় পড়িয়া গেল।

সে মূর্ছা আর ভাঙিল না, কুমার পাগল হইয়া সেই বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কাহিনীটিতে জটিলতা নাই, একটি মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া কুমার ও মালতীর নিষ্পাপ প্রেমের বর্ণনায় রচনাটি বিশিষ্ট গাথা কবিতার রূপ নিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ রচিত এইরূপ আরও কয়েকটি ভাল গাথা-কবিতার নাম 'লীলা', 'ফুলবালা', 'অপ্সরার প্রেম', 'ভগ্নতরী' এবং 'বিষ ও সুধা'। এইগুলির ভিতরেও ছোট ছোট প্রণয়কাহিনী গাথার আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। 'লীলা' নামক গাথাকবিতাটি 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৫ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। লীলা রণধীরকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। উভয়ের ভালবাসা বিবাহে পরিণত হইবার পর লীলা যখন স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিল তখন লীলার নিরাশপ্রণয়ী বিজয় লীলাকে অতর্কিতে ছিনাইয়া আনিয়া বন্দী করিয়া রাখে এবং মিথ্যা করিয়া বলিয়া যায় যে, যুদ্ধে রণধীর প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া লীলা যখন আপন বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া মুমূর্ষু তখন রণধীর বিজয়ের লোকজনকে পরাজিত করিয়া লীলাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া লীলার এই অবস্থা দেখিল। লীলা বিজয়ের প্রতারণার কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলে রণধীর প্রতিশোধ লইতে গিয়া—

দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমর ভূমে
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ ঘুমে।

প্রাচীন প্রণয়গাথার ন্যায় এই রচনাটির করুণ সুর পাঠকহৃদয়কে মথিত করে। 'ফুলবালা' নামক রূপক-গাথাটির প্রথম অংশ ১২৮৩ সালের 'আর্যদর্শনের' চৈত্র সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশ ১২৮৫ সালের 'ভারতী'-র কার্তিক সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ফুল বালক কিশোর অশোক ও ফুলবালা কিশোরী মালতীর প্রেমকাহিনী লইয়া গাথাটি রচিত। কবি কল্পনানেত্রে পুষ্পকাননে অশোক ও মালতীর প্রেমলীলা, তাহাদের বিরহ-দুঃখ, মিলনানন্দ প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

কহিল হাসিয়া কল্পনা বালা দেখায়ে কত কি ছবি।
ফুলবালাদের প্রেমের কাহিনী শুনিবে এখন কবি?

বিবিধ ফুলের বিচিত্র বর্ণনার মাধ্যমে অশোক ও মালতীর বিরহ ও মিলনের

চিত্র সাবলীল ছন্দে অঙ্কিত হইয়াছে। বিরহ-বিচ্ছেদের পর মালতী ও অশোকের মিলনে রূপক কাহিনী সমাপ্ত। লতাবৃক্ষের প্রধান অবলম্বন অশোকাদির ন্যায় বৃহৎ বৃক্ষ এবং বিভিন্ন লতার পত্রপুষ্পসম্ভারেই বৃহৎ বৃক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় ইহাই রূপকের মর্মকথা। 'অপারা প্রেম' নামক গাথাকবিতাটি ১২৮৫ সালের 'ভারতী'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার কাহিনী সামান্যই, কবিত্বগুণেই রচনাটি সমৃদ্ধ। গাথা-কবিতার গঠনপ্রণালী ইহাতে সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধজয়ী এক সৈনিকের প্রেমমুগ্ধ এক অপারা এবং অপারার ব্যর্থ প্রেম লইয়া কাহিনীটি রচিত। সৈনিক যুদ্ধজয় করিয়া ফিরিবার কালে সমুদ্রে অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া নায়কের তরণী বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল, তখন অপারা নায়কের প্রাণরক্ষা করিয়া তাহাকে নিজালয়ে লইয়া গেল। অপারার প্রেমে নায়ক তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। অবশেষে প্রিয়তমকে সুখী করিবার জন্য অপারা আপন সুখ বিসর্জন দিয়া তাহাকে মুক্তি দিল, বিদায় দিবার কালে অপারা বলিল,

যেথা সাধ যাও আমি একাকিনী
বসে থাকি সিন্ধু তীরে।

নায়িকার স্বার্থত্যাগ প্রাচীন গাথাকাব্যের নায়িকাদের কথা স্মরণ করায়। 'ভগ্নতরী' নামক গাথা-কবিতাটি ১২৮৬ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় আষাঢ় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বহুদিন পরে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে 'ভগ্নতরী'-র প্রথম অংশের প্রভাব লক্ষিত হয়। 'ভগ্নতরী' পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। এক তরুণ সুখী দম্পতী অজিত ও ললিতা একদিন নৌকাভ্রমণের সময় প্রচণ্ড ঝড়ে তরী ডুবিবার উপক্রম করিলে অজিত ললিতার হাত ধরিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। একসঙ্গে মরিতে তাহাদের ভয় নাই, মরণেও তাহাদের প্রেম তাহাদের একত্রে রাখিবে—

কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজন মিলে ;

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস! কেহই মরিল না। ললিতার অচৈতন্য দেহ নদীস্রোতে ভাসিয়া একটি দ্বীপে আসিয়া লাগিল। সেই দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী সুরেশ। বহুদিন পূর্বে অনুরূপ অবস্থায় সেও এই দ্বীপে আসিয়াছিল। সুরেশের সেবাযত্নে ললিতার চেতনা ফিরিয়া আসিল কিন্তু অজিতের শোকে সে কাতর হইয়া পড়িল॥ সুরেশের অসীম ধৈর্য ও সেবা তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল।

ক্রমে ক্রমে স্বরেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা ললিতার অন্তরে প্রেমরূপে স্থান পাইতে লাগিল এবং অজিতের স্মৃতি মুছিয়া গেল। একদিন একটি তরী পাইয়া তাহারা স্বরেশের দেশে ফিরিল এবং বিপাশার তীরে কুটীর বাঁধিয়া উভয়ে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কিছুদিন পরে একদিন ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ললিতা ও স্বরেশ এক ভগ্নগৃহে আশ্রয় লইতে গিয়া জীর্ণশীর্ণ অজিতকে দেখিল। ললিতা ও অজিত উভয়ে উভয়কে দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন—

বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জিল অশনি,
জীর্ণগৃহ কাঁপাইয়া—ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ুচ্ছ্বাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ,—গৃহ পুরিল আঁধারে।

এইরূপে কাহিনীতে একটি অসমাপ্ততার জের টানিয়াই রচনাটি সমাপ্ত হইয়াছে। 'বিষ ও সুধা' নামক গাথা-কবিতাটি সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রথম সংস্করণে (১৮৮২ খৃঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভগ্নতরীর' ন্যায় এখানেও দেখি নারীপ্রেমের ভঙ্গুরতা। কিন্তু আলোচ্য কবিতাটির সৌভ্রাতৃত্বের মধুর সুরটি ইহাকে একটি বিশিষ্ট মাধুর্য দান করিয়াছে। অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দে রচনাটি রচিত হইয়াছে।

নায়ক কবি ললিত ও তাহার ভগিনী মাতীর মধুর সম্বন্ধের বর্ণনায় গাথা-কবিতাটি আরম্ভ হইয়াছে। বালক কবির হৃদয় ভগ্নীপ্রীতিতে তৃপ্ত। কবির তরুণ বয়সে যখন নীরদ মালতীকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেল তখন সঙ্গীহারা কবির চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ এক বসন্ত দিনে কবির সহিত বালিকা দামিনীর পরিচয় হইল। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিল। কিছুদিন পরে দামিনীর নিকট বিদায় লইয়া কবি কার্যব্যপদেশে বিদেশে গেল। কিন্তু বিদেশ হইতে ফিরিয়া কবি দামিনীকে আর পাইল না, দামিনী তাহার অপেক্ষায় থাকে নাই। কবির মনের এই অবস্থায় মালতী বিধবা হইয়া ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব স্নেহ আর পাইল না। কবির হৃদয় তখন দামিনীবিরহে কাতর, সে আপন দুঃখকেই বড় করিয়া দেখিল, মালতীর বেদনার কথা চিন্তা করিল না। মালতী আপন দুঃখ মনে চাপিয়া অক্লান্তভাবে ভ্রাতার সেবা ও যত্ন করিয়া তাহার হৃদয়কে শান্ত করিতে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। ক্রমে ক্রমে মালতীর যত্নে ও সেবায় কবি দামিনীর কথা ভুলিল, তাহার হৃদয় বেদনা দূর হইল, কিন্তু মালতী তখন শয্যা নিয়াছে। ভ্রাতার ঔদাসীন্য ও আপন অকাল বৈধব্যের

বেদনা মালতীর জীবনীশক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। কবি যখন মালতীর প্রতি মনোযোগ দিল তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী। মালতীর মৃত্যুতে কবি মালতীর প্রকৃত মূল্য বুঝিল—

মালতী শুকায়ে গেল, সুবাস তাহার
এখনো রয়েছে কিন্তু ভরিয়া কুটীর।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত গাথাকবিতাগুলি তখনকার দিনে বেশ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ১২৯৭ সালে তাঁহার 'গাথা' নামক পুস্তকে যে চারিটি গাথা কবিতা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা প্রথমে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বর্ণকুমারীর রচনাগুলিতে গাথাকাব্যের করুণ সুরটি রক্ষিত হইয়াছে। কাহিনীগুলি গাথাপযোগী সহজ, সরল ভাব ও সাবলীল ছন্দে রচিত। স্বর্ণকুমারী রচিত চারিটি গাথাই বিয়োগান্ত করুণরসাত্মক। অতি অল্প পরিবেশের মধ্যে কাহিনীগুলি বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। প্রেমের বিচিত্র গতি ও পরিণতি লইয়া কাহিনীগুলি রচিত।

'খড়াপরিণয়' নামক কবিতাটিকে ইতিহাসাশ্রিত গাথা কবিতা নামে অভিহিত করা যায়। টডের রাজস্থান গ্রন্থ হইতে কাহিনীর উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কাহিনীটি এইরূপ—

চিতোরের যুবরাজ আম্বের রাজকন্যাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি তরবারি প্রদান করেন এবং বলিয়া যান যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেই তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবেন। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের পূর্বে যেন রাজকন্যা কোনও কথা প্রকাশ না করেন, তাহাতে রাজপুত্রের বিপদের আশঙ্কা আছে। রাজকন্যা সরল মনে রাজপুত্রের এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চিতোর-যুবরাজের অপেক্ষায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে পিতা বুন্দীরাজ সূর্যের সহিত কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন। চিতোর-রাজ রতনের সাবধানবাণী স্মরণ করিয়া রাজকন্যা কোন কথা প্রকাশ করিতে পারেন না অথচ এই বিবাহের সংবাদ তাঁহার অন্তর পুড়িতে থাকে। সখীর মুখে রতনের সিংহাসন লাভের কথা শুনিয়াও রাজকন্যা কিছুতেই রতনকে অবিশ্বাসী ভাবিতে পারিলেন না। রতনের নিকট পত্র পাঠাইয়া অপেক্ষায় রহিলেন। বিবাহের দিন সমাগত তবুও পত্রের উত্তর আসিল না। বুন্দীরাজের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইয়া গেল, রতনের অমঙ্গল আশঙ্কায় রাজকন্যা কোনও কথাই প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

রাজকন্যা অলকা জীবিতমৃতার ন্যায় বিবাহ উৎসব অতিক্রম করিলেন। ফুলশয্যার দিন চিতোর রাণার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। অলকা গোপনে রতনের সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায় রতনকে সন্ন্যাসীবেশে আসিবার অনুরোধ জানাইয়া সখীকে পাঠাইলেন। রতন আসিলে রাজকন্যা তাহার বাক্যে আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব না করিয়া, তাহার প্রতি রতনের পূর্বপ্রেম যে অনেক পরিমাণে জমিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া আপন জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাসাদের ছাদ হইতে চিতোর রাণা ও বন্দারাজের যুদ্ধে উভয়কেই ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া, অলকা চিতোর রাজপুত্র প্রদত্ত তরবারি বাহির করিয়া বলিলেন—

বিবাহ হয়েছে তোর সাথে অসি,
মরিবও তোরে বুকেতে ধরি।

প্রেমের সাক্ষী সেই তরবারি দ্বারা অলকা আপন জীবন বিসর্জন দিলেন।

নায়িকা অলকার চরিত্রে আমরা প্রাচীন গাথাকাহিনীর নায়িকাগণের একমুখী প্রেম ও দৃঢ়তার পরিচয় পাই।

'সাশ্রু সম্প্রদান' নামক গাথা-কবিতাটির কাহিনী অংশে নূতনত্ব দৃষ্ট নয়। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে কাহিনীটি সমাপ্ত হইলেও, ব্যর্থপ্রেমিকের নীরব দুঃখের বেদনা পাঠক চিত্তকে অভিভূত করিয়া কাহিনীশেষে করুণরসের সৃষ্টি করে।

নলিনী গৃহস্থকন্যা। তাহার প্রেমাস্পদ বাল্যসখা বিদেশে গিয়াছে। নলিনী তাহার ফিরিবার অপেক্ষায় দিন কাটায়। যুবক অজিত নলিনীকে ভালবাসে। একদিন সে নলিনীর নিকট প্রেমনিবেদন করিতে গিয়া বুঝিল নলিনী অন্যে আসক্ত। তখনি সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লই। কিন্তু অজিতের সহিত নলিনীর কথোপকথন কালে নলিনীর বাল্যসখা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের দেখিয়া ভুল বুঝিল এবং মনের দুঃখে নিরুদ্দেশ হইল। এইরূপে ভুল বোঝাবুঝির ফলে তিনজনের জীবনই দুঃখময় হইয়া পড়িল।

বহুদিন পরে একদিন শিবমন্দিরে নলিনী ও তাহার বাল্যসখার মিলন হইল এবং আনন্দিত মনে আশ্রয়ের সন্ধান করিতে করিতে উভয়ে একটি কালীমন্দিরে উপস্থিত হইল। তাহাদের অনুরোধক্রমে মন্দিরের পুরোহিত তাহাদের বিবাহকার্য সম্পাদন করাইলেন। এই পুরোহিত আর কেহই নহে,

সে অজিত। অজিত নলিনীকে দেখিয়াই চিনিয়াছে, সে যে নলিনীকে অন্তরের সহিত ভালবাসে, সে কি তাহাকে ভুলিতে পারে। নলিনী কিন্তু পুরোহিতবেশী অজিতকে চিনিতে পারিল না। সম্প্রদানকালে অজিতের হৃদয় একটু কাঁপিয়া গেল, কিন্তু তবুও সে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিল না। কেবলমাত্র—

এক ফোঁটা তার আঁখিজল শুধু
পড়িল তখন বালার হাতে।

এইরূপে অজিতের নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগের করুণাশ্রুতে পাঠকের হৃদয় অভিভূত করিয়া কাহিনীটি শেষ হইয়াছে।

'সাধের ভাসান' এবং 'অভাগিনী' নামক গাথাকবিতা দুইটিতেও এইরূপ দুইটি সুন্দর ক্ষুদ্র প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'যোগেশ' নামক গাথাকাব্যটি ১৮৮১ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী লইয়া কাব্যটি রচিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'ছায়াময়ী-পরিণয়' নামক রচনা দুইটিকে রূপক জাতীয় গাথা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। রূপকের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশন রচনা দুইটির উদ্দেশ্য। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ১৮৭৫ খৃঃ এবং 'ছায়াময়ী-পরিণয়' ১৮৮৯ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি রচনা কাব্য হিসাবে সার্থক হইলেও, গাথাকাব্য হিসাবে ইহাদের সার্থকতা খুব বেশী নাই।

অক্ষয়কুমার বড়ালকে রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবি বলিয়া ধরা হইলেও তিনি রবীন্দ্রনাথের পর লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনকালে রচিত কবিতা অক্ষয়কুমারের কোন কোন রচনাকে প্রভাবিত করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের কাব্যে অসংযত উচ্ছ্বাস অপেক্ষা ভাবুকতা ও আন্তরিকতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'প্রদীপ', 'সাহিত্য', প্রভৃতি পত্রিকায় এবং 'কনকাঞ্জলি' নামক পুস্তকে অক্ষয়কুমারের রচিত বিভিন্ন বিষয় লইয়া কতকগুলি ছোট ছোট গাথাকবিতা প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে বনলতা, যশোর-যুদ্ধ, রঘুনাথ, কল্যাণী, মনোরমা অভাগিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ছোট ছোট এই রচনাগুলির মধ্য দিয়া এক একটি একক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সহজ, সরল ভাব ও ভাষা এবং গতিশীল ছন্দে রচিত কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া প্রণয়, দারিদ্র্যদুঃখ, ঐতিহাসিক ঘটনা, অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রভৃতির বর্ণনা গাথাকবিতার আকারে স্থান পাইয়াছে।

'রঘুনাথ' কবিতাটিতে এক শ্রান্ত ক্লান্ত যুবকের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সারাদিনের পথশ্রমে হতাশ মনে রিক্তহস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে দরিদ্র যুবক পথে এক জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখিতে পাইল। বৃদ্ধকে জলপান করাইয়া কিছুটা সুস্থ করিতেছে এমন সময় জনতাকর্তৃক বিতাড়িত এক চোর সেখান দিয়া পলাইবার সময় এক থলি টাকা রঘুনাথের কাছে পড়িয়া গেল। জনতা চোরের পিছনে ছুটিল। টাকার থলি হস্তগত হইয়া দরিদ্র রঘুনাথের মনে যে ভাবসমূহের উদয় হইল তাহা কবি চমৎকাররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। টাকার থলি হস্তগত হইতেই রঘুনাথ বৃদ্ধকে উঠাইতে গেল, কিন্তু দেখিল বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে। জীবনের এই অনিত্যতা মুহূর্তে রঘুনাথের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিল, 'হা বিধাতঃ! এই দেহ বহি প্রতিদিন।' এই সময় জনতা ও রক্ষী চোরকে লইয়া সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের ফিরিবার আওয়াজেই রঘুনাথ পুনরায় যেন পার্থিব জগতের সম্বিৎ লাভ করিল, বৃদ্ধ পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ও পত্নীর অনাহারক্লিষ্ট মুখ চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। এদিকে জনতা রঘু ও বৃদ্ধের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে।

পড়িয়াছে চারিদিকে চন্দ্রিকা উজ্জ্বল;
শব-মুখে চাহি রঘু পাষাণ-নিশ্চল।

তখন শবদেহের উপর পড়িয়া রঘুনাথ 'পিতা, পিতা' বলিয়া কপট ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জনতা সন্দেহের কিছু না পাইয়া অগ্রসর হইয়া গেল। তখন রঘুনাথ দৃঢ় মুষ্টিতে অকম্পিত দেহে বৃদ্ধের শবদেহ টানিয়া টাকার থলি খুঁজিতে লাগিল। জনতাকে দেখিয়াই সে টাকার থলি শবদেহের নিম্নে লুকাইয়া সন্দেহ নিরসনের জন্য মিথ্যা অভিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

এইরূপে কবি দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট যুবকের করুণ চিত্র আঁকিয়া দারিদ্র্যের ভয়াবহ অভিশাপে মানুষ কতটা নিম্নস্তরে নামিতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন।

'বনলতা' একটি ছোট প্রণয়গাথা। 'বিভা', 'কবি', 'পরিচয়', 'ভ্রমণ', 'দ্বিপ্রহরা-নিশি', 'বিদেশী', 'সখীর গান', 'বিদায়', 'শেষ' প্রভৃতি কয়েকটি অংশে বিভক্ত। বিভিন্ন অংশের নামকরণেই অংশবর্ণিত ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নায়িকা বিভা ও নায়ক কবি। ফুল-পত্র-শোভিত অরণ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ, পরিচয় ও প্রণয়। কিন্তু বিদেশী এক ধনবান—

পথিকের সনে বিভার বিবাহ,
হইয়া গিয়াছে স্থির ;
আমাদের বিভা হবে রাজরাণী,
ঘুচিবে বাকল-চীর।

এই আকস্মিক বিবাহে বিভা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর বিভা স্বামীর সহিত নৌকায় করিয়া যাইতেছে।

বসে আছে বিভা পতির বাসেতে,
নিষ্কম্প, আড়ষ্ট কায় !
দেহের বাঁধন গিয়াছে কাটিয়া
কি যেন অদৃষ্ট ঘায় !

প্রণয়ীবিরহে বিভার হৃদয় শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বিভা চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে বিভার তরী বহুদূরে চলিয়া গেল।

পশ্চিমে ডুবিছে রবি ;
না না না, ডুবেছে সবি !
গ্রামের লোকেরা ফিরে গেছে গ্রামে,
নদী কূলে একা কবি।

সকলেই গৃহে ফিরিয়াছে। বিভার অভাবে নিঃস্ব, রিক্তহৃদয় কবি কেবল নদীকূলে একা বিভার তরণী দেখিতেছে। জগতে বিভাই যে তাহার একমাত্র চিন্তা, তাহাকে ছাড়িয়া সে কোথায় ফিরিবে ?

ক্রমে ক্রমে তরণী দূর হইতে দূরে অপসৃত হইয়াছে, তরুকোলে মাথা রাখিয়া একধ্যানে, একদৃষ্টিতে কবি তরণীর প্রতি চাহিয়া আছে। অবশেষে—

অতি দূরে তরী নদী মোহনায়
হংসী-সম যায় দেখা।
নীরব নিথর পূরব আকাশে
ফুটিছে চাঁদের রেখা।
ত্বরিতে ধীবর ভিড়াইছে ডিঙ্গি,
'পলাও আসিছে বান।
ফুঁসিয়া উঠিছে অগাধ সলিল,
নড়িছে না তুনয়ান !

বানের জলে কবির আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া গেল তবুও সে দিগন্ত সীমায় দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া তরী দেখিতে লাগিল। অবশেষে জলে চারিদিক ভাসিয়া গেল—

যে যেথায় পায় পলায় তরাসে,
চারিদিকে কোলাহল।
তবু চেয়ে আছে— তবু চেয়ে আছে,
নয়নে নাহিক পল।
সরে গেছে তরী, ডুবে গেছে মাথা,
জ্যোৎস্না অতি পরিষ্কার।
নিয়ে কল্ কল্ দুকূল তলায়ে
ছুলিছে সলিল-ভার।

এইরূপে প্রেয়সীর ধ্যানে আত্মচিন্তা বিস্মৃত হইয়া প্রেমিক কবি জীবন বিসর্জন দিল।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কয়েকটি সুন্দর গাথাকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'সবিতা-সুদর্শন', 'ফুলরা', 'সুরমা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'সবিতা-সুদর্শন' ও 'ফুলরা' ১২৭৫ সালে রচিত এবং মুদ্রিত হয়। 'সুরমা' ১৮৯৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়।

একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চরিত্রের উপর একটি কাল্পনিক কাহিনী আরোপ করিয়া 'সবিতা-সুদর্শন' নামক গাথা-কবিতাটি রচিত হইয়াছে।

১৪৮ স্তবকে সবিতা-সুদর্শন রচিত।

গঙ্গাতীরস্থ কাশীধামের সন্ধ্যাকালীন বর্ণনা দ্বারা গাথা-কবিতাটি আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ণতীর, স্বর্ণজল, নিদাঘ-সন্ধ্যায়
কলনাদে দোলে তরঙ্গিনী,
পট্টবাসে হাসে, মন্দ আন্দোলিয়া কায়,
রসবতী কৌতুকী কামিনী।
মন্দির, উন্নত শির, শূল চক্র তায়
শির আভরণ শোভা পায়;
বিলাসিনী-কাশি! কিবা সেজেছে তোমায়
নিতম্বের মেখলা গঙ্গায়।

বর্ণনাটি চমৎকার। এই গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটে দীর্ঘ ঘণ্টা কলনাদে ও ধূপগন্ধে দিক আমোদিত করিয়া ধবল শির, জ্যোতির্ময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সূর্যস্তব করিতেছেন। এমন সময় এক যুবক আসিয়া ব্রাহ্মণের চরণ বন্দনা করিল। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিলেন। যুবকের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

বাল্যকাল অতীত, না আগত যৌবন
শীত গ্রীষ্মে বসন্তের সেতু,
কিছু দিনে যোগ্য হবে যুবা সম্বোধন,
শিশু বলা যায় স্নেহ হেতু।

সুতরাং যুবক না বলিয়া আগন্তুককে কিশোর বলাই সঙ্গত। ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে কিশোর আপন পরিচয় দিয়া বলিল—

শিশুকালে পিতা মাতা নিহত আমার,
ধীরে শিশু করিল উত্তর—
সুদর্শন নাম, আমি দ্বিজের কুমার,
যথা সন্ধ্যা হয় তথা ঘর।
সহোদর সহোদরা কোন নাই আর,
ভ্রমি একা এ সংসারে—বনে,
অনাথ দশায় তত দুঃখ না আমার,
যত হয় অজ্ঞান কারণে।
যারে চাই সেই দেয় ক্ষুধায় আহার,
বেঁচে আছে দেহ বটে তায়,
বিদ্যার ক্ষুধায় আত্মা নিহত আমার,
কৃপানিধি, বাঁচাও আমায়।

এইরূপে কিশোর আপন বিদ্যাহীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যা যাঞ্চা করিল। কিশোরের কাতর অনুরোধে বৃদ্ধ বিচলিত হইলেন এবং তাহাকে বিদ্যাদানে স্বীকৃত হইয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধের কুটীরে বৃদ্ধ এবং তাঁহার একমাত্র কন্যা সবিতা বাস করে।

নয় উচ্চ অট্টালিকা যথা উত্তরিল;
চারিখানি কুটীরের ঘর।

'কোথায় সবিতা,' বলি প্রাচীন ডাকিল,
মধুস্বরে লভিল উত্তর।

পিতার ডাকে সবিতা বাহিরে আসিয়া অপরিচিত আগন্তুককে দেখিল।

কুমারী কুণ্ঠিত দেখে অজ্ঞাত কুমার,
সহজাত ললনা লজ্জায়।

প্রথম দর্শনেই যে সবিতার অন্তরে কিশোরের প্রতি প্রেমভাব জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারই ইঙ্গিত।

ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিয়া সুদর্শন বিদ্যা অর্জন করিতে লাগিল। সুদর্শন কেবল সুন্দর ও বুদ্ধিমান নয়, সে সর্বগুণের আধার। ব্রাহ্মণ তাহার গুণে মুগ্ধ। ক্রমে ক্রমে সবিতার সহিত তাহার বেশ হৃদ্যতা জন্মিল—

সোদর-সোদরা-হীনা সবিতা সুন্দরী,
সুখ সঙ্গে মিলে সুদর্শনে।
কুমার কখন নিজ পাঠ সাঙ্গ করি
খেলে, বসি কুমারীর সনে।

এইরূপে একত্রে খেলাধূলা, কাজকর্ম করিয়া ও পরস্পরের সাহচর্যে সবিতা ও সুদর্শনের দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে সবিতা ও সুদর্শন যৌবনের সীমায় উপনীত হইল এবং প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী তাহাদের প্রেম গভীর হইয়া উঠিল। সুদর্শন যখন সবিতার প্রতি আপন অনুরাগের কথা অনুভব করিল তখন হইতে সে বড়ই বিষণ্ণ হইয়া পড়িল এবং সবিতাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

নদীতীরে হেথা সেথা একাকী ভ্রমণ,
ছেড়ে সুখ-সঙ্গী সবিতায়।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সুদর্শনের অবস্থা কবির বর্ণনার গুণে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সবিতা সুদর্শনের এই ভাববৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়া মর্মাহত হইল। সে কিছুতেই সুদর্শনের পরিবর্তিত ব্যবহারের সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পায় না এবং আপন অন্তরে সুদর্শনের অজানিত দুঃখের পাষাণভার বহন করিয়া বেড়ায়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু সবিতা ও সুদর্শনের প্রতি সকল সময়েই সতর্ক নজর রাখিতেন। তাহাদের পরস্পরের প্রেম সম্পর্ক তাঁহাকে আনন্দ দান করিত। তিনি সুদর্শনকে আপন পুত্রের ন্যায় ভালবাসিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার হাতে সবিতাকে তুলিয়া দিতে তাঁহার আনন্দিত হইবারই কথা। হঠাৎ সুদর্শনের পরিবর্তন দেখিয়া ব্রাহ্মণ মনে

করিলেন 'এ প্রেমের বিকার'। আর দেরী করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া তিনি সুদর্শনকে ডাকিয়া বলিলেন,

তোমায় অর্পিতে চাই সবিতার ভার,
নাই অন্য সংসার বন্ধন,
অতি শিশুকালে মাতা নিহত তাহার,
দেখ যেন না করে রোদন।

কিন্তু বৃদ্ধের এই কথায় সুদর্শনের মুখে হর্ষের কোনও প্রকাশ না পাইয়া ব্রাহ্মণ অবাক হইলেন। তখন অশ্রুজলে ভাসিয়া সুদর্শন বড় করুণ এক সত্য প্রকাশ করিয়া কহিল—

অগোচর নাই প্রভু নাম আকবর,
দিল্লীধাম রাজবাড়ী যাঁর,
আবুল ফজল তাঁর খ্যাত লিপিকার,
ফৈজী নাম ভ্রাতা আমি তাঁর।

হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ আপন পরিচয় গোপন করিয়া ফৈজী সুদর্শন নামে আপন মিথ্যা পরিচয় দিয়া মহাপাতকের কাজ করিয়া আজ এই কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

কহিতে কহিতে কথা, অদূরে, সত্বর,
যাতনার স্বর নিনাদিত,
দেখিল আসিয়া দোঁহে ধরার উপর,
সবিতার তনু নিপতিত।

অন্তরাল হইতে সুদর্শনের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সবিতার পক্ষে এই কঠিন আঘাত সহ্য করা সম্ভবপর হয় নাই। সবিতার মৃত্যুতে সুদর্শন শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ অবিচলিত ব্রাহ্মণ তাহাকে শান্ত করিয়া কহিলেন—

করি আশীর্বাদ হোক সম্পদ তোমার,
হও প্রীতি-পাত্র পাতশার;
একমাত্র অনুরোধ রাখিবে আমার,
বেদমর্ম করো না প্রচার।

ব্রাহ্মণ প্রকৃতই আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী। এই নিদারুণ অবস্থায় তিনি সুদর্শনকে ক্ষমা করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণের আদর্শ স্থাপন করিলেন। অতঃপর—

দুহিতার প্রেতক্রিয়া করি সমাধান,
তুষানলে দ্বিজ ত্যজি প্রাণ,
গেল চলি, যেখানেতে যায় পুণ্যবান
ফৈজী দিল্লী করিল প্রস্থান।

সম্রাটের দরবারে ফৈজী বহু সম্মান ও আদর লাভ করিল। কিন্তু—

সব সুখে সুখী ফৈজী তবু সুখী নয়,
দীর্ঘশ্বাসে দিত বিজ্ঞাপন,
সম্রাটের নেত্রে নীরবিন্দুর উদয়,
শুনিয়া শোকের বিবরণ।

আলোচ্য গাথাটিতে প্রাচীন প্রণয়গাথার করুণ সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

পাঁচ অধ্যায়ে 'ফুলরা' নামক গাথাকবিতাটি সমাপ্ত। ইহাও একটি করুণ প্রণয় গাথা। 'সবিতা-সুদর্শন' অপেক্ষা ইহার কাহিনী অংশ দুর্বল। 'ফুলরা' নায়িকা, তাহার পরিচয়েই কাহিনী আরম্ভ—

ফুল বিনা ফুলরার
নাই আর অলঙ্কার
ফুল বিনা ফুলরার নাই আর ধন।
নিত্য যদি ফুল পায়
ফুলরা না কিছু চায়—
ফুল, তুমি ফুলরার জীবন ভূষণ॥

ফুল তুলিতে তুলিতে নির্জন ফুলবাগানে হঠাৎ,

ফিরে বালা দেখে চেয়ে আছে কাছে মুখ চেয়ে
অজানিত যুবা একজন ;
সবে নব বয়োধর মনোহর কলেবর
আছে ধন জানায় ভূষণ।

ফুলরা নির্ভীক। নির্জন স্থানে অজানা পুরুষ দেখিয়াও সে ভয় পাইল না। যুবা প্রশ্ন করিল, 'একা বনে ফুল তুলিতে ভয় করে না'। ফুলরা জানাইল সে

কাহারও ক্ষতি করে নাই, বনের ফুল তুলিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া মূল্য লইবে, তাহাতে ভয়ের কি আছে। যুবকের প্রশ্নের উত্তরে ফুলরা পরিচয় দিল—

নগরের প্রান্তে ঘর   জেতে আমি মালাকর
অন্ধ মাতা কেহ নাহি আর।

রূপবতী ফুলরাকে অনূঢ়া জানিয়া যুবক তাহার নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়া কহিল—

শুনেছ বণিকপতি   হেমরাজ মহামতি
সবে একপুত্র আমি তার;
কি জানি কি হল মন   সেবিবারে সমীরণ
আইলাম এ বন-মাঝার।
করিতেছি সত্য পণ   সাক্ষী হও দেবগণ
অন্য নারী বিয়া না করিব;
স্বাধীন হইলে পরে   তোমায় আনিব ঘরে
জাতি কুল জ্ঞাতি না চাহিব।

ফুলরা ও বণিকপুত্রের প্রণয়লীলা চলিতে লাগিল। উভয়ে পুষ্পবনে মিলিত হয়। একদিন বাণিজ্যব্যপদেশে বিদেশে যাইবে বলিয়া যুবক ফুলরার নিকট বিদায় চাহিয়া যাইবার কালে কি উপহার আনিবে জানিতে চাহিলেন—

ফুলরা কহিল,   আমি কিছু নাহি চাই,
এইভাবে এইখানে দেখা যেন পাই।

প্রণয়ী বিরহে ফুলরার দিন কাটে। একদিন তৃতীয় প্রহর বেলায় বসিয়া ফুলরা মালা গাঁথিতেছিল এমন সময় এক প্রতিবেশিনী বালিকা আসিয়া তাহাকে বরের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। ফুলরা অসুস্থতাবশতঃ নগরে যাইতে পারে নাই তাই কোনও খবরই জানে না। দুইজনে যখন নগরে পৌছিল তখন অপূর্ব শোভাযাত্রা সহকারে বরকে যাইতে দেখিল। জনতার চাপে ফুলরা ও তাহার সঙ্গিনী ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বরের শিবিকার নিকট গিয়া ফুলরা—

বর-গলে হার বালা যতনে অর্পিয়া
মুখ তুলে মুখ পানে চায়,
পাষাণ প্রতিমা হেন ক্ষণেক থাকিয়া
আর্তস্বরে পড়িল ধরায়।

বর ফুলরার পূর্বকথিত প্রণয়ী। পিতার আজ্ঞায় প্রণয়িনীকে ভুলিয়া বণিকপুত্র বিবাহ করিয়া নববধূসহ যাইতেছে। ফুলরাকে দেখিয়া তাহার পূর্বস্মৃতি উদয় হইল এবং— দুই ভুজ প্রসারিয়া যেন আলিঙ্গনে

অতিবেগে পড়িল ধরায়।

এইরূপে আকস্মিক আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ফুলরা ও বণিকপুত্র মণিরাজ উভয়েরই মৃত্যু হইল। মণিরাজের মাতাপিতাও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে বিবাহের শোভাযাত্রা শোকযাত্রায় পরিণত হইল।

ভাষা ও বর্ণনার গুণেই কাব্যটি উৎরাইয়া গিয়াছে। কাহিনী অংশ সুপরিকল্পিত নহে। কাহিনীর বিয়োগান্ত সমাপ্তিতেও পাঠকের মন অশ্রুসিক্ত হয় না। বরং কাহিনীর এই অসম্ভাব্য পরিণতি ও একাধিক মৃত্যুর বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনীটি তাহার গুরুত্ব হারাইয়া অতি লঘু হইয়া পড়িয়াছে। কাহিনীর দুর্বলচেতা নায়ক ও একনিষ্ঠ প্রেমিকা নায়িকার ভিতর প্রাচীন প্রণয় গাথার নায়ক-নায়িকার ছাপ পড়িয়াছে।

'সুরমা'ও একটি প্রণয়গাথা। বিনোদ ও সুরমার অম্লান প্রেম কাহিনীটিকে মাধুর্য দান করিয়াছে। কাহিনীতে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব বা নূতনত্ব কিছু নাই।

১৮৯৪ খৃঃ জগচ্চন্দ্র সেন রচিত 'নীতিগাথা' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে গাথাকবিতার আকারে কতকগুলি ছোট ছোট নীতিকাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'শেফালিকা', 'অলসতা' (বহু প্রচলিত 'পি-পু-ফি-সু-র গল্প লইয়া রচিত), 'অভ্যাস' প্রভৃতি নীতিগাথার নাম উল্লেখযোগ্য।

অতি আধুনিককালে রচিত গাথা যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'মজুর'। এই রচনাটি ১৩২০ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ধরণের গাথাকবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্ভুক্ত গাথাকবিতাগুলির সমপর্যায়ভুক্ত। ইহারা আধুনিক গাথাকবিতার সর্বাধুনিক রূপান্তর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক কাহিনীমূলক আধুনিক গাথাকবিতাগুলিকে বাংলা ছোটগল্পের অগ্রদূত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আকর পুঁথি ও নির্দেশক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস — ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

২। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়। ১ম ও ২য় খণ্ড। — ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড। — ডঃ সুকুমার সেন।

৪। ইসলামী বাংলা সাহিত্য — ডঃ সুকুমার সেন।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৬। গৌড় রাজমালা — অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

৭। রবীন্দ্র রচনাবলী

৮। পূর্ববঙ্গ গীতিকা। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। — ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৯। মৈমনসিংহ গীতিকা — ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

১০। ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা — সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। পটুয়া সঙ্গীত — ৺গুরুসদয় দত্ত।

১২। প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণ।১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। — মুন্‌শী আবদুল করিম।

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। আধুনিক যুগ। — মুহম্মদ হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।

১৪। বাংলার লোকসাহিত্য — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

১৫। বীরভূমের ইতিহাস। ১ম ও ২য় খণ্ড। — গৌরীহর মিত্র।

১৬। পুঁথি-পরিচয়। ১ম ও ২য় খণ্ড। — পঞ্চানন মণ্ডল।

১৭। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

১৮। প্রবাসী পত্রিকা

১৯। মেদিনীপুরের ইতিহাস — যোগেশচন্দ্র বসু।

২০। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স

২১। পরিচয় পত্রিকা

২২। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

২৩। হিস্ট্রি অব বিষ্ণুপুর রাজ — অভয়পদ মল্লিক।

২৪। দি ব্যালাড ট্রী — ইভলিন কেনড্রিক ওয়েলস্‌।

২৫। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

২৬। বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি-সংখ্যা: ১৭৮৪, ৩২৭৬, ২৪৫৩, ৩৮৪৭, ২৪৫৫, ৪২৫৩, ১৫৫৯, ১৫৮৬, ১৪০৩, ১৫৯৩, ৩৬৮৪, ৪৬৩০, ৪৬৩৯, ১০২৭, ৯০১ ইত্যাদি।

২৭। ঢাকার ইতিহাস — যতীন্দ্রমোহন রায়

২৮। ইংলিশ অ্যাণ্ড স্কটিশ পপুলার ব্যালাড্‌স্ — জে. চাইল্ড।